Jochna O Jononir Golpo by Humayun Ahmed

[Part.1]

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

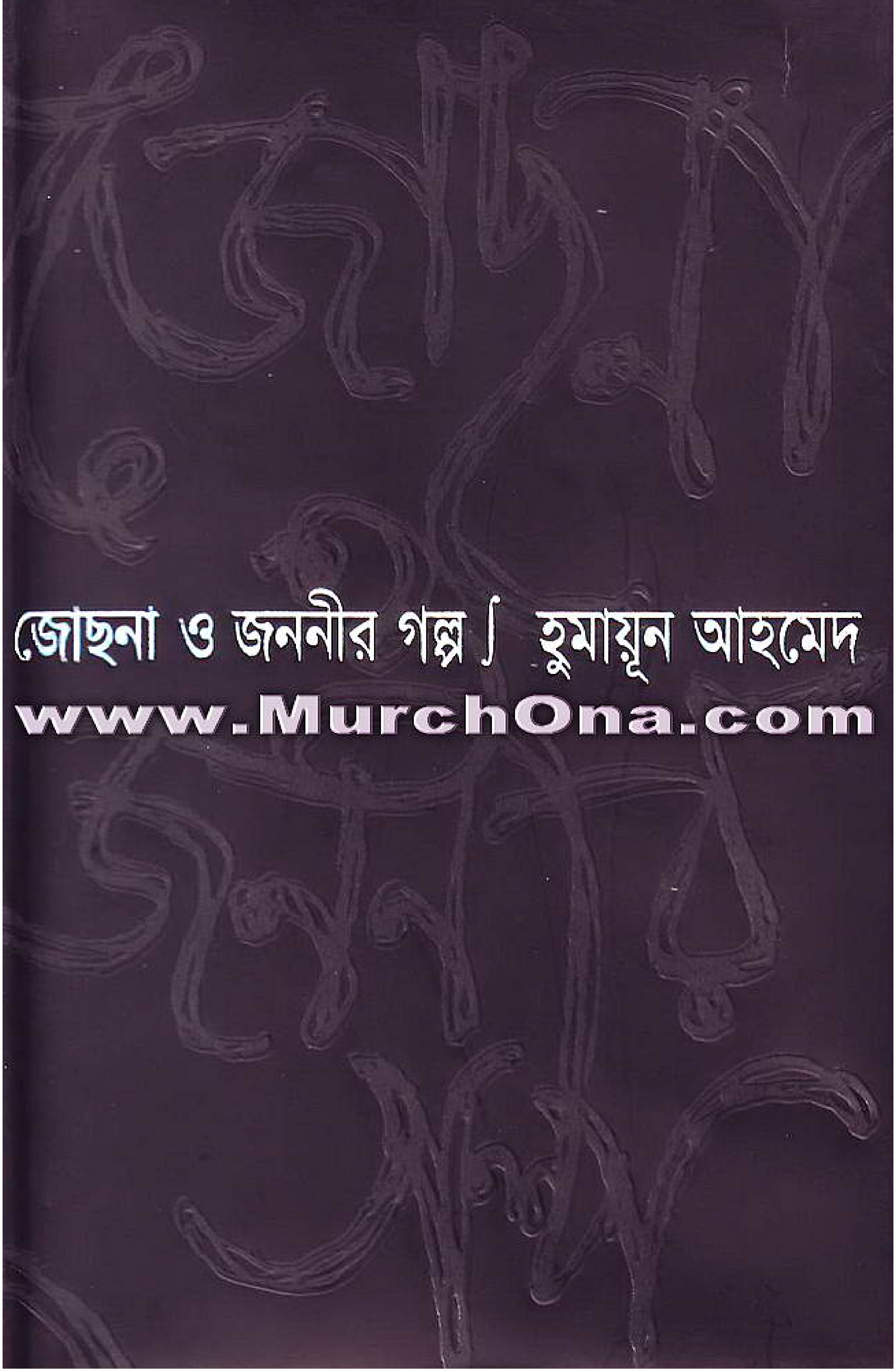
জোছনা ও জননীর গল্প / হুমায়ূন আহমেদ
www.MurchOna.com

মুক্তির মন্দির সোপানতলে
কত প্রাণ হলো বলিদান,
লেখা আছে অশ্রুজলে।
কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা,
বন্দিশালার ঐ শিকলভাঙা
তারা কি ফিরিবে আর সুপ্রভাতে ?
যত তরুণ অরুণ গেছে অস্তাচলে॥

যারা স্বর্গগত তারা এখনো জানে,
স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি
এসো স্বদেশ ব্রতের মহাদীক্ষা লভি,
সেই মৃত্যুঞ্জয়ীদের চরণ চুমি।

যারা জীর্ণ জাতির বুকে জাগালো আশা,
মৌন মলিন মুখে জাগালো ভাষা।
সেই রক্তকমলে গাঁথা মাল্যখানি,
বিজয় লক্ষ্যে দেব তাদেরই গলে॥

—মোহিনী চৌধুরী

পূর্বকথা

মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন আমার বয়স তেইশ। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কেমিস্ট্রিতে অনার্স থিয়োরি পরীক্ষা দিয়েছি, প্রাকটিক্যাল পরীক্ষার জন্যে অপেক্ষা। সুন্দর সময় কাটছে। আর মাত্র এক বৎসর— M.Sc পাশ করে ফেলব। ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার হিসেবে যোগ দেব। পিএইচডি করতে যাব দেশের বাইরে।

গল্প-উপন্যাসে আদর্শ ভালো ছাত্রের কিছু চিত্র আঁকা হয়। আমি ছিলাম সে রকম একজন। আদর্শ ভালো ছাত্রের বন্ধু-বান্ধব থাকবে না, আমার ছিল না। তাদের সময় কাটবে বই পড়ে — আমারও তাই কাটে। উনসত্তুরের গণআন্দোলনের অতি উত্তেজনাময় সময়ে আমি ছিলাম উত্তেজনামুক্ত তরুণ যুবক, যার একমাত্র বিনোদন পাবলিক লাইব্রেরিতে গল্পের বই পড়া। শরিফ মিয়ার ক্যান্টিনে চা খাওয়া, মাঝে-মধ্যে বাংলা একাডেমীতে উঁকি দেয়া। সেখানে প্রায়ই গানের আসর হতো।

যেখানেই থাকি সন্ধ্যার আগে আগে মহসিন হলে নিজের ঘরে ফিরে আসতাম। ভালো ছাত্র হিসেবে সেখানে আমি একটি সিঙ্গেল সিটের রুম পেয়েছিলাম। নানান ধরনের বই দিয়ে রুম ভর্তি করে ফেলেছিলাম। গানের প্রতি আমার প্রবল দুর্বলতা দেখে বাবা আমাকে একটা রেকর্ড প্লেয়ার কিনে দিয়েছিলেন। বাইরে যখন ভয়াবহ আন্দোলন চলছে, তখন আমি দরজা বন্ধ করে গান শুনছি— কেন পান্থ এ চঞ্চলতা ?

আমার সাজানো অতি পরিচিত ভুবন পুরোপুরি ভেঙে পড়ল ১৯৭১ সনে। যে পরিস্থিতিতে আমি পড়লাম, তার জন্যে কোনোরকম মানসিক প্রস্তুতি আমার ছিল না। ছায়াঘেরা শান্ত দিঘির একটা মাছকে হঠাৎ যেন নিয়ে যাওয়া হলো চৈত্রের দাবদাহে ঝলসে যাওয়া স্থলভূমিতে। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা! ভাইবোন নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পালাচ্ছি। জীবন বাঁচানোর জন্যে মাদ্রাসার ছাত্র হিসেবে ভর্তি হতে গেছি শর্ষিনার পীর সাহেবের মাদ্রাসায়। পাকিস্তান মিলিটারি মাথায় গুলির বাক্স তুলে দিয়েছে। অকল্পনীয় ওজনের গুলির বাক্স মাথায় নিয়ে সৈন্যদের সঙ্গে বারহাট্টা থেকে হেঁটে হেঁটে এসেছি নেত্রকোনা পর্যন্ত। মিলিটারির বন্দিশিবিরে কাটল কিছু সময়। কী ভয়ঙ্কর অত্যাচার! এক সকালে মিলিটারিদের একজন এসে আমার হাতে বিশাল সাইজের একটা সাগরকলা ধরিয়ে দিয়ে বলল, তোমাকে কাল সকালে গুলি করে মারা হবে। এটা তোমার জন্যে ভালো। তুমি যদি নিরপরাধ হও, সরাসরি বেহেশতে চলে যাবে। আর যদি অপরাধী হও, তাহলে মৃত্যু তোমার প্রাপ্য শাস্তি।

এইসব ঘটনা আমি নানান সময়ে নানান পত্র-পত্রিকায় লিখেছি। মুক্তিযুদ্ধের আনন্দ, বেদনা, হতাশা, গ্লানি নিয়ে বেশ কিছু ছোটগল্প লিখেছি। কয়েকটা উপন্যাসও লিখেছি। একসময় মনে হলো, মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় ধরে রাখার জন্যে একটা উপন্যাস লেখা উচিত। মানুষকে যেমন পিতৃঋণ-মাতৃঋণ শোধ করতে হয়, দেশমাতার ঋণও শোধ করতে হয়। একজন লেখক সেই ঋণ শোধ করেন লেখার মাধ্যমে।

লেখা শুরু করলাম। *জোছনা ও জননীর গল্প* ধারাবাহিকভাবে ভোরের কাগজে ছাপা হতে লাগল। আমি কখনোই কোনো ধারাবাহিক লেখা শেষ করতে পারি না। এটিও পারলাম না। ছয়-সাত কিস্তি লিখে লেখা বন্ধ করে দিলাম। দু'বছর পর আবার শুরু করলাম। আবারো কয়েক কিস্তি লিখে লেখা বন্ধ। আর লেখা হয় না। অন্য লেখা লিখি, নাটক বানাই, সিনেমা বানাই, মুক্তিযুদ্ধের লেখাটা আর ধরা হয় না। মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে— তখন নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেই যে, লিখব একদিন লিখব। ব্যস্ততা কমলেই লেখা শুরু করব। এখনো সময় আছে। অনেক সময়।

একদিন হঠাৎ টের পেলাম অনেক সময় আমার হাতে নেই। সময় শেষ হয়ে গেছে। *জোছনা ও জননীর গল্প* আর লেখা হবে না। তখন আমি শুয়ে আছি সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হসপিটালের একটা ট্রলিতে। দু'জন নার্স ট্রলি ঠেলে আমাকে অপারেটিং টেবিলে নিয়ে যাচ্ছেন। ওপেন হার্ট সার্জারি হবে। আমাকে একটা ঘুমের ইনজেকশন দেয়া হয়েছে। চোখের পাতা ভারী হতে শুরু করেছে। হাসপাতালের আলোর তীব্রতা দ্রুত কমে যাচ্ছে।

যখন অচেতন হতে শুরু করেছি, তখন মনে হলো *জোছনা ও জননীর গল্প* তো লেখা হলো না। আমাকে যদি আর একবার পৃথিবীতে ফিরে আসার সুযোগ দেয়া হয়— আমি এই লেখাটি অবশ্যই শেষ করব। অচেতন হবার আগ মুহূর্তে হঠাৎ আনন্দে অভিভূত হলাম। কারণ তখনই প্রথম টের পেলাম আমি আসলেই একজন লেখক। মৃত্যুর খুব কাছাকাছি যাবার আগের মুহূর্তে অসমাপ্ত লেখার চিন্তাই ছিল আমার একমাত্র চিন্তা।

দেশে ফিরে লেখায় হাত দিলাম। শরীর খুব দুর্বল। দিনে দুই তিন পাতার বেশি লিখতে পারি না। এইভাবেই লেখা শেষ করেছি। এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে, আমি দেশমাতার ঋণ শোধ করার চেষ্টা করেছি। এই আনন্দের কোনো সীমা নেই।

জোছনা ও জননীর গল্প কোনো ইতিহাসের বই না, এটা একটা উপন্যাস। তারপরেও ইতিহাসের খুব কাছাকাছি থাকার চেষ্টা আমি করেছি। সেখানেও ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে।

হওয়াটাও স্বাভাবিক। উপন্যাস যেহেতু কোনো আসমানী কিতাব না, এইসব ভুল-ভ্রান্তি দূর করার উপায় আছে।

উপন্যাসে চরিত্র হিসেবে সেই সময়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু মানুষজন এনেছি। এই স্বাধীনতা একজন ঔপন্যাসিকের আছে। গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের চরিত্র ফুটিয়ে তোলায় কোনো ভুল যদি করে থাকি, তার জন্যে আগেভাগেই ক্ষমা চাচ্ছি। অতি বিনয়ের সঙ্গে সেই বিখ্যাত উক্তি মনে করিয়ে দিচ্ছি— একজন লেখক যা লিখবেন, সেটাই সত্যি।

"সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সব সত্য নহে।
কবি, তব মনোভূমি রামের জনম স্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো॥"

উপন্যাসে বর্ণিত প্রায় সব ঘটনাই সত্যি। কিছু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। কিছু অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে ধার নেয়া। প্রকাশিত হবার আগেই এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি অনেককে পড়িয়েছি। যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখে নি (এই প্রজন্মের পাঠকদের কথা বলছি) তারা পড়ার পর বলেছে— উপন্যাসের অনেক ঘটনাই তাদের কাছে কাল্পনিক বলে মনে হচ্ছে, এরকমও কি হয়?

তাদের কাছে আমার একটাই কথা— সে বড় অদ্ভুত সময় ছিল। স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের মিশ্র এক জগৎ। সবই বাস্তব, আবার সবই অবাস্তব। আমি সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর সুররিয়েলিস্টিক সময় পার করে এসেছি। তার খানিকটাও যদি ধরে থাকতে পারি, তাহলেই আমার মানবজীবন ধন্য।

জোছনা ও জননীর গল্প বইটি লেখার ব্যাপারে নানান তথ্য দিয়ে যারা আমাকে সাহায্য করেছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রকাশিত বইগুলি আমাকে খুব সাহায্য করেছে। বিশেষ করে উল্লেখ করছি রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদীর লেখা *৭১-এর দশমাস* গ্রন্থটি। দীর্ঘ দশমাসের প্রতিদিনের ঘটনা তিনি খুব সুন্দর করে সাজিয়েছেন। লেখক-লেখিকাদের ডায়েরির মতো লেখা বইগুলিও আমাকে সাহায্য করেছে। ঢাকা শহরে প্রতিদিন কী ঘটছিল ডায়েরি পড়ে তা বোঝা যাচ্ছিল। তবে এই প্রসঙ্গে ছোট্ট একটা খটকার কথাও বলি। ডায়েরি জাতীয় গ্রন্থগুলি পড়ে আমার মনে হয়েছে সেগুলি তখনকার লেখা না। পরে তারিখ দিয়ে সাজানো হয়েছে। কারণ একজন কোনো একটি বিশেষ দিনে লিখছেন— ঢাকা শহরে সকাল থেকেই প্রবল বর্ষণ, আরেকজন একই দিনে লিখছেন— কঠিন রোদ। রোদে ঢাকা শহর ঝলসে যাচ্ছে। একজন লিখছেন— এই মাত্র খবর পেলাম প্রবাসী সরকার শপথ

নিয়েছে। অথচ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়েছে তার দু'দিন পরে। ডায়েরি রচনায় রাজনৈতিক মতাদর্শও কাজ করেছে। কারো কারো ডায়েরিতে প্রতিদিনকার সমস্ত খুঁটিনাটি আছে, কিন্তু জিয়াউর রহমান নামের একজন মেজর যিনি কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার যুদ্ধে সবাইকে আহ্বান করেছেন সেই উল্লেখ নেই। তাঁর নামটিও নেই।

জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের বিখ্যাত ভাষণ প্রসঙ্গেও একই ব্যাপার। জাস্টিস মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সাহেবের বিখ্যাত গ্রন্থ *বাংলাদেশের তারিখ* প্রথম সংস্করণে তিনি উল্লেখ করেছেন ভাষণের শেষে শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, 'জয় বাংলা। জিয়ে পাকিস্তান।' দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি 'জিয়ে পাকিস্তান' অংশটি বাদ দিলেন। কবি শামসুর রাহমানের লেখা আত্মজীবনী যা দৈনিক জনকণ্ঠে 'কালের ধুলোয় লেখা' শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে সেখানেও তিনি বলেছেন শেখ মুজিবুর রহমানের শেষ কথা ছিল 'জিয়ে পাকিস্তান'। আরো অনেকের কাছে আমি এ ধরনের কথা শুনেছি, যারা আওয়ামী ভাবধারার মানুষ। সমস্যা হলো আমি নিজে ৮ এবং ৯ মার্চের সমস্ত পত্রিকা খুঁজে এরকম কোনো তথ্য পাই নি। তাহলে একটি ভুল ধারণা কেন প্রবাহিত হচ্ছে?

বঙ্গবন্ধু যদি 'জিয়ে পাকিস্তান' বলে থাকেন তাহলে তাতে দোষের কিছু নেই। তিনি যা বলেছেন অবশ্যই ভেবে চিন্তেই বলেছেন। পাকিস্তানের সঙ্গে তাঁর আলোচনার পথ খোলা রাখতে হবে। তাঁকে সময় নিতে হবে। ৭ই মার্চে যুদ্ধ ঘোষণার মতো অবস্থা তাঁর ছিল না। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ গেটেসবার্গ এড্রেসের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। এখানে কোনো অস্পষ্টতা থাকা বাঞ্ছনীয় না।

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের দলিলের পনেরো খণ্ডের মধ্যে সাতটি খণ্ড আমি মন দিয়ে পড়েছি। আমার উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের দলিল থেকে সরাসরি অনেক অংশ ব্যবহার করেছি। এই দলিল নিয়েও আমার কিছু খটকা আছে। একটি শুধু বলি— রাজারবাগ পুলিশ লাইনে বন্দি তরুণীদের উপরে নির্যাতনের সাক্ষ্য গ্রন্থবদ্ধ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে তাদেরকে পায়ে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হতো। যে তরুণীদের রাখা হয়েছে ভোগের জন্যে তাদেরকে এভাবে ঝুলিয়ে রাখার পেছনের যুক্তি আমার কাছে পরিষ্কার না। তারপরেও ধরে নিলাম তাই করা হয়েছে। যা আমার কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য না তা হলো সাক্ষ্যদানকারী বলছেন এইসব তরুণীদের সঙ্গে বই-খাতা-কলম ছিল। অর্থাৎ স্কুল বা কলেজে যাবার পথে তাদের ধরা হয়েছে। যে ভয়ঙ্কর সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে-সময়

স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সবই বন্ধ। বইখাতা নিয়ে কারো বাইরে যাবার প্রশ্নই উঠে না। আমার ধারণা সাক্ষ্যপ্রমাণমূলক তথ্যগুলি ভালোমতো যাচাই করা হয় নি। তাছাড়া জাতিগতভাবেও আমরা অতিকথন পছন্দ করি।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর কার্যক্রম ছোট করে দেখানোর একটি প্রবণতাও আমাদের আছে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর কেউ যদি বাংলাদেশে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস এবং ছোটগল্প পড়ে যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা করতে চায় তাহলে তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিষয়ে কিছুই জানবে না। আমাদের গল্প উপন্যাসে বিদেশী সৈন্যবাহিনীর বিষয় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। লেখকরা হয়তো ভেবেছেন এতে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবের হানি হবে।

ঋণ স্বীকারে অগৌরবের কিছু নেই। মহান জাতি এবং মহান মানুষরাই ঋণ স্বীকার করেন। আমি আমার বইটিতে আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্যে যেসব ভারতীয় সৈন্য প্রাণ দিয়েছেন তাদের একটি তালিকা দিতে চেয়েছিলাম, যাতে পাঠকরা এই দীর্ঘ তালিকা পড়ে একবার শুধু বলেন— 'আহারে!'

তালিকা শেষপর্যন্ত দিলাম না, কারণ তাতে বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা আরো একশ' বাড়ত। তাছাড়া এই তালিকা যুক্ত করলে অবশ্যই যুদ্ধে শহীদ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সেসময়কার ইপিআর (বর্তমান বিডিআর), পুলিশ বাহিনী, আনসার বাহিনী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা দিতে হতো। আপনারা শুনে বিস্মিত হবেন, পূর্ণাঙ্গ তালিকা আমাদের হাতে নেই। এখনো তৈরি হচ্ছে। তেত্রিশ বছর আগে যুদ্ধ শেষ হয়েছে। তালিকা তৈরির কাজ শেষ হয় নি। কবে শেষ হবে?

বীরশ্রেষ্ঠ তালিকার দিকে আমি প্রায়ই তাকাই। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলি। এই তালিকায় একজনও বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা নেই। অথচ আমি জানি এবং খেতাব যারা দিয়েছেন তারাও জানেন, বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই অসাধারণ সাহস দেখিয়েছেন। যুদ্ধের ট্রেনিং বা অভিজ্ঞতা ছাড়াই তাঁরা যা করেছেন তার তুলনা হবে না। অথচ এরা কেউ স্বীকৃতি পান না। কেন না?

আমার এই বইটির অসম্পূর্ণতার মধ্যে একটি হলো আমি পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা অত্যাচারিত নারীদের বিষয়টি আনতে পারি নি। বিষয়টি এতই স্পর্শকাতর এবং এতই কষ্টকর যে কিছুতেই লিখতে পারলাম না। আশা করছি অন্যরা লিখবেন। তাদের কলমে এইসব হতভাগ্য তরুণীর অশ্রুজল উঠে আসবে।

এখন নিতান্তই ব্যক্তিগত একটি বিষয় উল্লেখ করি, আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে আমার জন্মদিনে গুলতেকিন আমাকে একটা খাতা উপহার দিয়েছিল। স্পাইরেল বাইন্ডিং করা পাঁচশ পৃষ্ঠার নীল মলাটের খাতা। তার অনুরোধ ছিল প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা করে হলেও যেন আমি খাতাটায় মুক্তিযুদ্ধের একটা বড় উপন্যাস লিখি।

সারা জীবনই গুলতেকিনকে অসুখী করেছি। মনে হয় আজ সে খুশি হবে।

পরম করুণাময় আমাকে এই গ্রন্থটি লেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাঁর প্রতি জানাচ্ছি আমার অসীম কৃতজ্ঞতা। দল-মত-ধর্ম সবকিছুর উর্ধ্বে একটি সুখী সুন্দর বাংলাদেশের কামনা করে পূর্বকথা শেষ করছি।

হুমায়ূন আহমেদ

নুহাশ পল্লী
গাজীপুর

মূর্ছনা
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
suman_ahm@yahoo.com

নীলগঞ্জ হাইস্কুলের আরবি শিক্ষক মাওলানা ইরতাজউদ্দিন কাশেমপুরী কমলাপুর রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর বয়স প্রায় ষাট। স্থূলকায় বেঁটেখাটো মানুষ। মুখভর্তি দাড়ি। দাড়ির রঙ সাদাও না কালোও না। সাদা-কালোর মাঝামাঝি। মাথা সম্পূর্ণ কামানো। জুম্মাবার সকালে নাপিত এসে তাঁর মাথা কামিয়ে দিয়ে যায়। কামানো মাথায় না-কি পাগড়ি পরতে সুবিধা। শুক্রবারে তিনি পাগড়ি পরেন। চোখে সুরমা দেন। কানের লতিতে সামান্য আতর দেন। জানু পর্যন্ত লম্বা পিরান পরে জুম্মার নামাজে ইমামতি করতে যান। গত পনেরো বছর ধরেই তিনি এই কাজ করছেন। নীলগঞ্জ জুমা মসজিদের আলাদা ইমাম আছে। শুধু জুম্মার নামাজের দায়িত্ব তিনি পালন করেন।

ইরতাজউদ্দিন কাশেমপুরীর হাতে ধবধবে সাদা রঙের একটা রাজহাঁস। তিনি ডান হাতে রাজহাঁসের গলা চেপে ধরে আছেন। রাজহাঁস ছটফট করছে, পাখা ঝাপটাচ্ছে। কাশেমপুরীর মুখ থমথম করছে, কারণ ট্রেন থেকে নামার সময় এই বিশাল পক্ষী ঠোকর দিয়ে তাঁর কনুই থেকে রক্ত বের করে দিয়েছে। তাঁকে ঘিরে ছোটখাটো ভিড়। জনতা কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছে। কাশেমপুরী ও তাঁর রাজহাঁস জনতার মধ্যে একধরনের আনন্দ মিশ্রিত আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

ইরতাজউদ্দিন গম্ভীর গলায় বললেন, ব্যাপারটা কী ? আপনারা রাজহাঁস এর আগে দেখেন নাই ? যান যান, কাজে যান। অকাজে সময় নষ্ট করছেন কেন ? আপনাদের কোনো কাজ নাই ?

কাজে যাওয়ার প্রতি কারো কোনো আগ্রহ দেখা গেল না, কিংবা কারো হয়তো কোনো কাজ নেই। তারা ইরতাজউদ্দিনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের সঙ্গে আরো কয়েকজন যুক্ত হলো। এই পর্যায়ে রাজহাঁস আরেকবার ঠোকর দিল। সেই আগের জায়গায়, বাঁ হাতের কনুইয়ে। ইরতাজউদ্দিন 'বাপ রে!' বলে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। জনতার আনন্দের সীমা রইল না। তাদের প্রতীক্ষা বৃথা যায় নি। এতক্ষণে দেখার মতো ঘটনা ঘটেছে। ইরতাজউদ্দিন বিস্মিত হয়ে ভাবলেন, মানুষ তার নিজ প্রজাতির দুঃখ-কষ্টে এত আনন্দিত হয় কেন ? তিনি

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

ব্যথা পেয়েছেন। এতে অন্যরা আনন্দিত হবে কেন ? এর মধ্যে রহস্যটা কী ? ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা নিয়ে একসময় ভাবতে হবে। এখন কিছুই ভাবা যাবে না। মাথা গরম হয়ে আছে। এর মধ্যে একজন উপদেশ দিতে এগিয়ে এলো। গম্ভীর গলায় উপদেশ দিল। জাতি হিসেবে বাঙালির উপদেশপ্রীতি আছে।

চাচামিয়া, ঠোঁট চাইপ্যা ধরেন। ঠোঁট চাইপ্যা ধরলে আর ঠোকর দিব না।

ইরতাজউদ্দিন ক্লান্ত গলায় বললেন, আমার যা করার আমি করব। এ নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আপনি কথা বলবেন না।

উপদেশদাতার উৎসাহ তাতে কমল না। সে জনতার দিকে তাকিয়ে বলল, জোড়া সাথে না থাকনে এই অবস্থা। জোড়া সাথে থাকলে রাজহাঁস শান্ত থাকে। মাওলানা সাব, এর জোড়াটা কই ?

ইরতাজউদ্দিন কটমট করে তার দিকে তাকালেন। জবাব দিলেন না।

www.MurchOna.com

ফাল্গুন মাসের শুরু। রাত এগারোটার মতো বাজে। গ্রামে এই সময়ে শীত থাকে। নীলগঞ্জে তাঁকে কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমুতে হয়। এখানে ভ্যাপসা গরম। আকাশে মেঘ আছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ফাল্গুন মাসে এরকম ভ্যাপসা গরম থাকার কথা না। আকাশে মেঘ থাকার জন্যেই বোধহয় এই অস্বাভাবিক উত্তাপ। বিদ্যুৎ যেভাবে চমকাচ্ছে তাতে মনে হয় বৃষ্টি নামবে। বৃষ্টি নামলেও সমস্যা। তিনি ছাতা আনেন নি। বাইরে বের হলে তিনি সবসময় ছাতা সঙ্গে রাখেন। এবারই ভুল করে ছাতা আনেন নি। বয়স যে হচ্ছে এটা তার লক্ষণ। বয়সকালেই মানুষ ছোটখাটো ভুল করতে থাকে। ছোটখাটো ভুল করা যখন অভ্যাস হয়ে যায় তখন করে বড় ভুল।

ইরতাজউদ্দিনের গায়ে তসরের গলাবন্ধ কোট। গলায় মাফলার। গরমে তার গা ঘেমে যাচ্ছে। কে জানত ঢাকা শহরে ফাল্গুন মাসের শুরুতে শীত থাকে না। শহরে মানুষ বেশি হয়ে গেছে। মানুষের শরীরের গরমে শহর গরম। কত লক্ষ লোক এখন এই শহরে বাস করছে কে জানে! সংখ্যাটা জানা থাকা দরকার।

তাঁর পানির পিপাসা হচ্ছে। পানি কোথায় পাওয়া যায় ইরতাজউদ্দিন জানেন না। এরা এত বড় স্টেশন বানিয়ে রেখেছে কিন্তু পানির ব্যবস্থা রাখে নি। পুটলা-পুঁটলি, পানির পিপাসা এবং কনুইয়ে হাঁসের কামড় নিয়ে তিনি বড়ই বিব্রত বোধ করছেন। তাঁকে যেতে হবে মালিবাগ। ১৮/৬ পশ্চিম মালিবাগ, গলির ভেতর বাসা। আগে একবার মাত্র এসেছেন, এখন খুঁজে পাবেন কিনা কে জানে। ঢাকা শহরের সব গলি তাঁর কাছে একরকম লাগে। শুধু গলি কেন, এই

suman_ahm@yahoo.com

শহরের মানুষগুলিও একরকম লাগে। মানুষ তো না, যেন মানুষের ছায়া। মানুষের সঙ্গে মানুষের তফাত করা যায়, ছায়ার সঙ্গে ছায়ার তফাত করা যায় না। ঢাকা হলো ছায়ামানুষের দেশ। ছায়ানগরী।

কমলাপুর থেকে মালিবাগ এক টাকা ভাড়ায় ইরতাজউদ্দিন একটা রিকশা জোগাড় করে ফেললেন। রিকশাওয়ালা তাঁকে ঠকালো কিনা তিনি বুঝতে পারছেন না। ঢাকা শহরে তাঁর আসা হয় না। রিকশা ভাড়া সম্পর্কে তাঁর ধারণা নেই। তিনি কাউকে ঠকাতে চান না। কারো কাছ থেকে ঠকতেও চান না। শহরের মানুষ অন্যকে ঠকাতে ভালোবাসে।

রিকশাওয়ালা ভাই, আপনার নাম কী ?

বদরুল।

শুনেন ভাই বদরুল, এক টাকার বদলে আমি আপনাকে দুই টাকা দেব, আপনি বাসাটা খুঁজে বের করে দেবেন। আমার কাছে ঠিকানা আছে— ১৮/৬ পশ্চিম মালিবাগ। রাজি আছেন ? রাজি থাকলে বলেন, আলহামদুলিল্লাহ। রাজি না থাকলে কোনো কথা বলার প্রয়োজন নাই।

বাসা রেল গেইটের লগে ?

এইসব আমার কিছুই মনে নাই। একবার মাত্র এসেছিলাম। শুধু মনে আছে বাসার সঙ্গে একটা ছাতিম গাছ আছে। মরা গাছ। ছাতিম হলো পল্লী গ্রামের গাছ। এরা শহরে বাঁচে না বলেই মরা।

উঠেন দেহি আল্লাহ ভরসা।

আপনাকে আলহামদুলিল্লাহ বলতে বলেছিলাম, বলেন আলহামদুলিল্লাহ।

রিকশাওয়ালা বিস্মিত গলায় বলল, আলহামদুলিল্লাহ।

রাত কম হয় নি অথচ দোকানপাট খোলা, রাস্তায় প্রচুর লোক, চায়ের দোকানে গান বাজছে। এর মানে কী ? এরকম কি সারারাতই চলবে ? এরা রাতে ঘুমুবে না ? কিছুদূর যেতেই তাঁর রিকশা একটা মিছিলের মধ্যে পড়ে গেল। বড় কিছু না, পঁচিশ-ত্রিশজনের মিছিল। তবে তাদের সবার হাতেই মশাল। মশাল থেকে আলো যত না বের হচ্ছে তারচে' বেশি বের হচ্ছে ধোঁয়া। প্রত্যেকের মুখ ঘামে চকচক করছে। তাদের গলা তত জোরালো না। মনে হয় অনেকক্ষণ মিছিল করে তারা ক্লান্ত।

বদরুল রাস্তার একপাশে রিকশা দাঁড় করিয়ে কৌতূহলী চোখে মিছিলের দিকে তাকিয়ে রইল। তারা একটাই স্লোগান দিচ্ছে— 'জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো'। ইরতাজুদ্দিন ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলেন— এটা কেমন স্লোগান ?

'জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো' কেন ? স্লোগান হওয়া উচিত শান্তিবিষয়ক— 'নেভাও নেভাও আগুন নেভাও'।

মিছিল দেখে রাজহাঁস উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। লাফ দিয়ে নেমে পড়তে চাচ্ছে। ইরতাজউদ্দিন বিরক্তমুখে হাঁসের গলা চেপে ধরে বসে আছেন। রাজহাঁস অবাক হয়ে মিছিলের মশাল দেখছে। তার জীবন কেটেছে কুপি এবং চাঁদের আলোর আশপাশে। মশালের আলোয় সে ইরতাজউদ্দিন সাহেবের মতোই অভ্যস্ত নয়। মাঝে মাঝেই সে ডানা ঝাপটাচ্ছে।

মিছিল হুট করে একটা গলির ভেতর ঢুকে গেল। হঠাৎ চারদিক শান্ত হয়ে গেল। রিকশাওয়ালা রিকশা চালাতে শুরু করল। খুশি খুশি গলায় বলল, রাজহাঁসটার দাম কত হইছে ছার ?

ইরতাজউদ্দিনের মন খারাপ হয়ে গেল। শহরের মানুষ সবকিছু বিবেচনা করে দাম দিয়ে। ভালো কিছু দেখলে প্রথমেই সে দাম জিজ্ঞেস করবে।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, হাঁসটা ঘরের, খরিদ করি নাই। আমার ছোটভাই থাকে মালিবাগে, তার জন্য নিয়ে যাচ্ছি। না, ঠিক তার জন্য না। তার একটা মেয়ে আছে, এপ্রিল মাসে তার বয়স হবে চার। তার জন্য নিয়ে যাচ্ছি। শিশুরা পশুপাখি পছন্দ করে।

ও।

শহর বন্দরে থাকে, এইসব জিনিস তো দেখে না।

ইরতাজউদ্দিন সাহেব লক্ষ করলেন তাঁর ক্ষুধাবোধ হয়েছে। নানান উদ্বেগ ও উত্তেজনায় তাঁর ক্ষুধার কথা এতক্ষণ মনে হয় নি, এখন ক্ষুধা জানান দিচ্ছে। সন্ধ্যায় কিছু খাওয়া হয় নি। রাত হয়েছে মেলা। বারোটার কম না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিধে সহ্য করার ক্ষমতাও মানুষের কমে যায়। বয়সে শুধু যে শরীর ভাঙে তাই না, শরীরের ভেতরে যে আত্মা বাস করে সেই আত্মাও ভাঙতে থাকে। আত্মা ক্ষতিগ্রস্ত হবার কারণে বুড়োরা নিজের অজান্তেই ভ্রান্তির জগতে চলে যায়। তিনি নিজেও চলে গিয়েছেন কিনা কে জানে। একমাত্র সত্যবাদীতাই ভ্রান্তির জগতে প্রবেশে বাধা দেয়। তিনি এই কারণেই সত্য কথা বলেন। গত কুড়ি-পঁচিশ বছরে তিনি মিথ্যা বলেছেন— এরকম মনে পড়ে না।

মালিবাগে অনেকক্ষণ ধরেই রিকশা ঘুরছে। বাসা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নাম্বারের কোনো ঠিকঠিকানা নেই। এই তেরো নম্বর বাড়ি, পরেরটাই একশ' এগারো। মাঝখানের নম্বরগুলি গেল কোথায় ? পশ্চিম মালিবাগ যদি থাকে তাহলে পূর্ব মালিবাগও থাকার কথা। পূর্ব মালিবাগ বলে কিছু নেই। আশ্চর্য

www.MurchOna.com

কথা। গলিতে লোকজন তেমন নেই, মাঝে মাঝে যে দু'একজনকে পাওয়া যাচ্ছে তারা এই পৃথিবীতে বাস করে বলেই মনে হয় না। ১৮/৬ বাসাটা কোথায় ?— জিজ্ঞেস করার পর অবাক হয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে, তারপর হাই তোলে। বিস্মিত মানুষ হাই তুলতে পারে না। এদের বিস্ময় যেমন মেকি, হাইটাও তেমনি মেকি। শহরের সবকিছুই মেকি।

এতক্ষণ ধরে মাফলার পরে থাকায় গলা চুলকাচ্ছে। দুটা হাতই বন্ধ, গলা চুলকানো সম্ভব না। মানুষের তিনটা করে হাত থাকলে ভালো হতো। তিন নম্বর হাতটা সময়ে অসময়ে কাজে ল্যাগত। এই ধরনের অদ্ভুত চিন্তা মাথায় আসায় ইরতাজউদ্দিন মনে খুবই দুঃখ পেলেন। আল্লাহপাক অনেক চিন্তা-ভাবনা করে মানুষ বানিয়েছেন। তিনি যদি মনে করতেন মানুষের তিনটা হাত প্রয়োজন, তিনি তিনটাই দিতেন। ইরতাজউদ্দিন মনে মনে তিনবার বললেন, তওবা আস্তাগফিরুল্লাহ।

রাজহাঁসটা বড়ই যন্ত্রণা করছে। তিনি গলা চেপে ধরে আছেন এই অবস্থাতেও কামড়াতে চেষ্টা করছে। দুটা হাঁস আনেন নি। তাঁর দুটা আনারই পরিকল্পনা ছিল। একটাকে ধরা গেল না। মেয়ে-হাঁসটা ধরা পড়ল। তার পুরুষ সঙ্গী ঝাঁপিয়ে পড়ল পুকুরে। বেচারা এখন বোধহয় সঙ্গিনীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। জোড় ভেঙে একটাকে আনা ঠিক হয় নি। ইরতাজউদ্দিনের মন খারাপ লাগছে। বোবা প্রাণী মনের কষ্টের কথা কাউকে বলতে পারবে না। একজন আরেকজনকে খুঁজবে। মানুষের নিষ্ঠুরতায় ব্যথিত হবে। তারপরেও তাকে বাস করতে হবে মানুষের সঙ্গে। এই তাদের নিয়তি।

বাসা শেষপর্যন্ত পাওয়া গেল। এই তো লেখা— ১৮/৬। এই তো ছাতিম গাছ। আগে যেমন মরা মরা ছিল, এখনো মরা মরা। ইরতাজউদ্দিন সাহেব রিকশাওয়ালাকে দুই টাকার বদলে অতিরিক্ত একটা আধুলি দিলেন। তাঁর ইচ্ছা করছে এক টিন মুড়িও দিয়ে দিতে। শাহেদের কথা মনে করে এনেছেন বলে দিতে পারছেন না।

বদরুল মিয়া।

জি ছার।

আপনি অনেক কষ্ট করেছেন। আমি আপনার জন্য খাস দিলে দোয়া করব।

বদরুল গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল, আপনি আজিব লোক।

আজিব কেন ?

বখশিশ দিলেন। আবার দোয়া করলেন। কেউ এমুন করে না।

ইরতাজউদ্দিন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললেন, আমরা সবাই আজিব। আমি যেমন আজিব, আপনিও আজিব। আল্লাহপাক আজিব পছন্দ করেন বলেই এই দুনিয়ায় আজিবের ছড়াছড়ি।

বাসার সবাই ঘুমে।

ঘর অন্ধকার। গেট তালাবন্ধ। ইরতাজউদ্দিন বিরক্ত হচ্ছেন। শহরের লোকজনের অবিশ্বাস দেখে বিরক্ত। গেটে তালা দেওয়ার দরকার কী?

অনেকক্ষণ গেট ধরে ধাক্কাধাক্কি এবং উঁচু গলায় 'শাহেদ' 'শাহেদ' বলে চিৎকারের পর ঘরের ভেতরে বাতি জ্বলল। অপরিচিত একজন লোক দরজা খুলে বের হয়ে এসে বললেন, কে?

লোকটা লম্বা ও ফর্সা। গলার স্বর মেয়েলি। গলার স্বর শুনে বোঝা যাচ্ছে তিনি ভয় পেয়েছেন।

আপনি কে?

আমি ইরতাজউদ্দিন। নীলগঞ্জ থেকে আসছি। এসিসটেন্ট হেডমাস্টার, আরবি ও ধর্ম শিক্ষক। নীলগঞ্জ হাইস্কুল।

কাকে চান?

শাহেদের কাছে এসেছি। আমি শাহেদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আপনাকে সালাম দিতে ভুলে গেছি। গোস্তাকি মাফ হয়। আসসালামু আলায়কুম।

লোকটি এতক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। এখন দরজার আড়ালে চলে গেলেন। তবে দরজা খোলা, লোকটাকে এখনো দেখা যাচ্ছে। যে-কোনো কারণেই হোক তিনি ভয় পাচ্ছেন। তাঁকে দেখেও লোকজন ভয় পেতে পারে— এই চিন্তাটা ইরতাজউদ্দিনকে পীড়িত করছে। কী করে তিনি লোকটার ভয় ভাঙাবেন তাও বুঝতে পারছেন না। লোকটা সালামের জবাব দেয় নাই। এটা তো ঠিক না। সালাম হচ্ছে শান্তির আদান-প্রদান।

শাহেদ নামে কেউ এই বাড়িতে থাকেন না।

থাকেন না মানে?

উনি চলে গেছেন। আমি নতুন ভাড়াটে।

কোথায় গেছে জানেন?

না।

কেউ কি জানে?

আমি জানি না কেউ জানে কি-না।

www.MurchOna.com

ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করার উপক্রম করেছেন। ইরতাজউদ্দিন ক্লান্ত গলায় বললেন, ভাইসাহেব, আপনি একটু আসবেন এদিকে। গেটটা খুলবেন ?

কেন ?

আমার সঙ্গে একটা রাজহাঁস ছিল, ঐটা আপনাকে দিয়ে যেতাম।

রাজহাঁস ?

শাহেদের বাচ্চার জন্যে এনেছিলাম। এত রাতে এই হাঁস নিয়ে কোথায় ঘুরব ? হাঁসটা আপনি গ্রহণ করলে আমার উপকার হয়।

অন্যের হাঁস আমি খামাখা রাখব কেন ?

আপনার ঘরেও নিশ্চয়ই বাচ্চা-কাচ্চা আছে, তারা খুশি হবে।

ভদ্রলোক দরজার আড়াল থেকে বের হয়ে এলেন। দরজার ফাঁকে তার স্ত্রীর মুখ দেখা যাচ্ছে। তিনিও কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছেন হাঁসটার দিকে। ইরতাজউদ্দিন ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, এই রাজহাঁসটা আর জিনিসগুলি রাখলে আমি খুশি হবো। অস্বস্তি বোধ করার কিছুই নেই। হাঁসটা নিয়ে আমি বিপদে পড়েছি।

দরজার ফাঁকে চৌদ্দ-পনেরো বছরের অপরূপ রূপবতী একটি কিশোরীর মুখ দেখা গেল। মেয়েটির নাম রত্নেশ্বরী, সে ভিকারুন নিসা নুন স্কুলে ক্লাস টেন-এ পড়ে। রত্নেশ্বরী বড়ই অবাক হয়েছে। তার জীবনে এমন বিস্ময়কর ঘটনা আর ঘটে নি। রাতদুপুরে সাধু সাধু চেহারার এক লোক এসে তাদের রাজহাঁস দিতে চাচ্ছে। আগামীকাল ক্লাসে গল্পটা কীভাবে বলবে, তা ভেবেই তার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। গল্পটা অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না। সন্ন্যাসী ধরনের এই লোকটার একটা ছবি তুলে রাখতে পারলে ভালো হতো।

রত্নেশ্বরী ফিসফিস করে তার মাকে বলল, মা, এই হাঁসটা কি আমরা রাখব ?

রত্নেশ্বরীর মা নিচু গলায় বললেন, জানি না। দেখি তোর বাবা কী বলেন।

ভদ্রলোক কে মা ?

জানি না।

ইরতাজউদ্দিন সাহেব রত্নেশ্বরীর বাবার দিকে তাকিয়ে আনন্দিত গলায় বললেন, ছোট মেয়েটা কি আপনার কন্যা ? বড়ই মিষ্টি চেহারা। কী নাম তোমার মা ?

রত্নেশ্বরী জবাব দেয়ার আগেই তার বাবা বললেন, আপনি এখন যান। আমরা হাঁস-ফাঁস কিছু রাখব না।

ইরতাজউদ্দিন ক্লান্ত গলায় বললেন, আচ্ছা না রাখলেন, গেটটা খুলুন। আমার বাথরুমে যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

রত্নেশ্বরীর বাবা বললেন, গেট খোলা যাবে না। আমার কাছে গেটের চাবি নাই।

কথা সত্যি না। চাবি ঘরেই আছে। ওয়ারড্রোবের উপর রাখা আছে। রত্নেশ্বরীর মা ফিসফিস করে বললেন, খুলে দাও না। বেচারা বুড়ো মানুষ। রত্নেশ্বরীর বাবা চাপা গলায় বললেন, যা বুঝো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। যাও, ভেতরে যাও। স্ত্রী-কন্যাকে ভেতরে ঢুকিয়ে তিনি শব্দ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বারান্দার বাতির সুইচ ভেতরে। ভেতর থেকে সুইচ নিভিয়ে দিয়ে বারান্দা অন্ধকার করে দেয়া হলো। ইরতাজউদ্দিন দাঁড়িয়ে রইলেন। ব্যথা ও বিস্ময়ে তিনি খানিকটা কাতর। এরা এমন করল কেন ? মানুষের প্রতি মানুষের সামান্য মমতা থাকবে না!

গেটের উপর দিয়ে তিনি রাজহাঁসটা ভেতরে ছুড়ে দিলেন। হাঁসটা থাকুক। মুড়ির টিন পুটলা-পুঁটলি সঙ্গে নিয়েই বা কী হবে ? রিকশাওয়ালাটা থাকলে তাকে দিয়ে দেয়া যেত। থাকুক পুটলা-পুঁটলি গেটের সামনে। অভাবী লোকজন এসে নিয়ে যাবে। বন্ধ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো অর্থ হয় না। তবু ইরতাজউদ্দিন দাঁড়িয়ে আছেন। তার কেন জানি মনে হচ্ছে বন্ধ দরজা আবার খুলে যাবে। পরীর মতো দেখতে কিশোরী মেয়েটা তাকে বলবে, আপনি ভেতরে আসুন। মা আপনাকে ভেতরে আসতে বলেছে।

রাজহাঁসটা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। তিনি হাঁসটাকে বললেন, যাই রে। রাজহাঁস কুৎসিত একধরনের শব্দ করল। সম্ভবত তাঁকে যাবার অনুমতি দিল। ইরতাজউদ্দিনের মনে হলো, যে পাখি যত সুন্দর তার কণ্ঠস্বর তত কুৎসিত। যেমন ময়ূর। সে দেখতে সুন্দর কিন্তু তার কণ্ঠস্বর কর্কশ। একমাত্র ব্যতিক্রম কাক। সে নিজে অসুন্দর, তার কণ্ঠস্বরও অসুন্দর।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। অসহ্য গরমের পর বৃষ্টিটা ভালো লাগছে। ইরতাজউদ্দিন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এগুচ্ছেন। বৃষ্টির মধ্যে কেমন যেন আঠালো ভাব। শরীরের যে জায়গায় পড়ছে সেখানটাই আঠা আঠা হয়ে যাচ্ছে।

তিনি গলি থেকে বের হলেন, বৃষ্টিও থেমে গেল। বড় রাস্তায় আবারো একটা মশাল মিছিল। এই মিছিলটা আগেরটার চেয়ে ছোট। না-কি আগের মিছিলটাই ঘুরে এসেছে ? ইরতাজউদ্দিন মিছিলের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করলেন।

যেন তিনি মিছিলের একজন। এই মিছিল কোন দিকে যাচ্ছে তিনি জানেন না। তিনি নিজে কোথায় যাবেন তাও জানেন না। পল্লী অঞ্চল হলে যে-কোনো একটা বাড়িতে গিয়ে বিপদের কথা বললেই আশ্রয় পাওয়া যেত। তারা অজুর পানি দিত। ভাত-ডালের ব্যবস্থা করত। গরম ধোঁয়া উঠা ভাতের সঙ্গে ডাল। একটা ঝাল কাঁচামরিচ, একটা পেঁয়াজ। ইরতাজউদ্দিনের পেট মোচড় দিয়ে উঠল। এতটা ক্ষিধে পেয়েছে তিনি বুঝতেই পারেন নি। ধোঁয়া উঠা ভাতের ছবি মাথা থেকে যাচ্ছেই না।

মিছিলের সঙ্গে তিনি কোথায় যাচ্ছেন ? কেনই বা যাচ্ছেন ? তাঁর উচিত রাতের জন্যে একটা আশ্রয় খুঁজে বের করা। এত রাতে কোনো হোটেল খুঁজে বের করা সম্ভব না। তাছাড়া হোটেলে রাত কাটাবার মতো সঙ্গতিও তাঁর নেই। সবচে' ভালো হয় কমলাপুর রেলস্টেশনে চলে যাওয়া। কোনো একটা বেঞ্চিতে শুয়ে রাতটা পার করে দেয়া। স্টেশনের আশেপাশে অনেক ভাতের দোকান আছে। প্রথমেই হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খেতে হবে।

একজন মশালধারী ইরতাজউদ্দিনের কাছে চলে এসেছে। পাশাপাশি হাঁটছে এবং কৌতূহলী চোখে তাঁকে দেখছে। ইরতাজউদ্দিনের ইচ্ছা হচ্ছে তাঁকে বলেন, মশাল শব্দটা আরবি, এটা জানেন ? জ্ঞান জাহির করার জন্যে বলা না। আলাপ আলোচনা শুরুর জন্যে বলা। আলাপ শুরু হলে তাকে জিজ্ঞেস করতে পারতেন— মধ্যরাতে মশাল মিছিল কেন হচ্ছে ? ইলেকশন হয়ে গেছে। জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টা আসনের মধ্যে ১৬৭টা পেয়েছে আওয়ামী লীগ। পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলি ভুট্টো পেয়েছে ৮৩টা। হয়েই তো গেছে, আর কী ? এখন কেন মধ্যরাতে 'জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো' ? হাতে মশাল আছে বলেই কি আগুনের কথা মনে আসছে ?

হাতে মশাল থাকলেই আগুন জ্বালাতে ইচ্ছা করে। হাতে তলোয়ার থাকলে কোপ বসাতে ইচ্ছা করে। বন্দুক থাকলে ইচ্ছা করে গুলি করতে। মানবচরিত্র বড়ই অদ্ভুত! আচ্ছা কারোর হাতভর্তি ফুল দিয়ে দিলে সে কী করবে ? ফুল বিলাতে শুরু করবে ?

ইরতাজউদ্দিন থমকে দাঁড়ালেন, কী আশ্চর্য, তিনি শাহেদের আগের বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। মিছিল চক্রাকারে ঘুরছে। তাকে এনে ফেলেছে আগের জায়গায়। গেটের সামনে রাখা মুড়ির টিন দু'টা নেই, তবে গেটের ভেতরে রাজহাঁসটাকে দেখা যাচ্ছে। ঘরের এক কোনায় অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আছে। এরাও বোধহয় মানুষের শরীরের গন্ধ চেনে। রাজহাঁস গোপন আশ্রয় ছেড়ে ডানা মেলে ছুটে আসছে ইরতাজউদ্দিনের দিকে। কী অপূর্ব দৃশ্য!

www.MurchOna.com

ইরতাজউদ্দিন ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে হাঁটতে শুরু করলেন। এখন গন্তব্য ঠিক করা— কমলাপুর রেলস্টেশন। রাজহাঁসটা ঘাড় ঘুরিয়ে ইরতাজউদ্দিনকে দেখছে। সে কি বিস্মিত হচ্ছে ? বিস্মিত হবার ক্ষমতা কি এদের দেয়া হয়েছে ?

শাহেদের ঠিকানা বের করতে ইরতাজউদ্দিন সাহেবের প্রায় চব্বিশ ঘন্টা লেগেছে। এই চব্বিশ ঘন্টা বলতে গেলে তার পথে পথেই কেটেছে। রাত কাটিয়েছেন কমলাপুর রেলস্টেশনে। স্টেশনের কাছেই এক মসজিদে ফজরের নামাজ পড়ে শাহেদের খোঁজে বের হলেন। সেই অনুসন্ধানের ইতি হলো রাত ন'টা পঁচিশ মিনিটে। রায়েরবাজারের গলির ভেতর পুরনো ধরনের দোতলা বাড়ি। একতলায় বাড়িওয়ালা থাকেন। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার এই বাড়ির সামনেও একটা ছাতিম গাছ। তবে এই গাছটা সতেজ। শাহেদ কি ঠিক করেছে ছাতিম গাছ নেই এমন কোনো বাড়ি সে ভাড়া করবে না ?

ইরতাজউদ্দিনের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। শাহেদকে খুঁজে বের করার পরিশ্রমে মনে হয় তার বয়স বেড়ে গেছে। চোখ টকটকে লাল। প্রচণ্ড গরমেও তার শীত শীত লাগছে, জ্বরের পূর্বলক্ষণ।

শাহেদ বিস্মিত হয়ে বলল, ভাইজান, আপনার এ-কী অবস্থা ? এরকম দেখাচ্ছে কেন আপনাকে, শরীর খারাপ নাকি ?

ইরতাজউদ্দিন ক্লান্ত গলায় বললেন, শরীর ঠিকই আছে। পরিশ্রম হয়েছে। তোমার বাসা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। শেষপর্যন্ত অফিসে গেলাম। আজ যে অফিস ছুটি তাও জানতাম না।

বাসার ঠিকানা পেলেন কী করে ?

অফিসের দারোয়ানের কাছ থেকে তোমার এক কলিগের ঠিকানা পেলাম, রহমান সাহেব। তিনি থাকেন বাসাবো নামের একটা জায়গায়। তাঁকে খুঁজে বের করলাম। তিনি আবার তোমার ঠিকানা জানেন না। তবে অন্য একজনকে চিনেন যে তোমার ঠিকানা জানে। সে এক লম্বা গল্প। শুনে লাভ নেই। বাসার লোকজন কোথায় ? রুনি, রুনির মা ?

শাহেদ ইতস্তত করে বলল, আসমানী তার মা'র বাসায় গেছে। আপনি আসার কিছুক্ষণ আগে গেল। আমার শাশুড়ির শরীর খারাপ, খবর পেয়ে গেছে।

তুই যাস নি কেন ? শাশুড়ি হলেন মাতৃসম। তার সেবা করলে মাতৃঋণ শোধ হয়। তোর জন্মের পর পর মা মারা গেলেন। তুই তো আর মাতৃঋণ শোধ করার সুযোগ পাস নাই। পিতৃঋণ শোধ না করলে চলে, মাতৃঋণ শোধ করতে

www.MurchOna.com

হয়। যাইহোক, তোদের বাথরুম কোনদিকে ? গোসল করব। অনেক নামাজ কাজা হয়েছে। ঘরে জায়নামাজ আছে ?

শাহেদ লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, জি-না। পরিষ্কার চাদর আছে, বিছিয়ে দিচ্ছি।

ইরতাজউদ্দিন গম্ভীর গলায় বললেন, নামাজ পড়িস আর না পড়িস মুসলমানের ছেলে এই কারণেই ঘরে একটা জায়নামাজ, একটা তসবি, একটা টুপি এইসব থাকা দরকার।

ভাইজান, গরম পানি লাগবে ? পানি গরম করে দেই ?

গরম পানি লাগবে না।

আপনি কি খেয়ে এসেছেন ভাইজান ?

না। তবে রাতে কিছু খাব না। জ্বর জ্বর লাগছে। উপাস দেব। উপাস হলো জ্বরের একমাত্র ওষুধ।

জ্বর গায়ে গোসল করবেন ?

বললাম না শরীর অশুচি হয়ে আছে। গোসল না করলে নামাজ পড়তে পারব না।

শাহেদের ইচ্ছা করছে তার ভাইয়ের গায়ে হাত দিয়ে জ্বর দেখতে। সাহসে কুলাচ্ছে না। তাদের ভাইয়ে ভাইয়ে দূরত্ব অনেক বেশি। ইরতাজউদ্দিনের জন্মের পর আরো পাঁচ ভাইবোনের পরের জন শাহেদ। বিস্ময়কর ঘটনা হলো, তাদের মাঝখানের পাঁচ ভাইবোন জন্মের এক মাসের ভেতর মারা গেছে। সবারই একই অসুখ— হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে শরীরে খিঁচুনি। নিঃশ্বাসের কষ্ট। জন্মের পনেরো দিনের দিন শাহেদেরও এই রোগ হলো। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। প্রবল খিঁচুনি। শাহেদের বাবা আধাপাগলের মতো হয়ে গেলেন। তিনি মসজিদে ছুটে গিয়ে ইমাম সাহেবকে বললেন, আমি আমার জীবনে একটা ভয়ঙ্কর পাপ করেছি। আমার পুত্রকন্যারা মারা যাচ্ছে— তার কারণ আর কিছু না, পাপের শাস্তি। আমি সবার সামনে অপরাধ স্বীকার করব, আল্লাহ যেন আমার পুত্রের জীবন রক্ষা করে।

জানা গেল তিনি একটা খুন করেছেন। অপরাধ স্বীকার করে তিনি পুলিশের কাছে ধরা দেন। বিচারে তার যাবজ্জীবন হয়। তিনি হাসিমুখে জেল খাটতে যান। কারণ তার কনিষ্ঠ পুত্রটির জীবন রক্ষা হয়। শাহেদের বাবার মৃত্যু হয় জেলখানাতে। ইরতাজউদ্দিন অতি অল্পবয়স থেকেই সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নেন। ছোটভাইকে প্রায় কোলে করেই তিনি বড় করেন। অনেক বয়স পর্যন্ত শাহেদ ইরতাজউদ্দিনের বুকে না শুয়ে ঘুমুতে পারত না। ক্লাস থ্রি'তে পড়ার

সময় শাহেদের একবার টাইফয়েড হলো। একুশ দিনের জ্বরের আটদিন ইরতাজউদ্দিন তাঁর ভাইকে কোলে নিয়ে বসে থাকলেন। কোল থেকে নামালেই সে চিৎকার করতে থাকে। কোলে তুলে নিলেই শান্ত। শাহেদের সঙ্গে ইরতাজউদ্দিনের সম্পর্ক ভাই-ভাই সম্পর্ক না। অনেকটাই পিতা-পুত্র সম্পর্ক।

শাহেদ বলল, ভাইজান, আপনি এক কাজ করুন। বাসার দরজা বন্ধ করে গোসল করতে যান। আমি আসমানীকে নিয়ে আসছি। বেশিক্ষণ লাগবে না। আমি যাব আর আসব।

ইরতাজউদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, সে গেছে তার অসুস্থ মাকে দেখতে, তুই তাকে নিয়ে আসবি কেন ? এটা আবার কী রকম কথা ?

শাহেদ লজ্জিত গলায় বলল, আমার শাশুড়ি ভালো আছেন ভাইজান, আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছিলাম। আসমানী আমার সঙ্গে রাগারাগি করে চলে গেছে।

ইরতাজউদ্দিন বিরক্ত চোখে ছোট ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। স্ত্রীর সঙ্গে রাগারাগি, এ কেমন কথা ? মেয়েরা হচ্ছে জন্মদাত্রী জননী। হাজার ভুল করলেও এদের উপর রাগ করতে নেই। এদের উপর রাগ করাটাই কাপুরুষতা। অক্ষম এবং দুর্বল পুরুষরাই শুধু স্ত্রীর সঙ্গে রাগারাগি করে।

ভাইজান, বেশিক্ষণ লাগবে না, একটা বেবিট্যাক্সি নিয়ে যাব আর চলে আসব।

আচ্ছা।

আসমানীর সঙ্গে শাহেদের ঝগড়ার কারণ অতি তুচ্ছ। মজার ব্যাপার হলো, তাদের সব বড় বড় ঝগড়াই তুচ্ছ কারণে হয়েছে। আজকের ঝগড়ার বিষয়বস্তু বাথরুমের ছিটকিনি। ছিটকিনি খুলে পড়ে গেছে। আসমানী কয়েক দিন ধরেই বলছে তিনটা আধ ইঞ্চি পেরেক আনতে। শাহেদ রোজই বলছে নিয়ে আসব কিন্তু আনছে না।

এই ছিটকিনি নিয়েই শাহেদের সঙ্গে আসমানীর ঝগড়া হয়ে গেল। ভয়াবহ ধরনের ঝগড়া। আজ সন্ধ্যাবেলা শাহেদ মোহাম্মদপুর বাজার থেকে চাল-ডাল কিনে ফিরেছে। ঘরে ঢোকা মাত্র আসমানী বলল, পেরেক এনেছ ?

শাহেদ পাঞ্জাবি খুলতে খুলতে বলল, পেরেক পেরেক করে তুমি দেখি আমার মাথা খারাপ করে ফেললে। কানু বিনে গীত নেই। তোমারও দেখি পেরেক ছাড়া কথা নেই। মাথার মধ্যে একটা জিনিস ঢুকলে আর বের হয় না।

আসমানী বলল, তার মানে তুমি আনো নি ?

www.MurchOna.com

না।

আনো নি কেন ?

ভুলে গেছি এই জন্যে আনি নি। সবার স্মৃতিশক্তি তো আর তোমার মতো না। সবাই তো আর হাতি না যে সব কিছু মনে থাকবে।

তার মানে কি এই যে তুমি কোনোদিনই আনবে না ?

শাহেদ গম্ভীর মুখে বলল, এখনই তোমার পেরেক এনে দেব। এটা নিয়ে আর কথা শুনতে চাই না।

এমন কী কথা আমি তোমাকে বললাম ?

যা বলেছ যথেষ্টই বলেছ।

শাহেদ হনহন করে বের হয়ে গেল। যাওয়ার সময় দরজাটা ধড়াম করে লাগিয়ে রাগ দেখিয়ে গেল। আসমানীর মনটা খারাপ হয়ে গেল। বেচারা বাজার নিয়ে ফিরেছে। এর মধ্যেই পেরেকের ব্যাপারটা না তুললেও হতো। বাড়িওয়ালার শালা মজনুকে একটা টাকা দিলে সে এনে দিত। শাহেদের যখন মনে থাকে না, তখন শুধু শুধু তাকে বিরক্ত করা কেন ? আসমানীর নিজের উপরই রাগ লাগছে। সে ঠিক করে ফেলল, শাহেদ এলে সে এমন কিছু করবে যেন সে রাগ ভুলে আচমকা খুশি হয়ে উঠে। শাহেদকে হঠাৎ খুশি করার একটা পদ্ধতি সে জানে। সমস্যা হলো পদ্ধতিটা ব্যবহার করতে তার খুব লজ্জা লাগে।

তিনটা পেরেক হলেই হয়, শাহেদ এক কেজি পেরেক নিয়ে ফিরল। পেরেকের সঙ্গে হাতুড়ি, স্ক্রুড্রাইভার। নিজেই খুটখুট করে বাথরুমের ছিটকিনি লাগাল। আসমানীকে বলল, যাও, তোমার বাথরুম ঠিক হয়েছে। এখন ছিটকিনি লাগিয়ে বাথরুমে গিয়ে বসে থাক। ঘড়ি দেখে দু'ঘণ্টা বসে থাকবে। দু'ঘণ্টার আগে যদি বের হও তোমার খবর আছে।

আসমানী আহত গলায় বলল, আমাকে বাথরুমে বসে থাকতে হবে কেন ?

বসে থাকতে হবে কারণ পেরেক এনে ছিটকিনি লাগানো হয়েছে। পেরেক, পেরেক, পেরেক! আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। দেশের কী অবস্থা! বেতন হবে কি হবে না, অফিস থাকবে কি থাকবে না— এসব নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। পেরেক পেরেক পেরেক। আমার লাইফটাকে কয়লা বানিয়ে ফেললে।

আমি তোমার জীবন কয়লা বানিয়ে ফেলেছি ?

হ্যাঁ।

আসমানীর চোখে পানি এসে গেল। চোখের এই পানি শাহেদকে কোনোক্রমেই দেখানো যায় না। সে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, আমার জন্য

www.MurchOna.com

তোমার জীবন যেন কয়লা না হয় সেই ব্যবস্থা করছি। এখন থেকে তোমার জীবন হবে চন্দনকাঠ।

বলেই রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। শাহেদ সামনে থাকলে সে দেখে ফেলবে আসমানী কাঁদছে। এটা হতে দেয়া যায় না। কাঁদতে কাঁদতেই আসমানী ডাল চড়াল, ডিমের ঝোল রান্না করল। রাত ন'টায় সহজ গলায় বলল, আমি যাচ্ছি।

শাহেদ বিস্মিত হয়ে বলল, কোথায় যাচ্ছ ?

কলাবাগানে মা'র কাছে যাচ্ছি। এখন থেকে মা'র জীবন কয়লা বানাব। তোমার মূল্যবান চন্দনকাঠ জীবন কয়লা করব না।

আসমানী, তোমার কি মনে হয় না তুমি বাড়াবাড়ি করছ ?

না, আমার সে-রকম মনে হচ্ছে না। আলমারির চাবি ড্রেসিং টেবিলে রেখে গেলাম। রুনির জামা-কাপড় পাঠিয়ে দিও। আমার কোনো কিছু পাঠাতে হবে না।

তার মানে কি পুরোপুরি বিদায় ?

হ্যাঁ।

রুনি মায়ের কোলে। গলা জড়িয়ে ধরে ঘুমুচ্ছে। এমনিতে সে রাত এগারোটা পর্যন্ত জেগে থাকে, আজ ন'টা বাজতেই ঘুম। রুনি জেগে থাকলে আসমানীর যাওয়া এত সহজ হতো না। রুনি কিছুতেই বাবাকে ছেড়ে যাবে না। শাহেদ শুকনো গলায় বলল, যেতে চাও যাবে। রাতদুপুরে যাবার দরকার দেখি না। সকাল হোক তারপর যাবে।

আসমানী বলল, কোনো অসুবিধা নেই। মজনু আমাকে পৌছে দেবে। ওকে রিকশা আনতে বলে এসেছি।

ওকে আবার কখন বললে ?

আধঘণ্টা আগে বলে এসেছি। তোমার সামনে দিয়েই গিয়েছি। তুমি খবরের কাগজ পড়ছিলে বলে দেখ নি।

আসমানীর গলার স্বরে কোনো রাগ নেই। যেন তাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া হয় নি। সবকিছু স্বাভাবিক আছে।

শাহেদ দ্রুত চিন্তা করছে। এই মুহূর্তে ঠিক কী করা উচিত ? ক্ষমা প্রার্থনা করা যেতে পারে। সেটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ক্ষমা প্রার্থনা করলেই যে লাভ হবে তাও মনে হচ্ছে না। আসমানী প্রচণ্ড রেগে গেছে। এই রাগ সহজে যাবে না। ভোগাবে। সবচেয়ে ভালো হবে রাগ কমানোর জন্যে সময় দিলে। দু'দিন পর কলাবাগানে মুখ কালো করে উপস্থিত হলেই আসমানীর রাগ

www.MurchOna.com

অনেকটা কমে যাবে। যেতে হবে গভীর রাতে, সাড়ে এগারোটা-বারোটার দিকে। গভীর রাতে যাওয়ার সুবিধা হলো, আসমানী তাকে এত রাতে একা একা বাসায় ফিরতে দেয় না।

কাজেই এই মুহূর্তে রাগ কমানোর জন্যে ব্যস্ত হবার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং নিজের রাগ খানিকটা দেখানো যেতে পারে। শাহেদ রাগ দেখানোর জন্যে কঠিন চোখে আসমানীর দিকে তাকিয়ে রইল। চেষ্টা করল পলক না ফেলে তাকিয়ে থাকতে। আসমানী স্বামীর সর্পদৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সহজ গলায় বলল, আমি যাচ্ছি। দরজা লাগিয়ে ঘুমুবে।

দরজা লাগিয়ে ঘুমাই না খোলা রেখে ঘুমাই সেটা আমার ব্যাপার। তোমাকে উপদেশ দিতে হবে না। তুমি যাও, তোমার মায়ের কোলে গিয়ে ঘুমিয়ে থাক।

দয়া করে চব্বিশ ঘণ্টা পার না হতেই আমাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে রাতদুপুরে উপস্থিত হবে না।

এত শখ আমার নাই। তুমি বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যে আমার সব শখ মিটিয়ে ফেলেছ।

শাহেদ আরো কঠিন কিছু বলতে যাচ্ছিল, সেই সুযোগ পাবার আগেই আসমানী বের হয়ে গেল। শাহেদ পরের পাঁচ মিনিট ঝিম ধরে বসে থাকল। তার মাথায় ভালো একটা আইডিয়া এসেছে। আসমানী রিকশা করে গিয়েছে। সে যদি দ্রুত বের হয়ে একটা বেবিট্যাক্সি নিয়ে কলাবাগানে চলে যায়, তাহলে মজা মন্দ হয় না। আসমানী রিকশা থেকে নেমে দেখবে— শাহেদ বারান্দায় বসে গম্ভীরমুখে খবরের কাগজ পড়ছে। হাতে চায়ের কাপ।

পরিকল্পনা কাজে লাগানো গেল না, কারণ শাহেদ যখন বেবিট্যাক্সির সন্ধানে যাবে বলে ঠিক করেছে তখনই ইরতাজউদ্দিন কাশেমপুরীর গলা শোনা গেল, শাহেদ আছ? শাহেদ? এটা কি শাহেদের বাসা?

ইরতাজউদ্দিন সাহেব কাজা নামাজ শেষ করলেন। একঘণ্টার মতো লাগল নামাজ শেষ করতে। নিজেই খবরের কাগজ খুঁজে বের করে পড়লেন। খবরের কাগজের কোনো কিছুই বাদ দিলেন না। শুধুই মিটিং-মিছিলের খবর। অফিস-আদালত কলকারখানা শেখ সাহেবের আঙুলের ইশারায় চলছে। মেয়েরা গেরিলা ট্রেনিং নিচ্ছে। রেডিও-টিভিতে জাতীয় সঙ্গীত প্রচার বন্ধ করা হয়েছে। কাগজ পড়ে আরো আধ ঘণ্টা গেল। শাহেদ ফিরল না, ইরতাজউদ্দিন সাহেব খুবই বিরক্ত হলেন। যাবে আর আসবে বলে কেউ দেড় ঘণ্টার জন্যে উধাও হয়? কথায়-কাজে মিল থাকতে হয়। গোসলের পর তার ক্ষুধা বোধ হচ্ছে। যে জ্বর

আসব আসব করছিল তা মনে হয় আপাতত সরে গেছে। ইরতাজউদ্দিন সাহেব একফাঁকে রান্নাঘর থেকে ঘুরে এলেন। খাবার থাকলে খেয়ে নেবেন। ডিমের ঝোল আছে, ডাল আছে, কিন্তু ভাত নেই। চারটা চাল তিনি নিজেই চড়িয়ে দিতে পারেন। নিজের রান্না তিনি নিজে করেন। কয়েক মুঠ চাল সিদ্ধ করা কোনো ব্যাপারই না। কিন্তু আসমানী ব্যাপারটা পছন্দ করবে না। মুখে প্রকাশ না করলেও বিরক্ত হবে। মেয়েরা কোনো এক বিচিত্র কারণে বাড়ির পুরুষদের রান্নাঘরে দেখলে বিরক্ত হয়।

ইরতাজউদ্দিনের সময় কাটছে না। তিনি বারান্দায় চলে এলেন। ছোট বারান্দা। দু'টা বেতের চেয়ার পাশাপাশি সাজানো। বারান্দা থেকে রাস্তার খানিকটা দেখা যায়। তিনি চেয়ারে বসলেন।

বারান্দায় কিছু হাওয়া আছে। বসার চেয়ারটাও আরামদায়ক। বসে থাকতে ভালো লাগছে। ঘুম ঘুম পাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়াটা ঠিক হবে না। শাহেদ এত দেরি করছে কেন ? রাত বেশি হয়ে গেলে আসমানীকে সঙ্গে নিয়ে ফেরা ঠিক হবে না। ইরতাজউদ্দিন ঝিমুতে লাগলেন। ঘুমটা কাটানো দরকার। রুনি এসে দেখবে তার বড় চাচা বারান্দায় চেয়ারে বসে হা করে ঘুমাচ্ছে। বিকট শব্দে তার নাক ডাকছে। এই দৃশ্য তার ভালো লাগবে না। সে সারাজীবন মনে করে রাখবে। বড় চাচার কথা মনে হলেই এই দৃশ্য তার চোখে ভেসে উঠবে। একটা কোনো জিনিস শিশু অবস্থায় মাথায় ঢুকে গেলে আর বের হয় না।

ইরতাজউদ্দিন ঘুম তাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। তিনি তাঁর বিয়ের দিনের কথা মনে করলেন। ঘুম তাড়াবার এটা হলো অব্যর্থ ওষুধ, কোরামিন ইনজেকশান। বিয়ের স্মৃতি একবার মনে হলে কোথায় যাবে ঘুম! তিনি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছেন— বরযাত্রী নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন বড়লেখা গ্রামে। সুন্দর করে সাজানো বিয়েবাড়ি। কলাগাছ দিয়ে একটা গেট করা হয়েছে। গেটে লেখা— 'স্বগতম'। বানানটা ভুল, আকার বাদ পড়েছে। কিন্তু বিয়েবাড়ি কেমন যেন ঝিম ধরে আছে। কন্যাপক্ষ কারো মুখে কোনো কথা নেই।

চারদিকে ফিসফাস। কানাকানি। কিছুক্ষণের মধ্যে জানা গেল কন্যার কলেরা হয়েছিল। সকাল থেকে ভেদবমি হয়ে আছরের নামাজের ওয়াক্তে মারা গেছে। তারপর শোনা গেল— এখনো মারা যায় নি, বেঁচে আছে। চিকিৎসার জন্যে তাকে সদরে নেয়া হয়েছে। তবে বাঁচার আশা ক্ষীণ। আসল খবর জানা গেল অনেক পরে। মেয়ের কলেরা হয় নি, তাকে সদরেও নেয়া হয় নি। সে পালিয়ে গেছে। তার এক দূরসম্পর্কের খালাতো ভাইয়ের সঙ্গে শেষরাতের ট্রেনে কোথায় যেন চলে গেছে।

www.MurchOna.com

ইরতাজউদ্দিন আর বিয়ে করেন নি। তাঁকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বিয়েতে রাজি করানোর তেমন চেষ্টাও কেউ করে নি। তাঁর মুরুব্বি কেউ ছিল না।

ভোররাতে যে মেয়েটি পালিয়ে গিয়েছিল, তাকে ইরতাজউদ্দিন মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখেন। স্বপ্নে সে তার স্ত্রীর মতোই আচরণ করে। স্বপ্ন দেখার সময় ইরতাজউদ্দিন লজ্জা পান। স্বপ্ন ভেঙে যাবার পরেও লজ্জা পান। স্বপ্ন ভেঙে যাবার পর তিনি আল্লাহ্‌পাকের কাছে করুণ গলায় বলেন— হে পারোয়ার দিগার! তুমি আমাকে নিয়ে কেন এই খেলা খেলছ ? আমি তো খুবই নাদান বান্দা। আমি যখন মেয়েটিকে পুরোপুরি ভুলে যাই, তখন স্বপ্নে আবার তাকে আমার কাছে নিয়ে আস কেন ? এই ধরনের হৃদয়হীন খেলা শুধু শিশুরাই খেলে। তুমি কি শিশু ?

ইরতাজউদ্দিন বেতের চেয়ারে কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বপ্নে মেয়েটিকে দেখলেন। এইবার মেয়েটির কোলে চার-পাঁচ বছরের একটি শিশু। শিশুটি দেখতে রুনির মতো। তবে খুবই রোগা। মনে হয় অসুস্থ।

মেয়েটি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, তুমি এখনো ঘুমাচ্ছ ? বাইরে কী অবস্থা তুমি জানো না ? বাড়িঘর সব জ্বালিয়ে দিচ্ছে। মিলিটারিরা সমানে গুলি করছে। নাও, ওকে কোলে নাও, চল পালাই।

ইরতাজউদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেললেন তিনি স্বপ্ন দেখছেন। ঘুম ভাঙলেই এই দৃশ্য মিলিয়ে যাবে। তিনি চেষ্টা করলেন জেগে উঠতে, চেষ্টা তেমন জোরালো না। কারণ স্বপ্নটা দেখতে তাঁর ভালো লাগছে। মেয়েটার (নাম আসমা বেগম) ভীত মুখ দেখে মজা লাগছে। কারণ তিনি জানেন যা ঘটছে স্বপ্নে ঘটছে। ভয় পাবার কিছু নেই।

এ কী, তুমি এখনো বসে আছ! মেয়েটাকে কোলে নাও। তার জ্বর।

ইরতাজউদ্দিন লজ্জিত গলায় বললেন, মেয়েটার নাম কী ?

আসমা অত্যন্ত বিরক্ত হলো। এই ভয়ঙ্কর সময়ে তুমি তামশা করছ ? নিজের মেয়ের নাম তুমি জানো না ?

এই বলেই সে চুপ করে মেয়েটাকে ইরতাজউদ্দিনের কোলে ফেলে দিল। তখন বাইরের হৈচৈ প্রবল হলো। লোকজন 'আগুন আগুন' করছে। চারদিকে ছোটাছুটি করছে। মেশিনগানের একটানা গুলির শব্দও শোনা যাচ্ছে। ইরতাজউদ্দিন মেয়েটাকে কোলে নিয়ে ছুটে রাস্তায় নেমে এলেন। রাস্তায় শত শত মানুষ। সবাই একসঙ্গে দৌড়াচ্ছে। আসমা শক্ত করে ইরতাজউদ্দিনের বাঁ হাত ধরে আছে। একজন রূপবতী তরুণী তাঁর হাত ধরে দৌড়াচ্ছে— এটা

www.MurchOna.com

একটা লজ্জাজনক দৃশ্য। অত্যন্ত দৃষ্টিকটু এবং ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে একটা সুবিধা হয়েছে, কেউ তাদের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না। রোজ-হাসরের মতো অবস্থা। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। সবাই 'ইয়া নফসি' 'ইয়া নফসি' করছে। মহাবিপদের আশঙ্কায় সবাই ভীত।

বিপদের উপর বিপদ, লোকজন যে দিকে যাচ্ছে ঠিক সেই দিক থেকেই আরো একদল মানুষ দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে। তারা 'জয় বাংলা' 'জয় বাংলা' বলে চিৎকার করছে। তাদের চিৎকারে ইরতাজউদ্দিনের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন— সত্যি সত্যি বিশাল মিছিল বের হয়েছে। রাস্তায় শত শত মানুষ। তাদের হাতে লাঠিসোটা, বর্শা। তারা আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করছে— 'জয় বাংলা' 'জয় বাংলা'। মিছিলের সঙ্গে একটা ঠেলাগাড়িও যাচ্ছে। ঠেলাগাড়ির মাঝখানে একজন পা ছড়িয়ে বসে আছে। তার হাতে একটা তলোয়ার।

ইরতাজউদ্দিন মিছিলের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর ভুরু কুঁচকে আছে। 'জয় বাংলা' বাক্যটা তাঁর ভালো লাগছে না। 'জয় বাংলা' এসেছে 'জয় হিন্দ' থেকে। এটা ঠিক না। তাছাড়া লাঠিসোটা, বল্লম দিয়ে কিছু হয় না। একশ' বছর আগেও বাঁশের কেল্লা দিয়ে তিতুমীর কিছু করতে পারে নি। শুধু শুধুই পরিশ্রম। এটা একটা আফসোস যে বাঙালি জাতি কাজে পরিশ্রম করতে পারে না, অকাজে পারে।

শাহেদ রাত বারোটার দিকে শুকনো মুখে ফিরল। সঙ্গে কেউ নেই। সে একা ফিরেছে। ইরতাজউদ্দিন বললেন, কিরে এত দেরি ? শাহেদ মাটির দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, ওদের পেলাম না ভাইজান।

পেলি না মানে কী ?

আমার শাশুড়ির এক দূরসম্পর্কের বোন থাকেন ভূতেরগলিতে। ওরা দল বেঁধে ঐ বাড়িতে গিয়েছে। এতক্ষণ অপেক্ষা করলাম যদি ফেরে। ফেরে নি। মনে হয় থেকে যাবে। মাঝে মাঝে ওরা সেখানে থেকে যায়। ঐ মহিলা রুনিকে খুব আদর করেন। ওদের কোনো বাচ্চাকাচ্চা নেই তো, রুনিকে নিজের মেয়ের মতো দেখেন। বলতে গেলে উনিই জোর করে রেখে দিয়েছেন।

ইরতাজউদ্দিনের মন আবারো খারাপ হলো। শাহেদ মিথ্যা কথা বলছে। হড়বড় করে মিথ্যা বলছে। বউ আসতে রাজি হয় নি, এটা বললেই হয়। বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা বলার দরকার কী ? মিথ্যা এমন জিনিস যে কয়েকবার বললেই অভ্যাস হয়ে যায়। তখন কারণ ছাড়াই মিথ্যা বলতে ইচ্ছা করে।

www.MurchOna.com

ভাইজান, আপনি কি শুয়ে পড়বেন ? রাত অনেক হয়েছে। শুয়ে পড়াই ভালো। বিছানা করে দেই ?

দে।

খালি পেটে ঘুমুবেন ? ক্ষুধা হয় নি ?

ক্ষুধা হয়েছে তারপরেও ইরতাজউদ্দিন বললেন, না। মিথ্যা বলা হলো। তিনি যদি বলতেন ক্ষুধা হয়েছে, তাহলে ভাত রাঁধার ব্যাপার চলে আসবে। শাহেদ বিব্রত হবে। সে তার বড় ভাইকে ভাত রাঁধতে দেবে না। নিজেই রাঁধতে গিয়ে ছেড়াবেড়া করবে। এরচেয়ে মিথ্যা বলাই ভালো। উপকারী মিথ্যা। তারপরেও মিথ্যা মিথ্যাই। অপকারী মিথ্যা যেমন দূষণীয়, উপকারী মিথ্যাও তেমনি দূষণীয়। ইরতাজউদ্দিন ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোকে ক্ষুধা হয় নি বলেছিলাম এটা ঠিক না, মিথ্যাচার করেছি। ক্ষুধা হয়েছে। তবে কিছু খাব না। শুয়ে পড়ব। বিছানা করে দে। মশারি খাটাবি না।

মশারি না খাটালে ঘুমুতে পারবেন না। খুব মশা।

থাকুক মশা। মশারির ভেতর আমার ঘুম আসে না। দমবন্ধ দমবন্ধ লাগে।

শাহেদ বসার ঘরে তার ভাইয়ের জন্য বিছানা করল। খুঁজে-পেতে একটা হাতপাখাও বের করল। ইরতাজউদ্দিন শোবার সময় অবধারিতভাবে সিলিং ফ্যান বন্ধ করে দেবেন। কারণ, ফ্যানের বাতাসেও তিনি ঘুমুতে পারেন না। ফ্যানের বাতাসে না-কি তাঁর শরীর চিড়বিড় করে।

মশা আসলেই বেশি। চারদিকে পিনপিন করছে। বাতি নেভালে কী অবস্থা হবে কে জানে। হয়তো এই গরমেও চাদর মুড়ি দিয়ে শুতে হবে। ইরতাজউদ্দিন যেসব কারণে ঢাকা আসতে চান না মশা তার একটি। তিনি ছোটভাইকে বললেন, তুই শুধু শুধু জেগে আছিস কেন ? শুয়ে পড়।

শাহেদের কিছুক্ষণ গল্প করতে ইচ্ছা করছে। দেড়টা-দুটার আগে সে কখনো ঘুমায় না। এখন বাজছে মাত্র সাড়ে বারটা। তা ছাড়া শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তার মেজাজ খারাপ হয়েছে। তার বড়ভাই এসেছেন— এটা জানার পরেও আসমানী তার সঙ্গে আসবে না, এটা ভাবাই যায় না। শাহেদ খুবই করুণ গলায় বলেছে, ভাইজান এসেছে। আস, প্লিজ আস। তার উত্তরে আসমানী বলেছে, তোমার ভাইজান এসেছে, তুমি তাকে কোলে নিয়ে বসে থাক। আমি কী জন্যে যাব ?

আসমানী এধরনের কথা বলতে পারে তা শাহেদের কল্পনার মধ্যেও ছিল না। তার খুবই মনখারাপ হয়েছে। ভাইয়ের সঙ্গে গল্প করে সে মনখারাপ-ভাবটা কাটাতে চাচ্ছে। কিন্তু ইরতাজউদ্দিনের মনে হয় গল্প করার মতো অবস্থা না।

www.MurchOna.com

শাহেদ বলল, ভাইজান, ঢাকায় কোনো কাজে এসেছেন ? না-কি বেড়াতে এসেছেন ?

কাজে এসেছি। তোদের দেখতে এসেছি, এটাও তো একটা কাজ। কাজ না ?

জি কাজ।

ভালো আতর কিনব। আতর শেষ হয়ে গেছে।

আমি আতর কিনে দেব।

তোকে কিনতে হবে না। আতরের ভালো-মন্দ তুই কী বুঝিস! আমিই কিনব। আর স্কুলের জন্যে একটা পতাকা কিনতে হবে। আগেরটার রঙ রোদে জ্বলে গেছে।

শাহেদ বিস্মিত হয়ে বলল, কী পতাকা কিনবেন ?

ইরতাজউদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, জাতীয় পতাকা। এছাড়া আর কী পতাকা আছে!

ভাইজান, পতাকা কেনাটা ঠিক হবে না।

কেন ঠিক হবে না ?

দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে— নতুন পতাকা আসবে।

হুজুগের কথা আমার সঙ্গে বলবি না। দেশ স্বাধীন হয়েই আছে। নতুন করে আবার স্বাধীন কীভাবে হবে ?

শাহেদ নরম গলায় বলল, ভাইজান, আপনি পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছেন না।

ইরতাজউদ্দিন ভাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, পরিস্থিতি তোরা বুঝতে পারছিস না। 'জয় বাংলা' 'জয় বাংলা' বলে চেঁচালেই দেশ স্বাধীন হয় না। পাকিস্তানি মিলিটারি যখন একটা ধাক্কা দিবে, তখন কোথায় যাবে 'জয় বাংলা'!

শাহেদ বলল, ভাইজান, আমি দু'একটা কথা বলি ?

ইরতাজউদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, কথা বলার দরকার নাই। যা, ঘুমুতে যা। সকালে কথা হবে। সিলিং ফ্যান বন্ধ করে দিয়ে যা।

ঢাকায় কতদিন থাকবেন ?

কাল সকালে চলে যাব ইনশাল্লাহ।

কালকের দিনটা থেকে যান।

কালকের দিনটা থেকে গেলে কী হবে ?

www.MurchOna.com

শাহেদ জবাব দিতে পারল না। ইরতাজউদ্দিন সাহেব প্রশ্নের উত্তর দেন পাল্টা প্রশ্ন দিয়ে। সেইসব প্রশ্ন আচমকা চলে আসে বলে তার জবাব চট করে দেওয়া যায় না। ইরতাজউদ্দিন হাই তুলতে তুলতে বললেন, থেকে যেতাম, রুনি কত বড় হয়েছে দেখার শখ ছিল। উপায় নেই, স্কুল খোলা। স্কুল কামাই দিয়ে তো আর শখ মেটানো যায় না। আগে স্কুল, তারপর অন্য কিছু। মানুষকে কম্পাসের মতো হতে হয় বুঝলি। কম্পাসের কাঁটা যেমন একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থির হয়ে থাকে, মানুষকেও সে-রকম থাকতে হয়। মনের কাঁটাটাকে আমি স্কুলের দিকে ঠিক রেখে বাকি কাজকর্মগুলো করি।

ইরতাজউদ্দিনের মনে হলো তিনি ক্লাসে বক্তৃতা দিচ্ছেন। এই এক সমস্যা হয়েছে। কথা বলতে গেলেই বক্তৃতার ভঙ্গি চলে আসে। দীর্ঘদিন মাস্টারি করার কুফল। সবাইকে ছাত্র মনে হয়।

শাহেদ।

জি।

ঘরে চিড়ামুড়ি জাতীয় কিছু আছে ? এখন কেমন জানি ক্ষিধেটা বেশি লাগছে।

শাহেদ শুকনো মুখে উঠে গেল। কারণ সে মোটামুটি নিশ্চিত ঘরে কিছু নেই। আর থাকলেও সে খুঁজে পাবে না। চিড়ামুড়ি তো নিশ্চয়ই নেই। চানাচুর থাকতে পারে। সেই চানাচুর রান্নাঘরের অসংখ্য কৌটার কোনটায় আছে কে বলবে ? একজন ক্ষুধার্ত মানুষকে ছাতা পড়া বাসি চানাচুর দেওয়া যায় না।

পিরিচে ঢাকা দেওয়া আধগ্লাস দুধ পাওয়া গেল। দুধ থেকে কেমন টকটক গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। নষ্ট হয়ে গেছে কি-না কে বলবে। শাহেদ লজ্জিত ভঙ্গিতে দুধের গ্লাস নিয়ে ভাইয়ের সামনে রাখল। বিব্রত গলায় বলল, আর কিছু পেলাম না ভাইজান।

ইরতাজউদ্দিন একচুমুকে দুধটা খেয়ে ফেললেন। খেতে গিয়ে টের পেলেন দুধটা নষ্ট। না খেলে শাহেদ মনে কষ্ট পাবে বলেই গ্লাসের তলানি পর্যন্ত শেষ করে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ।

শাহেদ বলল, ভাইজান, দুধটা কি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ?

না।

আবারো একটু মিথ্যা বলতে হলো। শাহেদের মনে কষ্ট দিয়ে লাভ কী। কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় নেওয়াটা কি ঠিক হলো ? না, ঠিক হয় নি। সত্যের জন্য কেউ যদি মনে কষ্ট পায় তাহলে পাক। ইরতাজউদ্দিন বললেন, দুধটা টকে গেছে। তবে খেতে খারাপ লাগে নি।

দুধ খেতে গিয়ে তার একটা মজার স্মৃতি মনে পড়ল। গতবছর জুন মাসে শান্তাহার স্টেশনে তিনি দুধ খাওয়ার একটা দৃশ্য দেখেছিলেন। তিনি যাবেন বগুড়া। ট্রেনের জন্য শান্তাহারে তাঁকে চারঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ট্রেন বিকেল পাঁচটায়। স্টেশনের ওয়েটিংরুমের একটা ইজিচেয়ারে তিনি শুয়ে পড়লেন এবং একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখেন ওয়েটিংরুম ভর্তি মানুষ। চারদিক গমগম করছে। মনে হচ্ছে বিরাট জলসা। আসরের মধ্যমণি হয়ে যিনি বসে আছেন তাকে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে কিন্তু ঠিক চেনা যাচ্ছে না। হৃষ্টপুষ্ট একজন মানুষ, মাথায় গোল টুপি। মুখভর্তি সফেদ দাড়ি। তার হাতে কে একজন কানায় কানায় ভর্তি একগ্লাস দুধ এনে দিল। বিনীত ভঙ্গিতে বলল, আমার নিজের গাইয়ের দুধ। হুজুরের জন্য এনেছি। মাওলানা ধরনের মানুষটা দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে বললেন, দুধ খেতে ইচ্ছা করতেছে না। তবে দুধ এবং মধু এই দুই তরল খাদ্যদ্রব্য আমাদের আখেরি নবির বড়ই পছন্দের পানীয়। কাজেই খাচ্ছি। বলেই তিনি একচুমুকে গ্লাস শেষ করে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। খুবই ভালো দুধ। কালো গাইয়ের দুধ?

যে লোক দুধ এনেছিল সে বিনয়ে নিচু হয়ে বলল, জি হুজুর।

দুধে চুমুক দিয়েই বুঝেছি। কালো গাইয়ের দুধ ছাড়া দুধ এত মিষ্টি হয় না।

ইরতাজউদ্দিন তখনি মাওলানা সাহেবকে চিনলেন— ইনি মাওলানা ভাসানী। পত্রিকায় কত ছবি দেখেছেন। এই প্রথম সামনাসামনি দেখা।

ইরতাজউদ্দিন তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিলেন। মাওলানা ভাসানী তার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, ঘুম ভালো হয়েছে? যেন কতদিনের চেনা মানুষ।

ইরতাজউদ্দিন বিনয়ের সঙ্গে বললেন, জি।

আপনার ঘুমের ব্যাঘাত করেছি, কিছু মনে করবেন না।

ইরতাজউদ্দিন আরো লজ্জার মধ্যে পড়ে গেছেন। এরকম একজন বিখ্যাত মানুষের সামনে ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকা যায় না। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। মাওলানা তখন অন্যপ্রসঙ্গে চলে গেছেন। স্যুট পরা রোগামতো এক ভদ্রলোককে বলছেন— দেশের অবস্থা শুনবা? পাঁচটা গ্রামে ঘুরে আমি একটা পঞ্চাশ টাকার নোট ভাঙাতে পারি নাই। এই হলো দেশের অবস্থা। কিছু একটা করা দরকার। কিছু করো। মাছি আর কত মারবা? অনেক তো মাছি মারলা।

মাওলানা ভাসানী ওয়েটিংরুমেই আছরের নামাজ পড়লেন। বিরাট জামাত হলো। ইরতাজউদ্দিন সেই জামাতে সামিল হলেন। জামাতে সামিল হওয়ার জন্য তিনি ট্রেন ফেল করলেন। কারণ মাওলানা দীর্ঘ দোয়া শুরু করলেন। সেই

দোয়া চল্লিশ মিনিট স্থায়ী হলো। এর মধ্যে ইরতাজউদ্দিন সাহেবের গাড়ি ছেড়ে দিল। একবার ইরতাজউদ্দিন ভাবলেন, দোয়া ছেড়ে দৌড়ে গিয়ে গাড়ি ধরে ফেলেন। শেষপর্যন্ত তিনি তা করলেন না। দোয়ার মাঝখানে উঠে যাওয়া যায় না, সেটা অভদ্রতা হয়। এতবড় একজন মানুষের সঙ্গে তিনি অভদ্রতা করতে পারেন না। ট্রেন ফেল করা এমন কোনো বড় ব্যাপার না। একটা ফেল করলে আরেকটা পাওয়া যায়। এই ধরনের মানুষের সঙ্গ সবসময় পাওয়া যায় না।

নষ্ট দুধ খেতে দিয়ে শাহেদ কেমন মনমরা হয়ে আছে। মাওলানা ভাসানীর গল্পটা বলে তার মনমরা ভাবটা কাটাবেন কি-না ইরতাজউদ্দিন তা ধরতে পারলেন না। শাহেদ বলল, ভাইজান, শুয়ে পড়েন। তিনি শুয়ে পড়লেন।

ফ্যানটা বন্ধ করে দে।

ফ্যান থাকুক-না ভাইজান। গরম খুব বেশি।

ফ্যানের বাতাসে ঘুম হয় না— এটা কতবার বলব!

শাহেদ ফ্যান বন্ধ করে দিল।

ইরতাজউদ্দিন সাহেব ক্লান্ত হয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন। এক ঘুমে রাত পার করে দিলেন। এত তৃপ্তি করে তিনি অনেকদিন ঘুমুন নি। ঘুম ভেঙে তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন, তার উপরে মশারি খাটানো আছে এবং ফুল স্পিডে ফ্যান ঘুরছে। তার ঘুমের মধ্যেই শাহেদ এই কাজটি করেছে। এতে তাঁর ঘুমের কোনো অসুবিধা হয় নি। বরং অন্য দিনের চেয়েও অনেক তৃপ্তি করে ঘুমিয়েছেন। মশারি এবং ফ্যান সম্পর্কে তার এতদিনের ধারণায় কিছু ভুল আছে। এই ভুল শোধরাতে হবে। মানুষমাত্রই ভুল করে, তবে তার সুবিধা হচ্ছে সে ভুল শোধরাবার সুযোগ পায়।

www.MurchOna.com

শাহেদের অফিস মতিঝিলে। আধুনিক কেতার ছিমছাম অফিস বলতে যা বোঝায়, এই অফিস মোটেই সে-রকম না। আউলা ঝাউলা অফিস। অফিসের কর্মচারীদের টেবিল চেয়ারের পাশেই গাদা করে রাখা মালামাল। যদিও মালামাল রাখার জন্যে নিচে গোডাউন আছে। কোনো অফিস ঘরেই খাটিয়া থাকার কথা না, এই অফিসে খাটিয়া পাতা আছে। প্রায়ই সেখানে কাউকে না কাউকে গড়াগড়ি করতে দেখা যায়। কেউ কিছু মনে করে না। আশপাশের সাত-আট তলা দালানের মাঝখানে কটকটা হলুদ রঙের (শাহেদের ভাষায় 'গু-কালার') দোতলা দালান। বারো হাত কাকুড়ের সাড়ে পনেরো হাত বিচির মতো বিশাল এক সাইনবোর্ড। সেখানে লেখা— United Commercial. সাইনবোর্ডের কয়েকটা অক্ষর মুছে গেছে। তাতেও কারো কোনো গরজ নেই।

সাড়ে বত্রিশ ভাজা অফিস। ইন্সুরেন্স, ইনডেনটিং, শেয়ার বিজনেস। অফিসের মালিকের নাম মইন আরাফী। মুর্শিদাবাদ বাড়ি। দেশ বিভাগের সময় দুইশ' 'রুপেয়া', একটা রুপার হুক্কা এবং একটা দামি শাল নিয়ে চলে এসেছিলেন। শাল বিক্রি করে প্রথম তিনি ফলের ব্যবসা শুরু করেন। রুপার হুক্কাটা অনেক কষ্টে রক্ষা পায়। সেই হুক্কা তিনি অফিসে ব্যবহার করেন। মইন আরাফী সাহেবের ধারণা, হুক্কা টানার সময় হুক্কা কথা বলে। কাজকর্ম যখন থাকে না তখন না-কি হুক্কার কথা শুনতে ভালো লাগে। মইন আরাফী সাহেব এখন লক্ষপতির উপরে যা আছে সেই পতি। ভদ্রলোকের মাথায় যখন যে বিজনেস এসেছে তিনি করেছেন এবং টাকা এসেছে জলের মতো।

ভদ্রলোকের বয়স ষাট। বেটে গাট্টাগুট্টা চেহারা। টকটকে গৌরবর্ণের মানুষ। মাথায় কোনো চুল নেই, কিন্তু বাদামি রঙের বাহারি গোঁফ আছে। অফিসের কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার অত্যন্ত অমায়িক। কোনো কর্মচারীকে যখন তার প্রয়োজন হয়, তিনি তাকে ডেকে পাঠান না। নিজে তার কাছে উপস্থিত হন। সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেন। এবং একটা পর্যায়ে বলেন, Be happy man! Be happy!

www.MurchOna.com

অফিসে তাঁর নাম 'বি হ্যাপি স্যার'। অফিসের সমস্ত কর্মচারী মানুষটিকে সত্যিকার অর্থেই পছন্দ করে। বিবাহ বার্ষিকী, ছেলের জন্মদিন, মেয়ের পানচিনিতে বি হ্যাপি স্যারের দাওয়াত হয়। ভদ্রলোক যান বা না যান, একটা উপহার পাঠান। বেশ দামি উপহার।

শাহেদ অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার মেজাজ যথেষ্ট পরিমাণ খারাপ। ঘড়িতে ন'টা বাজছে। দশটা থেকে অফিস। সে একঘণ্টা আগে চলে এসেছে। দেরি করে অফিসে আসার নানান কারণ থাকে। একঘণ্টা আগে অফিসে আসার কারণ একটাই— বেকুবি। শাহেদ বেকুব না। আসমানীর সঙ্গে রাগ দেখাতে গিয়ে সে কাজটা করেছে। এই রাগটা না দেখালে একঘণ্টা আগে অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো না।

আসমানী চারদিন বাবার বাড়িতে পার করে আজ সকালে হাসিমুখে হাতে একটা ছোট্ট টিফিন কেরিয়ার ঝুলিয়ে উপস্থিত হয়েছে। শাহেদের সঙ্গে কোনো সমস্যাই হয় নি— এরকম ভঙ্গি করে বলেছে, এই, রিকশা ভাড়াটা দিয়ে এসো তো। আমার কাছে ভাংতি নেই। নাশতা করেছ ? আমি নাশতা নিয়ে এসেছি।

শাহেদ জবাব না দিয়ে রিকশা ভাড়া দিতে গেল। একবার ভাবল রিকশা ভাড়া দিয়েই সে দিলবাগ রেস্টুরেন্টে চলে যাবে। সেখানে পরোটা বুন্দিয়া নাশতা খেয়ে সোজা অফিস। এতে রাগ দেখানো হবে। কাজটা করতে পারল না, কারণ রুনিকে আদর করা হয় নি। চারদিন মেয়ের সঙ্গে দেখা হয় নি। তার কাছে মনে হচ্ছে চার বছর।

পত্রিকা দিয়ে গেছে। শাহেদ পত্রিকা হাতে ঘরে ঢুকল। সে ঠিক করেছে, আসমানীর কোনো প্রশ্নেরই জবাব দেবে না। মুখের সামনে পত্রিকা ধরে রাখবে। শাহেদ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করল, আসমানী খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঘর ঠিকঠাক করছে। তারচেয়েও বিস্ময়কর রুনির ব্যবহার। সে কাগজে ছবি আঁকছে। একবারও বাবার দিকে তাকাচ্ছে না। যেন সে বাবাকে চিনতেই পারছে না।

আসমানী বলল, এই ক'দিন কোথায় খেয়েছ ? নিজে রান্না করেছ, না হোটেলে ?

শাহেদ গম্ভীর গলায় বলল, হোটেলে।

ভাইজান কবে গেছেন ?

শাহেদের বলতে ইচ্ছা করছে, তা দিয়ে তোমার কী দরকার ? মনের ইচ্ছা চেপে রেখে বলল, যেদিন এসেছেন তার পরদিনই চলে গেছেন।

আমি উনাকে চিঠি লিখেছিলাম আমচুর নিয়ে আসতে। এনেছেন ?

শাহেদ জবাব দিল না। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে, এইসব হচ্ছে আসমানীর খাতির জমানো কথা। খেজুড়ে আলাপ। এই আলাপে যাবার কোনো মানে হয় না।

আসমানী বলল, তোমাকে নাশতা দিয়ে দেই ? চালের আটার রুটি আর কবুতরের মাংস।

কবুতর খাই না।

কবুতর খাও না কেন ?

কেন খাই না এত ব্যাখ্যা তো দিতে পারব না। খাই না মানে খাই না।

কবুতরের মাংস ছাড়া অন্য কোনো মাংস হলে খাবে ?

শাহেদ বিরক্ত চোখে তাকাল। আসমানীর চোখে-মুখে চাপা হাসি। আসমানী বলল, তুমি কবুতরের মাংস খাও না, আমি জানি। মা কবুতরের মাংস রান্না করেছিল। আমি ফ্রিজের বাসি গরুর মাংস নিয়ে এসেছি। গরম করে দিচ্ছি, তুমি খাও।

শাহেদ কিছু বলল না। গভীর মনোযোগে পত্রিকা পড়তে লাগল। তার মেজাজ খারাপ হচ্ছে রুনির দিকে। মেয়েটা বাবাকে চিনতে পারছে না— এই ঢং কোত্থেকে শিখেছে ? নিশ্চয়ই মা'র কাছ থেকে। কাগজে কাকের ঠ্যাং, বকের ঠ্যাং আঁকাটা কি এখন এতই জরুরি ? তার উপর দেখা যাচ্ছে তার বাঁ হাতের একটা আঙুলে ব্যান্ডেজ বাঁধা। কী করে ব্যথা পেয়েছে এটাও সে বলবে না ?

আসমানী বলল, হ্যালো রাগ কুমার! তুমি যদি ভাবো আমি তোমার কাছে সরি বলব, তাহলে ভুল করেছ। তোমার উপর রাগ করে আমি যে চারদিন মায়ের কাছে ছিলাম, আমি ঠিকই করেছি। তবে বড় ভাইজানের সঙ্গে দেখা করতে আসি নি— এটা খুবই বড় ভুল হয়েছে। এই ভুলের জন্যে আমি বড় ভাইজানের কাছে ক্ষমা চাইব। তোমার কাছে ক্ষমা চাইব কেন ?

শাহেদ বলল, আমি তো তোমাকে ক্ষমা চাইতে বলছি না। কেন এত কথা বলছ ?

আসমানী বলল, তুমি যদি স্বাভাবিকভাবে আমার সঙ্গে কথা না বলো, তাহলে আমি কিন্তু আবার মা'র কাছে চলে যাব।

যেতে চাইলে যাবে।

মাংস গরম করে এনেছি, খেতে এসো। আচ্ছা আমি ভুল করেছি। সরি। এখন পায়ে ধরতে পারব না। রাতে পায়ে ধরব। সত্যি পায়ে ধরব।

এই কথার পর শাহেদের উচিত ছিল স্বাভাবিকভাবে খেতে বসা। ঝোল ঝোল মাংস, চালের আটার রুটি তার খুবই পছন্দের খাবার। আসমানী নিঃশর্ত

www.MurchOna.com

ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্যেই বোধহয় হঠাৎ শাহেদের রাগ বেড়ে গেল। সে খবরের কাগজ ছুড়ে ফেলে গটগট করে বের হয়ে গেল। তার রাগটা কমে গেল রিকশায় উঠার সঙ্গে সঙ্গে। তখন আর ফেরা যায় না। রিকশাওয়ালা রিকশা টানতে শুরু করেছে।

শাহেদ দাঁড়িয়ে আছে অফিসের সামনে। অফিস খুলেছে। সে ইচ্ছা করলেই তার চেয়ারে বসতে পারে। অফিসের পাশেই ছাপড়া রেস্টুরেন্টের মতো আছে। রেস্টুরেন্টের মালিক বিহারি, সে সকালে রুমালি রুটি এবং মুরগির লটপটি নামে একটা খাদ্য তৈরি করে। অতি সুস্বাদু। অফিসের পিওন পাঠিয়ে সেখান থেকে নাশতা আনা যায়। ভালো ক্ষিধে লেগেছে। ক্ষিধের চোটে বুক জ্বালা করছে। কিন্তু শাহেদের অফিসে ঢুকতে ইচ্ছা করছে না। তার ইচ্ছা করছে বাসায় ফিরে যেতে।

কেমুন আছেন Young man ?

শাহেদ চমকে তাকাল। 'বি হ্যাপি স্যার' ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছেন। এই ভদ্রলোকের শরীর ভারী কিন্তু তিনি হাঁটেন নিঃশব্দে।

অফিসে এখন এমুন কী কঠিন কাজ যে Early আসতে হোবে ?

স্যার, ভালো আছেন ?

অফকোর্স ভালো আছি। আপনার ছোট বাচ্চাটা কেমুন আছে— Little baby ?

স্যার, ভালো আছে।

Be happy young man! Be happy!

বলেই আরাফী সাহেব শাহেদের কাঁধে হাত রাখলেন। শাহেদ জানে, ভদ্রলোক কাঁধ থেকে হাত সরাবেন না। এইভাবেই অফিসে ঢুকবেন। ভদ্রলোকের ব্যবহার কতটুকু আন্তরিক এবং কতটুকু ভান কে জানে! বস জাতীয় মানুষদের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পাওয়া যায় না। যখন পাওয়া যায় তখন মনে হয় কোথাও বোধহয় সমস্যা আছে।

শাহেদ সাব।

জি স্যার।

ব্যবসা তো সব বন্ধ। 'জয় বাংলা' বলে চিৎকার করলে তো পেটে দানাপানি আসবে না। ঠিক বুলেছি ?

বসদের সব কথাতেই হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়তে হয়। শাহেদ তাই নাড়ল।

www.MurchOna.com

মইন আরাফী হাসিমুখে বললেন, বি হ্যাপি ইয়াং ম্যান। বি হ্যাপি।

শাহেদ মনে মনে ঠিক করল কোনো একদিন সুযোগ পেলে সে জিজ্ঞেস করবে— 'বি হ্যাপি' বলা তিনি কবে থেকে শুরু করেছেন ? প্রথম তিনি কাকে বলেছিলেন, বি হ্যাপি ?

ঢিলাঢালাভাবে অফিস শুরু হয়েছে। অফিসের লোকজনও সব আসে নি। চারদিক ফাঁকা ফাঁকা। এই অফিস আগে গমগম করত। নানান ধরনের লোকজন নানান ধান্ধায় ঘুরত। একতলার গোডাউন সেকশনে হৈহল্লা হতো। মারামারি মাথা ফাটাফাটি হতো। এখন সব ফাঁকা। গোডাউনে কোনো মাল নেই। অফিসের লোকজনেরও কোনো কাজকর্ম নেই। আগে যেখানে হেড ক্যাশিয়ার আসগর আলি দেওয়ান এক হাজার ভাউচারে সই করতেন, সেখানে উনি এখন পনেরো-বিশটার বেশি ভাউচার সই করেন না। হাতের কাজ শেষ হয়ে যায় দুপুরের আগেই। তখন তিনি আরাম করে পান খান এবং এই দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ করেন। এই বিষয়ে গল্প করতে তাঁর ভালো লাগে। তাঁর ধারণা এই দেশের কপালে আল্লাহপাক বোল্ড লেটারে লিখে দিয়েছেন— 'Closed'. রেস্টুরেন্টে যেমন 'Closed' সাইনবোর্ড ঝুলায় সে-রকম। তাঁর ধারণা এই দেশের অতীতে কিছু হয় নি, ভবিষ্যতেও কিছু হবে না। কেউ তাঁর কথার বিরোধিতা করলে তিনি ঠাণ্ডা গলায় বলেন, আপনার পুরা নামটা যেন কী ? আব্দুল গনি না ? এখন থেকে নামের শেষে 'শিশু' টাইটেল লাগায়ে দেন। বর্তমানে আপনার নাম আব্দুল গনি শিশু। আপনার চিন্তাশক্তি শিশু লেভেলে। বুঝেছেন ?

দেওয়ান সাহেবের আশপাশে কেউ যায় না। আগ বাড়িয়ে 'শিশু' টাইটেল নেয়ার দরকার কী ?

দুপুর বারোটার দিকে দেওয়ান সাহেব পান-জর্দা নিয়ে বসলেন। শাহেদের দিকে হাত ইশারা করে বললেন, একটু শুনে যান।

শাহেদ বলল, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথাবার্তা শুনতে ইচ্ছা করছে না।

দেওয়ান সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, কাছে আসেন। অন্য ব্যাপার। মুখোমুখি না বসলে বলা যাবে না। জরুরি ব্যাপার।

শাহেদ নিতান্ত অনিচ্ছায় উঠে এসে দেওয়ান সাহেবের সামনের চেয়ারে বসল।

দেওয়ান সাহেব বললেন, পান খাবেন না-কি ?

শাহেদ বলল, আমি পান খাই না।

www.MurchOna.com

খান না বলেই তো খাবেন। টেস্ট কী রকম দেখবেন।

জরুরি ব্যাপারটা কী বলেন।

দেওয়ান সাহেব পান চিবুতে চিবুতে বললেন, ছটফট করছেন কেন ? হাতে কোনো কাজ নাই। ছটফট করারও কিছু নাই। আপনার একটা চিঠি আছে আমার কাছে।

কী চিঠি ?

কাল তো আপনি অফিসে আসেন নাই। গৌরাঙ্গ বাবু আপনাকে খুব ব্যস্ত হয়ে খোঁজ করছিলেন। একটা চিঠি আমার কাছে দিয়ে গেলেন। খামের উপরে লেখা— জরুরি।

শাহেদ বলল, চিঠিটা দিন।

দেওয়ান সাহেব বললেন, দিচ্ছি। এত অস্থির হচ্ছেন কেন ? দেশ কোন দিকে যাচ্ছে কিছু বুঝতে পারছেন ?

না।

দেশের ইকনমি টোটালি ধ্বংস হয়ে গেছে, কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। শেষ ভরসা আমেরিকা। পিএল ফোর এইটির গম। গম যাবে আমরাও যাব।

শাহেদ বলল, ও আচ্ছা।

দেওয়ান সাহেব গলা নিচু করে বললেন, আমাদের অফিস যে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে এটা জানেন ?

জানি না তো।

আমাদের বি হ্যাপি স্যার, আপনাদের সবার চোখে আদর্শ মানব, তলে তলে সব বিক্রি করে দিচ্ছেন। ক্যাশ নিয়ে চলে যাবেন করাচি। ফ্যামিলি চলে গেছে। তিনি থেকে গেছেন। আগামী মাসে বেতন হবে না। বুড়ো আঙুলে সামান্য চিনি মাখিয়ে চুষতে হবে। যাদের ডায়াবেটিস আছে, তারা চুষবে শুধু বুড়ো আঙুল।

শাহেদ বলল, আপনাকে কে বলেছে অফিস বিক্রি হয়ে যাচ্ছে ?

দেওয়ান সাহেব বললেন, এইসব গোপন কথা কি কেউ আগ বাড়িয়ে বলে ? হাবে ভাবে বুঝেছি। তবে স্যারের ফ্যামেলি যে করাচি চলে গেছে এইটা জানি। তাদের পিআইএর টিকিট আমি কেটেছি।

বাড়িতে কি স্যার একা থাকেন ?

একা থাকেন, না-কি দোকা থাকেন আমি জানি না। তবে স্যারের ফ্যামিলি যে ফুড়ুৎ করে চলে গেছে এইটা জানি। বি হ্যাপি স্যারের নাম এখন হওয়া উচিত 'বি স্যাড স্যার'।

www.MurchOna.com

শাহেদ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, চিঠিটা দিন, চলে যাই।

দেওয়ান সাহেব বললেন, কথা শুনতে ভালো লাগছে না ? সত্য কথার প্রধান সমস্যা হলো, সত্য কথা শুনতে ভালো লাগে না। যে বলে তাকেও ভালো লাগে না। মিথ্যা কথা শুনতে ভালো লাগে। যে বলে তাকেও বড় আপন মনে হয়। যা হোক, আমার সঙ্গে কথা বলতে না চাইলে নাই। এই নিন গৌরাঙ্গ বাবুর চিঠি।

গৌরাঙ্গের সঙ্গে শাহেদের খুব যে মাখামাখি পরিচয় তা-না। গৌরাঙ্গ এবং শাহেদ একই দিনে এই অফিসে চাকরিতে জয়েন করেছিল। কাকতালীয়ভাবে দু'জনের পরনেই ছিল ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবি। গৌরাঙ্গ সেদিন অবাক হয়ে বলেছিল, শাহেদ ভাই, আমাদের কোইনসিডেন্সটা দেখেছেন ? পয়েন্টে পয়েন্টে মিলে যাচ্ছে।

তারচেয়েও বড় মিল যেটা পাওয়া গেল— দু'জনেরই প্রথম সন্তান কন্যা। একজনের নাম রুনি, আরেকজনের রুনু।

গৌরাঙ্গ এই মিল দেখে অফিসের শেষে ক্যান্টিনে চা খেতে খেতে বলল— আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যে ঈশ্বরের একটা খেলা আছে। দেখবেন আমাদের জীবনে একজনের ঘটনার সঙ্গে আরেকজনের ঘটনা মিলে যাবে। আমি যেদিন অফিসে নীল শার্ট পরে আসব দেখা যাবে আপনিও নীল শার্ট পরে এসেছেন। আমার পরিবারে যেদিন আনন্দের কোনো ঘটনা ঘটবে, আপনার পরিবারেও ঘটবে। আমার ঠাকুরমা যেদিন মারা যাবে, দেখা যাবে আপনার দাদিও সেদিন মারা যাবে।

শাহেদ হেসে ফেলল।

গৌরাঙ্গ বলল, হাসছেন কেন ?

শাহেদ বলল, কোনো কারণ ছাড়াই হাসছি।

গৌরাঙ্গ আহত গলায় বলল, আমি সিরিয়াস একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছি, আপনি হেসে দিলেন কেন ?

সরি।

না, এরকম করবেন না। এতে আমি মনে কষ্ট পাই।

কিছুদিনের মধ্যেই শাহেদ লক্ষ করল গৌরাঙ্গের স্বভাবই হলো তুচ্ছ সব কারণে মনে কষ্ট পাওয়া। যেমন একদিন গৌরাঙ্গ এসে শাহেদের টেবিলে বসতে বসতে বলল, আজ থেকে আমি আপনাকে 'তুই' করে বলব। আপনিও আমাকে 'তুই' করে বলবেন। দিস ইজ ফাইনাল।

www.MurchOna.com

শাহেদ অবাক হয়ে বলল, কেন?

গৌরাঙ্গ আহত গলায় বলল, কারণ আমরা বন্ধু, এই জন্যে। আপনি কখনো শুনেছেন দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু একে অন্যকে আপনি করে বলছে?

শাহেদ কিছু বলল না।

গৌরাঙ্গ বলল, তুই রাজি না?

শাহেদ বলল, একমাসও হয় নি আমাদের পরিচয়, এর মধ্যে হঠাৎ করে একদিন দু'জন দু'জনকে তুই বলছি— এটা চোখে লাগবে না?

গৌরাঙ্গ বলল, কার চোখে লাগবে?

শাহেদ বলল, সবার।

গৌরাঙ্গ বলল, ঠিক আছে, আপনাকে তুই বলতে হবে না। আমিও বলব না। কথা দিচ্ছি প্রয়োজন ছাড়া আমি আপনার সঙ্গে কথাও বলব না।

গৌরাঙ্গ নিজের টেবিলে ফিরে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল আরেক সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলে সে জায়গা বদল করছে। আগের জায়গাটা ছিল শাহেদের মুখোমুখি, এখনেরটা দূরে। এই অবস্থায় চার-পাঁচ দিন কাটাবার পর গৌরাঙ্গ আবার আগের জায়গায় চলে এলো। বিকেলে অফিস শেষ করে জোর করে ক্যান্টিনে চা খাওয়াতে নিয়ে এলো শাহেদকে।

হাস্যকর যেসব ছেলেমানুষী গৌরাঙ্গের মধ্যে আছে তার কিছু কিছু শাহেদের বেশ ভালো লাগে, আবার কিছু কিছু খুবই বিরক্তিকর।

সবচে' বিরক্তিকর হলো, গৌরাঙ্গের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে যাওয়া। যে রাতে নিমন্ত্রণ সেই রাতে অবধারিতভাবে গৌরাঙ্গ কিছু মদ্যপান করবে। দু'পেগ খাওয়ার পর বদ্ধ মাতাল। তখন কথাবার্তার ঠিক ঠিকানা নেই। এই হাসছে, এই কাঁদছে, এই পা ধরতে আসছে। খাওয়াদাওয়া শেষ করার পর বাড়িতে ফেরার নাম নেয়া যাবে না। গৌরাঙ্গ কিছুতেই বাড়ি ফিরতে দেবে না। তাকে থাকতেই হবে। একটা পর্যায় আসে যখন গৌরাঙ্গের স্ত্রী নীলিমা এসে করুণ গলায় বলে, ভাই, আপনি থেকে যান। আপনি চলে গেলে সে বড় যন্ত্রণা করবে। কাঁদবে, জিনিসপত্র ভাঙবে। শাহেদকে অতি অনাগ্রহের সঙ্গে রাতে থেকে যেতে হয়।

গৌরাঙ্গের চিঠি হাতে নিয়ে শাহেদ বসে আছে। চিঠি খুলতে ভরসা পাচ্ছে না। সে নিশ্চিত চিঠিতে কোনো একটা নিমন্ত্রণের ব্যাপার আছে।

গৌরাঙ্গ লিখেছে—

> প্রিয় মিতা,
>
> আমার জীবনে দুইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। অতীব অতীব গুরুত্বপূর্ণ, যাহা পত্র মারফত বলা

www.MurchOna.com

সম্ভব নহে। আমি অফিসে আসিয়া আপনাকে না পাইয়া হতাশ হইয়া বাসায় ফিরিয়া গেলাম। মিতা, পত্র পাওয়া মাত্র যেখানে যে অবস্থায় আছেন আমার বাড়িতে চলিয়া আসিবেন। যদি না আসেন, ঈশ্বরের দোহাই বাকি জীবন আমি আপনার সহিত কোনো বাক্যব্যয় করিব না। আমি তিন দিনের আর্নড লিভ নিয়া বাড়িতে বসিয়া আছি আপনার অপেক্ষায়।

ইতি
গৌরাঙ্গ

শাহেদ মনে মনে বলল, অসম্ভব টু দা পাওয়ার টেন। যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। চারদিন হয়েছে সে তার মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারে নি। আজ পুরনো ঢাকায় গৌরাঙ্গের সঙ্গে দেখা করার অর্থ রাতে ফেরা যাবে না। মেয়ের সঙ্গে আরো একদিন কথা হবে না।

অফিস ছুটি হয় পাঁচটায়, তিনটা বাজতেই দেখা গেল কর্মচারীরা উঠতে শুরু করেছে। বি হ্যাপি স্যার লাঞ্চের সময় চলে গেছেন। ব্যবসা সংক্রান্ত কী একটা কাজে (চিটাগাং পোর্টে জাহাজে মাল খালাস বিষয়ক কাজ) তিনি চিটাগাং যাচ্ছেন। ফিরবেন দু'দিন পর। কর্মহীন অফিসে পাঁচটা পর্যন্ত বসে থাকার অর্থ হয় না।

শাহেদ চারটার দিকে উঠল। দেওয়ান সাহেব একা বসে আছেন। তিনি কখনো অফিস শেষ হবার আগে চেয়ার ছেড়ে উঠেন না। তিনি শাহেদকে বললেন, আরো কিছুক্ষণ থাকুন না। দুই ভাই একসঙ্গে বের হই।

শাহেদ বলল, কাজ আছে।

দেওয়ান সাহেব বললেন, বাঙালির এখন কাজ কী ? বর্ষার ঘোঁতা ব্যাঙের মতো গলা ফুলিয়ে শ্লোগান দেয়া— 'জয় বাংলা', 'জয় বাংলা'। এখন আমাদের কী শ্লোগান হওয়া উচিত জানেন ? আমাদের শ্লোগান হওয়া উচিত— 'নয় বাংলা', 'নয় বাংলা'। অর্থাৎ বাংলা না, অন্য কিছু। শুনেন শাহেদ সাহেব, এখনো সময় আছে। আমরা যদি বাঁচতে চাই আমাদের খোল নলচে সব বদলাতে হবে। পোশাক চেঞ্জ করতে হবে। লুঙ্গি শাড়ি চলবে না। ফুড হ্যাবিট বদলাতে হবে। No Fish No Rice. বাংলা ভাষা বাতিল। কথা বলতে হবে অন্য ভাষায়— উর্দু, হিন্দি, পাঞ্জাবি চলতে পারে। বুঝতে পারছেন, না-কি পারছেন না ?

আপনি আগে ভালোমতো বুঝে নিন।

চা খাবেন না-কি ? আসুন আপনাকে এক কাপ বিদায়ী চা খাওয়াই।

চা খাব না।

তাহলে আর আপনাকে আটকে রেখে কী হবে! চলে যান। 'নয় বাংলা'।

বাসায় ফেরার পথে শাহেদ মরণচাঁদের দোকান থেকে এক সের রসগোল্লা কিনল। রসগোল্লা আসমানীর পছন্দের মিষ্টি। রসগোল্লা খাওয়ার কায়দাটাও তার অন্যরকম। প্রথমে চিপে রস বের করে রসহীন রসগোল্লা খায়। পরে চুমুক দিয়ে খায় রসটা। সব বয়স্ক মানুষদের কর্মকাণ্ডেই কিছু ছেলেমানুষী থাকে। আসমানীর রসগোল্লা খাওয়ার মধ্যে ছেলেমানুষীটা আছে। তার একটা পছন্দের মিষ্টি নিয়ে বাসায় ফেরার অর্থই হচ্ছে আসমানীকে নিঃশব্দে বলা— 'আই অ্যাম সরি।' বেচারি আজ সকালে কষ্ট করে খাবার গরম করে টেবিলে দিয়েছে, সে রাগ দেখিয়ে চলে এসেছে— এটা ঠিক হয় নি।

ইত্তেফাক অফিসের সামনে মাঝে মধ্যে পাখিওয়ালা বসে। খাঁচায় বন্দি পাখি বিক্রি হয়। টিয়া, মুনিয়া, কালিম পাখি, ঘুঘু। রুনির জন্যে একটা পাখি কিনে নিলে হুলুস্থুল ঘটনা হবে। খাঁচা হাতে সারা বাড়িতে ছোটাছুটি করবে। পাখি কেনা নিতান্তই বাজে খরচ। এই পাখি কয়েক দিন পরেই ছেড়ে দিতে হবে। যে মেয়ের সঙ্গে চারদিন কথা হচ্ছে না, সেই মেয়ের আনন্দের জন্যে কয়েকটা সস্তার মুনিয়া পাখি কেনা যেতে পারে। শাহেদ রিকশা নিয়ে পাখিওয়ালার খোঁজে ইত্তেফাক অফিসের সামনে গেল। সে পাঁচটা মুনিয়া পাখি কিনল দেড় টাকা দিয়ে। খাঁচাটা ফ্রি।

এক হাতে মিষ্টি অন্য হাতে পাখির খাঁচা নিয়ে শাহেদ বাসায় ফিরল বিকেল পাঁচটায়। অমঙ্গল আশঙ্কার মতো তার মনে হচ্ছিল বাসায় ফিরে দেখবে কেউ নেই। দরজায় তালা ঝুলছে। তালার ফাঁকে গুঁজে রাখা নোট— 'চলে গেলাম'। ভোরবেলা নাশতা না খাওয়া এবং রাগ দেখানোর শাস্তি আসমানী দেবে না— তা হবে না।

দরজায় তালা নেই। হঠাৎ শাহেদের মন আনন্দে পূর্ণ হলো। নিজের ছোট্ট বাসাটাকে মনে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'ধন নয় মান নয় এতটুকু বাসা'। তার কাছে মনে হলো শুধু বেঁচে থাকার জন্যে হলেও দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা যায়।

আসমানী তাকে দেখে খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, এখন চা খাবে, না-কি গোসল করে চা খাবে? (অফিস থেকে ফিরে শাহেদ গরম পানি দিয়ে গোসল সেরে চা খায়।) শাহেদ বলল, এখন এক কাপ খাব। গোসল সেরে আরেক কাপ খাব।

আসমানী বলল, আবার পাখি এনেছ? এইগুলাকে কে দেখবে? দু'দিন পর রুনির শখ মিটে যাবে, তারপর কী হবে?

শাহেদ কিছু না বলে হাসল। হাসি দিয়ে জানান দেয়া— এখন আর আমাদের মধ্যে কোনো ঝামেলা নেই।

আসমানী বলল, চুলায় গরম পানি আছে, বালতিতে ঢেলে দিচ্ছি।

শাহেদ বলল, আমি ঢেলে নেব। রুনি কোথায় ?

আসমানী বলল, ও বাসায় নেই। ও মা'র বাসায় চলে গেছে।

শাহেদ বলল, তার মানে ?

আসমানী বলল, মেয়ে তার নানির বাসায় গেছে, এর আবার মানে কী ? তার ছোট মামা এসেছিল, সে তার ছোট মামার সঙ্গে চলে গেছে।

শাহেদ বলল, ও আচ্ছা।

সে কিছুতেই রাগ সামলাতে পারছে না। পরিষ্কার বুঝতে পারছে সকালে নাশতা নিয়ে সে যে কাণ্ডটা করেছে, আসমানী তার শোধ তুলেছে। মেয়েকে নানির বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। খুব কঠিন কিছু কথা আসমানীকে বলতে পারলে ভালো হতো। বলতে ইচ্ছা করছে না।

আসমানী চা এনে সামনে রাখল। শাহেদ বলল, রুনিকে একা পাঠিয়ে দিলে কেন ? তুমিও সঙ্গে যেতে।

আসমানী বলল, আমিও যাব। আমি তোমার ফেরার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। এই তো এখন যাব।

তুমিও যাচ্ছ ?

হ্যাঁ।

কেন জানতে পারি ?

তোমার সঙ্গে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া করতে ইচ্ছা করছে না বলে চলে যাব। নিরিবিলি কয়েকটা দিন থাকব। বই পড়ব, গান শুনব। রিলাক্স করব।

শাহেদ বলল, আচ্ছা ঠিক আছে।

আসমানী বলল, বাথরুমে গরম পানি দিয়ে এসেছি। গোসল করতে চাইলে করো।

গোসল সেরে এসে শাহেদ দেখে, আসমানী বাসায় নেই। সত্যি সত্যি চলে গেছে। শাহেদ রাত আটটা পর্যন্ত বারান্দার চেয়ারে বসে থাকল। তারপর ঠিক করল গৌরাঙ্গের বাড়িতে যাবে। রাতটা সেখানেই কাটাবে। সে সঙ্গে করে আসমানীর জন্যে কেনা রসগোল্লার হাঁড়িটা নিয়ে নিল। আরেক হাতে নিল খাঁচার মুনিয়া পাখি। আসমানীর উপর সে যতটা রেগেছে, মেয়ের উপর ঠিক ততটাই রেগেছে। তার কাছে মনে হচ্ছে রুনিকে পাখি উপহার দেবার কোনো মানে হয় না। পাখিগুলি সে দেবে গৌরাঙ্গের মেয়েকে।

গৌরাঙ্গের বাড়ি পুরনো ঢাকার বংশাল রোডে। গলির ভেতর গলি, তার ভেতর গলি। শেষ গলিটা এতই সরু যে রিকশা চলার কথা না, তারপরেও রিকশা চলে। ফিতার মতো সরু গলির দু'দিকেই নর্দমা। নর্দমায় মরা বেড়াল, মুরগির নাড়িভুঁড়ি থাকবেই। ঠিকই গন্ধ আসবে। মনে হবে এখানে কেন এসেছি ? এই রাস্তায় হাঁটার অভ্যাস না থাকলে নর্দমায় পা পড়বেই।

গৌরাঙ্গ যে বাড়িতে থাকে সেটা তিনতলা। বাড়ির প্রথমতলায় সিমেন্ট রডের দোকান। দোতলায় থাকে গৌরাঙ্গ। তিনতলায় গৌরাঙ্গের শ্বশুর হরিভজন সাহা। সাহা সম্প্রদায়ের মানুষজন মিষ্টভাষী হয়ে থাকে। এই ভদ্রলোক সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত। তিনি কারো সঙ্গেই সহজভাবে কথা বলেন না। ধুতি পরার চল এই দেশ থেকে উঠে গেছে, হরিভজন সাহা এখনো ধুতি পরেন। শ্বশুরের সঙ্গে গৌরাঙ্গের সম্পর্ক খুবই খারাপ। কথাবার্তা প্রায় বন্ধ। গৌরাঙ্গ স্ত্রীর অগোচরে শ্বশুরকে ডাকে 'চামচিকা বাবাজি'। বাড়িটা গৌরাঙ্গের শ্বশুরের। প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ গৌরাঙ্গের তার শ্বশুরকে পঞ্চাশ টাকা দেয়ার কথা। সে কিছুই দেয় না।

শাহেদ গৌরাঙ্গের বাড়ি পৌছল রাত ন'টায়। দরজা খুলে দিল নীলিমা। সে আনন্দিত গলায় বলল, আপনি তাহলে এসেছেন! আপনার বন্ধুর তো মাথা খারাপের মতো হয়ে গেছে। আপনি না এলে কী যে করত কে জানে! সন্ধ্যা থেকে গ্লাস নিয়ে বসেছে। বুঝতেই পারছি আজ একটা কাণ্ড হবে।

'পটে আঁকা ছবি' বলে যে কথাটি প্রচলিত আছে তা নীলিমার জন্যে খুবই প্রযোজ্য। শাহেদের ধারণা সে তার সারা জীবনে এত রূপবতী কোনো তরুণীকে দেখে নি। ভবিষ্যতে দেখবে সে সম্ভাবনাও ক্ষীণ। প্রথমবার দেখে সে হকচকিয়ে গিয়েছিল। এর পরে অনেকবারই দেখা হয়েছে। শাহেদ প্রতিবারই হকচকিয়েছে। আজ নিশ্চয়ই কোনো উৎসব। নীলিমা সাজগোজ করেছে। খোঁপায় গন্ধরাজ ফুল গুঁজেছে। পরনের তাঁতের শাড়িটা দামি। নতুন শাড়ি, আজই পরেছে। শাড়ি থেকে নতুন নতুন গন্ধ আসছে। শাহেদের মনে হলো— এই মেয়ের সাজ করার দরকার কী ?

ঘরের ভেতর থেকে গৌরাঙ্গ ভারি গলায় বলল, নীলু, শাহেদ এসেছে ? (মদ খেলে গৌরাঙ্গের গলা ভারি হয়ে যায়।)

নীলিমা কিছু বলার আগেই গৌরাঙ্গ দরজা খুলে বাইরে চলে এলো। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাকে তো বলেছি শাহেদ আসবে। বলেছি, না-কি বলি নাই ?

বলেছ।

www.MurchOna.com

গৌরাঙ্গ রাগী গলায় বলল, তাহলে কেন বললে সে আসবে না ?

নীলিমা বলল, রাত বেশি হয়ে গেছে বলে বলেছি। এত রাত করে উনি আসবেন ভাবি নি।

অবশ্যই সে রাত করে আসবে। রাত একটা বাজলেও সে আসবে। আমি তাকে আসতে বলেছি, সে আসবে না— আমার বন্ধু সম্পর্কে এটা তুমি কী ভাবলে ?

নীলিমা চাপা গলায় বলল, চিৎকার করছ কেন ?

তুমি আমার বন্ধু সম্পর্কে উল্টাপাল্টা কথা বলবে, আর আমি চিৎকার করব না! অবশ্যই চিৎকার করব। তিনতলায় তোমার বাবা থাকে বলে আমি কি ভয় পাই না-কি ? চামচিকা বাবাজিকে গৌরাঙ্গ... দিয়েও পুছে না। (গৌরাঙ্গ অবলীলায় কুৎসিত কথাটা বলল। নীলিমা বিব্রত ভঙ্গিতে শাহেদের দিকে তাকাল। বেচারি খুবই লজ্জা পাচ্ছে।)

নীলিমা বলল, ভাই, আপনি আপনার বন্ধুকে সামলান। এই জিনিস সহ্য করতে পারে না, তারপরেও রোজ খাওয়া চাই। কী যে যন্ত্রণা!

গৌরাঙ্গ হঠাৎ খুবই বিস্মিত হয়ে বলল, খাঁচাতে করে কী এনেছিস ? পাখি ? (সামান্য মদ্যপান করার পরই সে শাহেদকে 'তুই' করে বলে।)

শাহেদ বলল, হ্যাঁ।

গৌরাঙ্গ বলল, তুই নীলিমাকে জিজ্ঞেস করে দেখ— আমি কিন্তু তাকে বলেছি শাহেদ আজ পাখি নিয়ে আসবে। সন্ধ্যার সময় হঠাৎ করে মনে হলো। প্রথমে আমি বললাম রুনুকে, তারপর বললাম তার মা'কে। তোর তো বিশ্বাস হচ্ছে না। তুই রুনুকে প্রথম জিজ্ঞেস কর, তারপর রুনুর মা'কে জিজ্ঞেস কর। তোর চোখ দেখেই মনে হচ্ছে তুই বিশ্বাস করছিস না।

শাহেদ বলল, বিশ্বাস হবে না কেন ? বিশ্বাস হচ্ছে।

তারপরেও তুই জিজ্ঞেস কর। তোকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

নীলিমা বলল, ভাই, আপনি জিজ্ঞেস করে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলুন তো। জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত সে একই কথা বলতে থাকবে। আপনি যে পাখি নিয়ে আসবেন এটা সে সত্যি বলেছে। আমার কথাটা বিশ্বাস করুন। আপনি বিশ্বাস না করা পর্যন্ত সে হৈচৈ করতেই থাকবে।

গৌরাঙ্গ বলল, তোমার কি ধারণা আমি মাতাল হয়ে গেছি ?

নীলিমা বলল, হ্যাঁ।

গৌরাঙ্গ আহত গলায় বলল, তুমি আমার বন্ধুর সামনে আমাকে মাতাল বললে ? তুমি ? আজকের এই Very special day-তে ?

শাহেদ বলল, আজকের দিনটা কী ? ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি ?

নীলিমা বলল, এইসব কিছু না। ও শুধু শুধু হৈচৈ করছে।

গৌরাঙ্গ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, আমার বন্ধু আজ রাতে থাকবে। আগে তার ঘর ঠিক কর। তার রাতে একটু পর পর জল খাওয়ার অভ্যাস। জলের ব্যবস্থা রাখ। একটা জগ আর গ্লাস।

নীলিমা বলল, উনি যদি থাকেন তাহলে কী দিতে হবে দিতে হবে না তা আমি জানি।

গৌরাঙ্গ বলল, তুমি কিছুই জানো না। তুমি যা পার তার নাম কট কট করে কথা বলা। তুমি কটকটি রানী। এর বেশি কিছু না। কটকটি, তুমি এখন আমার সামনে থাকবে না। তোমাকে দেখলেই আমার রাগ লাগছে। তুমি আমার বন্ধুর রাতে থাকার ব্যবস্থা করো।

যে-কারণে আজ শাহেদের নিমন্ত্রণ সেই কারণ জানা গেল। গৌরাঙ্গের শ্বশুর তাকে নগদ আঠারো হাজার টাকা দিয়েছেন। গৌরাঙ্গ নিচু গলায় বলল, চামচিকার ভীমরতি হয়েছে। সে ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছে। বুড়ার মাথায় বুদ্ধির ছিটাফোঁটা নাই। দেশ জয় বাংলা হয়ে যাচ্ছে। আমরা তখন আর সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন থাকব না। আমাদের অবস্থা হবে— 'নিজের দেশের মাটি দবদবাইয়া হাঁটি' টাইপ। তুই এখন কেন চলে যাচ্ছিস ? ইন্ডিয়া গিয়ে তুই করবি কী ? তোর পাকা... ছিঁড়বি ?

শাহেদ বলল, প্রথম সুসংবাদটা তো শুনলাম। দ্বিতীয়টা কী ?

গৌরাঙ্গ বলল, দ্বিতীয়টা ফালতু।

ফালতুটাই শুনি।

নীলু রেডিও অডিশনে পাস করেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত। সি গ্রেড পেয়েছে।

শাহেদ বিস্মিত হয়ে বলল, ভাবি গান জানেন— তা তো জানতাম না!

গৌরাঙ্গ বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল, রবীন্দ্রসঙ্গীত আবার গাইতে জানতে হয় না-কি ? রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে হলে হাঁপানি থাকতে হয়, আর না-কি সুরে গলা টানতে হয়। তোর বৌদির হাঁপানি আছে। আর নাকেও সে কথা বলতে পারে।

শাহেদ বলল, ভাবির গান শুনব না ?

গানের নামও মুখে আনবি না। তোর বৌদির হাঁপানির টান আমার অসহ্য। আমার সিক্সথ সেন্স কেমন প্রবল হয়েছে সেটা বল। কী সুন্দর এডভান্স বলে দিলাম— তুই পাখি নিয়ে আসবি। পয়েন্টে পয়েন্টে মিলেছে কি-না বল।

মিলেছে।

www.MurchOna.com

আমি এডভান্স অনেক কিছু বলতে পারি। ঐ চামচিকা ইন্ডিয়াতে পৌঁছেই খাবি খেয়ে মারা যাবে, এটাও তোকে এডভান্স বলে দিচ্ছি। মিলিয়ে নিস।

গৌরাঙ্গ গ্লাসে লম্বা করে চুমুক দিয়ে দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল।

শাহেদ রাতের খাওয়া খেল একা। নীলিমা বলল, আপনাকে একা খেতে হচ্ছে আমি খুবই লজ্জা পাচ্ছি। রুনুও বাসায় নেই। ও থাকলে আপনার সঙ্গে বসত।

রুনু কোথায়?

সে উপরেরতলায় ওর দিদিমা'র কাছে। তার শরীরটা ভালো না। জ্বর এসেছে। আমি আপনার পাখির খাঁচা তাকে দিয়ে এসেছি। খুব খুশি। ও আচ্ছা ভাই, আপনাকে একটা কথা বলা দরকার— আপনি আজ পাখি নিয়ে আসবেন এরকম কোনো কথা রুনুর বাবা বলে নি। মদ বেশি খেয়ে ফেলেছে বলে যা মনে আসছে বলছে। ভাই, আপনাকে একটা অনুরোধ করব, আপনি কি রাখবেন?

শাহেদ বলল, অবশ্যই রাখব।

আপনার বন্ধু আপনাকে এতই পছন্দ করে যে সে আপনার কোনো কথা ফেলবে না। আপনি কি তাকে একটু বলবেন মদটা ছেড়ে দিতে? আমি নিশ্চিত আপনি একবার বললে সে আর এই জিনিস খাবে না।

ভাবি, আমি বলব।

রাত দু'টায় হৈচৈ-এর শব্দে শাহেদের ঘুম ভাঙল। হৈচৈ-এর কারণ গৌরাঙ্গের ঘুম ভেঙেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সে স্ত্রীর হাত ধরে শাহেদের ঘরে ঢুকল। গম্ভীর গলায় বলল, তুই গান শুনতে চেয়েছিলি, ওকে নিয়ে এসেছি।

শাহেদ বলল, বেচারি সারাদিন খাটাখাটনি করেছে। এখন রাত দু'টা। আরেকদিন এসে গান শুনব।

গৌরাঙ্গ বলল, আরেকদিন কী? আজই গান হবে। আমি তবলা হারমোনিয়াম নিয়ে আসছি।

শাহেদ বলল, তবলা কে বাজাবে?

গৌরাঙ্গ বলল, আমি বাজাব। আর কে বাজাবে?

নীলিমা গান করছে। শাহেদ অবাক হয়ে কিন্নর কণ্ঠ শুনল। মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে কেউ অতি সুরেলা গলায় গান করছে—

ওপারে মুখর হলো কেকা ঐ
এপারে নীরব কেন কুহু হায়

www.MurchOna.com

পুলিশ ইন্সপেক্টর মোবারক হোসেন গত দু'বছরে সকাল হওয়া দেখেন নি। তিনি ঘুমুতে যান রাত দেড়টার দিকে। তাঁর ঘুমের সমস্যা আছে। শোয়ামাত্র ঘুম আসে না। এপাশ ওপাশ করতে করতে কোনোদিন রাত তিনটাও বেজে যায়। যে রাত তিনটায় ঘুমুতে যায়, সে সুবেহ্‌সাদেক দেখবে এরকম আশা করা অন্যায়। তবে আজ তিনি বাড়ির ছাদে উঠে সকাল হওয়া দেখলেন। সোবহানবাগে তাঁর একতলা পাকাবাড়ির ছাদটা সুন্দর। ছাদে উঠলে মনে হয় গ্রামে চলে এসেছেন। চারদিকে প্রচুর গাছপালা থাকায় উপর থেকে কেমন জঙ্গল জঙ্গল লাগে। গাছপালার মাথায় রাত কেটে সকাল হওয়ার দৃশ্য অপূর্ব, যে-কেউ মোহিত হবে। মোবারক সাহেব এই দৃশ্য দেখলেন, মোহিত হলেন, এরকম বলা যায় না। কোনো কিছু দেখে মোহিত হওয়া তাঁর চরিত্রের মধ্যে নেই। তাঁর মন অসম্ভব খারাপ। শরীরও খারাপ, প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। এই অবস্থায় প্রকৃতির শোভায় মন বসে না।

তার স্ত্রীর সন্ধ্যা থেকে প্রসবব্যথা শুরু হয়েছে। পানি ভেঙেছে রাত একটার দিকে। তখন থেকেই খিঁচুনির মতো হচ্ছে। লক্ষণ ভালো না, তবে মোবারক হোসেন তার জন্য খুব চিন্তিতও বোধ করছেন না। মেয়েছেলের প্রাণ, কই মাছের প্রাণের চেয়েও শক্ত। যাই যাই করবে কিন্তু যাবে না। ঘরে অভিজ্ঞ ধাই আছে। এর হাতেই তার আগের তিনটি সন্তান হয়েছে। তিনটাই মেয়ে। খুবই আফসোসের ব্যাপার। এবারেরটা ছেলে হবার সম্ভাবনা আছে। আজমির শরিফের সুতা এনে পরানো হয়েছে। শাহজালাল সাহেবের দরগায়ে তিনি নিজে গিয়ে সিন্নি চড়িয়ে এসেছেন। সময়ের অভাবে শাহ পরাণের মাজারে যেতে পারেন নি। এটা একটা ভুল হয়েছে। শাহ পরাণ শাহ জালাল সাহেবের ভাগ্নে। মামা-ভাগ্নে দু'জনের কবর জিয়ারত না করলে মনের বাসনা পূর্ণ হয় না— এরকম কথা প্রচলিত আছে।

এবার যে তাঁর স্ত্রীর প্রসবব্যথা জটিল আকার ধারণ করেছে— এটা একটা শুভ লক্ষণ। পুত্রসন্তান প্রসবে যন্ত্রণা বেশি হয়। জমিলার ব্যথার নমুনা দেখে

www.MurchOna.com

আশা করা যাচ্ছে শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। তবে মানুষ সব সময় যা আশা করে তা হয় না, এটাই চিন্তার কথা।

তার এখন খারাপ সময় যাচ্ছে। ছিলেন আইবিতে, সাদা পোশাক থেকে হঠাৎ বদলি করে দিল ইউনিফর্মে। তাঁর খুশি হওয়ারই কথা। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা পুলিশ ইন্সপেক্টর হলো ডাল বরাবর। তাদের দেখায় প্রাইভেট কলেজের বাংলার প্রফেসরের মতো। বাজারে গেলে মাছওয়ালাও ফিরে তাকায় না। পুলিশের চাকরির আসল মজা ইউনিফর্মে। দেখামাত্র সবাই সমীহ করে তাকাবে। কিন্তু এমনই তাঁর কপাল, খাকি পোশাকটা পরার পর থেকেই শুরু হলো যন্ত্রণা। পোশাকটা পরার পর থেকে বলতে গেলে রোজই হাঙ্গামা হুজ্জত হচ্ছে। বাঙালি অদ্ভুত এক জাতি। যাদের বিশ্বাস করে তাদের সব কথা বিশ্বাস করে। তারা যদি বলে— চিলে কান নিয়ে গেছে— কান নিয়েছে কি নেয় নি যাচাই করে না। গালের পাশে হাত দিলেই বুঝবে কান এখনো আছে। জুলপির পাশে ঝুলছে। তারপরেও লাঠিসোটা নিয়ে দলবেঁধে ছুটতে থাকে চিলের পিছনে। আবার যাদের অবিশ্বাস করে তাদের কোনো সত্য কথাও বিশ্বাস করে না। তথ্যমন্ত্রী সাহাবুদ্দিন সাহেব বললেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত ইসলাম এবং পাকিস্তানের ঐতিহ্যের পরিপন্থী বলে রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারিত হবে না। এতেই লেগে গেল ধুন্ধুমার কাণ্ড। ধরোরে, মারোরে, জ্বালাওরে, পোড়াওরে। একটা লোক একটা কথা বলেছে তাতেই এই ? রবীন্দ্রসঙ্গীত এমন কী রসগোল্লা ? প্যানপ্যানানি ছাড়া আর কী ? তথ্যমন্ত্রী তো ভুলও বলেন নি। ইসলামি কোনো গান কি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ? তাঁর কোনো গানে কি মা আমিনার কথা আছে ? নজরুল তো অনেক হিন্দু-গান লিখলেন। শ্যামাসঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথ দু'একটা ইসলামি গান তো লিখতেও পারতেন। যে গান লিখতে পারে, সে হিন্দু গান মুসলমান গান সবই লিখতে পারে। লিখলেন না কেন ? দাড়ি রাখার সময় তো এক হাত লম্বা দাড়ি রেখে ফেললেন। কুর্তা যেটা পরেন সেটাও তো ইসলামি কুর্তা। তিনি যদি দু'একটা ইসলামি গান লিখতেন, তাহলে এই সমস্যা হতো না।

মিটিং মিছিল, লাঠি চার্জ, কাঁদানি গ্যাস। সামান্য গানের জন্যে কী অবস্থা!

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হামিদুর রহমান সাহেব একটা কথার কথা বলেছেন। সেটা নিয়েও কত কাণ্ড! সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি তো আর ঘাস খেয়ে হয় না। এরা যখন কথা বলে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে বলে। ভদ্রলোক আরবি হরফে বাংলা লেখার কথা বলেছেন। কথা যে খুব খারাপ বলেছেন তাও

তো না। গ্রামের অনেক মানুষ আছে, যারা বাংলা জানে না। কিন্তু কোরান শরীফ পড়তে পারে। তারা তখন বাংলাও পড়তে পারবে। এটা খারাপ কী? আরবি হরফে বাংলা লিখলে বাংলার ইজ্জত কমে না। ইজ্জত বাড়ে। নবিজীর ভাষায় বাংলা লেখা হচ্ছে এটা কি কম কথা? কত বড় ইজ্জত! আচ্ছা তারপরেও তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম এটা খারাপ। যদি খারাপ হয়ও এত হৈচৈ করার কী আছে? অদ্ভুত একটা জাতি। শান্তি চায় না, চায় অশান্তি। অশান্তি ছাড়া তাদের ভালো লাগে না। আয়ুব খানের মতো নেতাকে পছন্দ না। ভোট দিতে হবে থুড়থুড়ি বুড়ি ফাতেমা জিন্নাহকে। মেয়েছেলে হবে দেশের প্রধান। কথা হলো? হাদিস-কোরানে আছে মেয়েছেলেকে রাষ্ট্রপ্রধান করা যাবে না। সেই ফাতেমা জিন্নাহকে ভোট দেওয়ার জন্য লাফাচ্ছে মাওলানা ভাসানী। হাদিস-কোরান জানা একজন মানুষ। নামের আগে মাওলানা। তাকে ভোট দিলে তোমার লাভটা কী? দেশে অশান্তি হয় এটাই লাভ। কী আশ্চর্য দেশ! কী আশ্চর্য দেশের নেতা!

নতুন একটা জিনিস শুরু হয়েছে— দফা। আজ ছয় দফা। কাল এগারো দফা। তারপরের দিন চৌদ্দ দফা। দফাই যে দেশের দফা রফা করবে এই সাধারণ জ্ঞানটা যে জাতির নাই, সে জাতির ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার।

মোবারক হোসেনের ধারণা আগরতলা মামলাটা প্রত্যাহার করা আয়ুব খানের জন্য খুব বড় বোকামি হয়েছে। আয়ুব খান বোকা না, সে এত বড় বোকামি করল কেন? এই কাজটায় তার দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। বাঙালি জাতি দুর্বলতার গন্ধ পেলে লাফিয়ে ওঠে। এখন শুরু করেছে লাফ-ঝাঁপ। শেখ মুজিবুর রহমান হিরো বনে গেছেন। আয়ুব খানের উচিত ছিল ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া। দশ-বারোটাকে ফাঁসিতে ঝোলালে সব ঠাণ্ডা হয়ে যেত। বাঙালি গরমের ভক্ত নরমের যম। একটু নরম দেখলে আর উপায় নেই— ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। তারা যত ঝাঁপ দেবে পুলিশ তত বিপদে পড়বে। বাঙালি জাতির যত রাগ খাকি পোশাকের দিকে। পুলিশের দিকে ঢিল মারতে পারলে তারা আর কিছু চায় না। আসাদুজ্জামানের মৃত্যুর পর পর কী অবস্থা! মানুষ দেখতে দেখতে ক্ষেপে গেল। তাঁর নিজের জীবন নিয়ে টানাটানি। আরেকটু হলে মারাই পড়তেন। আস্ত একটা ইট এসে পড়ল বাঁ হাতের কনুইতে। মট করে শব্দ। হাত যে ভেঙে গেছে তখনো বোঝেন নি। বোঝার কথা না। মাথা ছিল পুরোপুরি আউলা। ভাঙা হাত জোড়া লাগলেও পুরোপুরি সারে নি। অমাবশ্যা-পূর্ণিমায় ব্যথা হয়। হাতে জোর বলতে কিছু নেই। পানিভর্তি গ্লাস পর্যন্ত এই হাতে তুলতে পারেন না।

www.MurchOna.com

মোবারক হোসেন বিষণ্ন মুখে ছাদ থেকে নেমে এলেন।

বাড়ির ভেতর থেকে তখনো কোনো খবর আসে নি। লেডি ডাক্তারের খোঁজে একজন গিয়েছে। পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলা এসেছেন। ভদ্রমহিলা খুব পর্দা মানেন। আজ দেখা গেল পর্দার বরখেলাপ করেই মোবারক হোসেনের সঙ্গে কথা বললেন। কথার বিষয়বস্তু হচ্ছে; রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া।

মোবারক হোসেন বললেন, আচ্ছা, দেখি। তার মেজাজ আরো খারাপ হলো। রোগী আবার কী! গর্ভবতী মহিলা সন্তান প্রসব করছে। সাধারণ একটা ব্যাপার। হাসপাতাল-ফাসপাতাল আবার কী!

সকাল আটটার দিকে জমিলার অবস্থা আরো খারাপ হলো। খিঁচুনি বেড়ে গেল। তিনি ক্লান্ত গলায় তাঁর মাকে ডাকতে লাগলেন। সেই মা অনেককাল আগে মারা গেছেন। কন্যার অসহনীয় কষ্টের সময় তিনি পাশে থাকতে পারবেন না। তাঁর কন্যা বারবার ডাকতে লাগল, মাইজি ও মাইজি।

দুপুর একটায় জমিলা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে মারা গেলেন।

মোবারক হোসেন স্ত্রীর মৃত্যুতে দুঃখিত হলেন ঠিকই, সেই দুঃখের মধ্যেও কিছু আনন্দ লেগে থাকল। পরপর তিনটি কন্যাসন্তানের পর তাঁর এবার পুত্র হয়েছে। গায়ের রঙ সুন্দর, ধবধবে সাদা। নাক খাড়া, মেয়েগুলোর নাকের মতো উপজাতীয় টাইপ থ্যাবড়া নাক না।

তিনি ছেলের নাম রাখলেন, ইয়াহিয়া।

একজন নবির নামে নাম, তবে এই নামকরণের শানে-নুযুল অন্য।

তাঁর ছেলের জন্ম ১৯৬৯ সনের ২৫ মার্চ। ঐ দিন জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতায় যান এবং দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। সঙ্গে সঙ্গেই দেশের অবস্থা ঠাণ্ডা। জ্বালাও-পোড়াও, মারামারি, কাটাকাটি বন্ধ। 'জাগো জাগো, বাঙালি জাগো' বন্ধ। শহরে মিলিটারি নেমে গেল। ভীতু বাঙালি বলতে গেলে ভয়ে গর্তে ঢুকে গেল। পুলিশরা ইজ্জত ফিরে পেল। এখন আর খাকি পোশাক দেখলে কেউ বলে না— ঠোলা।

মোবারক হোসেন ইয়াহিয়া নামক যে জেনারেলের কারণে এই ঘটনা ঘটল, তাকে সম্মান করেই ছেলের নাম ইয়াহিয়া রাখলেন। ছেলের জন্যে আকিকা করলেন শাহজালাল সাহেবের দরগায়।

আয়ুব খানের লেখা যে-চিঠিতে এই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল, মোবারক হোসেন সেই চিঠি যত্ন করে পত্রিকা থেকে কেটে রেখে দিলেন।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

আয়ুব খান সাহেব জেনারেল ইয়াহিয়াকে লিখলেন—

প্রেসিডেন্ট হাউজ
২৪ মার্চ ১৯৬৯

প্রিয় জেনারেল ইয়াহিয়া,

অতীব দুঃখের সহিত আমাকে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হইয়াছে যে, দেশের সমুদয় বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা ও নিয়মতান্ত্রিক কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান উদ্বেগজনক অবস্থার যদি অবনতি ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে দেশের অর্থনৈতিক জীবনধারা তথা সভ্য জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

এমতাবস্থায় ক্ষমতার আসন থেকে নামিয়া যাওয়া ছাড়া আমি কোনো গত্যন্তর দেখিতেছি না। তাই আমি পাকিস্তান দেশরক্ষা বাহিনীর হস্তে দেশের পূর্ণ কর্তৃত্ব ন্যস্ত করিয়া যাওয়ার সাব্যস্ত করিয়াছি, কেননা সামরিক বাহিনীই দেশের আজিকার একমাত্র কর্মক্ষম ও আইনানুগ যন্ত্র।

আয়ুব খান

পুত্র ইয়াহিয়া আশীর্বাদ হিসেবে জন্ম নিয়েছে— এই বিশ্বাস মোবারক হোসেনের মনে শিকড় গেড়ে বসে গেল। ভালো যা হয় তাই তিনি পুত্রের জন্মের কারণে হচ্ছে বলে ধরে নেন। এই সময় তিনি তাঁর মৃতা মা'কেও স্বপ্নে দেখেন। স্বপ্নে তিনি শিশু ইয়াহিয়াকে কোলে নিয়ে আদর করছেন। হঠাৎ সেখানে মোবারক হোসেনকে দেখে কিছু রাগ কিছু বিরক্তি মেশানো গলায় বললেন, ও মনু (মোবারক হোসেনকে তিনি মনু ডাকতেন), তোর বিপদআপদের দিন শেষ। এই ছেলে তোর জন্য কবজ হিসাবে দুনিয়াতে আসছে। এরে ভালো মতো দেখভাল করবি। বৎসরে একবার এরে আজমিরে নিয়া যাবি। আর মাঝেমধ্যে হরিণের মাংস দিয়া ভাত খাওয়াবি।

পুত্রের দেখভালের জন্যে তিনি পরের বৎসর সাফিয়া নামের এক মধ্যবয়স্ক মহিলাকে বিয়ে করেন। এই বিয়ে তাঁর জীবনে আশীর্বাদের মতোই হয়েছিল।

সাফিয়া মোটাসোটা ধরনের মহিলা। তার প্রধান যে তিনটি গুণ মোবারক হোসেনের চোখে পড়ল তা হলো— এই মহিলার রাঁধার হাত খুব ভালো। সে যা-ই রাঁধে অমৃতের মতো লাগে।

www.MurchOna.com

মহিলা তার স্বামীকে যমের মতো ভয় পায়। (মোবারক হোসেনের মতে, এই গুণটি স্ত্রীদের মহত্তম গুণের একটি। যে পরিবারে স্ত্রী স্বামীকে ভয় পায় না, মান্য করে না, সেই পরিবারে কখনো সুখ আসে না।)

সাফিয়ার তৃতীয় গুণটি কোনো গুণের মধ্যে পড়ে না। বেকুবির মধ্যে পড়ে। অতি বোকা মহিলাদের মধ্যে এই গুণটি দেখা যায়। তারা স্বামীর সংসারের সবকিছুকেই নিজের মনে করে। স্বামীর আগের পক্ষের সন্তানকে তারই সন্তান বলে ভাবতে থাকে। সাফিয়ার ক্ষেত্রেও এই জিনিস ঘটল। মোবারক হোসেনের তিন মেয়ে অতি দ্রুত হয়ে গেল তার তিন মেয়ে। ছেলেটিকেও যেন সে-ই কিছুদিন আগে প্রসব করেছে।

মোবারক হোসেন একদিন দুপুরে হঠাৎ কী জন্যে যেন বাসায় এসেছেন। তিনি শোবার ঘরে ঢুকে দেখেন, মেঝেতে পাটি বিছিয়ে সাফিয়া পান খাচ্ছে। তার তিন মেয়ের একজন সাফিয়ার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। একজন গায়ে হেলান দিয়ে আছে। আর তৃতীয়জন হাত-পা নেড়ে গল্প করছে। তিন মেয়ের মুখেই পান।

বাবাকে দেখে তিন মেয়ে অতি দ্রুত পালিয়ে গেল। সাফিয়া হঠাৎ এমন ভয় পেলেন যে মুখ থেকে পানের রস বের হয়ে শাড়িতে পড়ে গেল। মোবারক হোসেন অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। মা'র চেয়ে যে মাসির দরদ বেশি, সেই মাসি হলো ডান। মা'র চেয়ে যদি সৎমায়ের দরদ বেশি হয়, তাহলে সেই সৎমা ডানের চেয়েও খারাপ। মেয়েদের নিয়ে পান খাওয়া-খাওয়ি আবার কী ? পান-বিড়ি-সিগারেট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে খাওয়া যায় না।

মোবারক হোসেন ভয়ে অস্থির হয়ে যাওয়া স্ত্রীকে শুধু বললেন, আড্ডা গুলবাজি কম করবা। এইসব আমার পছন্দ না। সাফিয়া সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল। আবার তার মুখে থেকে পানের রস গড়িয়ে পড়ল।

তার ছেলে যে সৌভাগ্যের কবচ হয়ে এসেছে— এই বিষয়ে মোবারক হোসেন নিশ্চিত হলেন ১৯৭০ সনের ১ জানুয়ারিতে। এই দিনই ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করার অনুমতি দিলেন। মোবারক হোসেন খান ঐ দিনই বদলি হলেন খাকি পোশাক থেকে ডিএসবি-তে। খাকি পোশাক বাতিল। এখন সাদা পোশাকের চাকরি, তাও আবার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে। দেশে অরাজকতা চলছে, এই সময়ে খাকি পোশাক বিপদজনক পোশাক। দেশের লোকজন ধরেই নিয়েছে, খাকি পোশাক মানেই খারাপ জিনিস। খাকি পোশাক মানেই শত্রু।

www.MurchOna.com

গোয়েন্দা বিভাগে যোগ দেয়ার দু'মাসের মাথায় মার্চ মাসের পঁচিশ তারিখ যেদিন তাঁর ছেলের বয়স এক বছর, তাঁর ডাক পড়ল সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের অফিসে। কর্নেল শাহরুখ খান তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চান। কথা বলবেন সন্ধ্যা সাতটায়, মোহাম্মদপুরের শেরশাহ্ সুরি রোডের এক বাসায়।

সেদিন বিকাল পাঁচটায় ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে তিনি বাড়িতে মিলাদের আয়োজন করেছেন। আত্মীয়স্বজনদের খবর দিয়েছেন। কাচ্চি বিরিয়ানি রাঁধার জন্যে পুরনো ঢাকা থেকে বাবুর্চি সাল্লু মাতবরকে আনা হয়েছে। মোবারক হোসেন সামান্য দুশ্চিন্তায় পড়লেন। মিটিং কতক্ষণ চলবে কে জানে! ছেলের প্রথম জন্মদিনে মিলাদ হবে আর তিনি থাকতে পারবেন না— এটা অবশ্যই একটা আফসোসের ব্যাপার। তবে তাঁর ধারণা এই মিটিংয়ে তার জন্যে শুভ কিছু আছে। তা না থাকলে বেছে বেছে ছেলের জন্মদিনেই এই মিটিং পড়বে কেন ?

কর্নেল শাহরুখের সঙ্গে দেখা করার জন্যে তিনি সন্ধ্যা ছ'টার সময়ই উপস্থিত হলেন। যে বাড়িতে মিটিং হচ্ছে সেটা কোনো অফিস না। একজনের বাড়ি। ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে। তাদের হৈচৈ কান্নাকাটি সারাক্ষণ হচ্ছে। সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের একজন বড় কর্তা তাকে এ ধরনের একটা বাড়িতে ডেকেছেন তা ভাবাই যায় না। মোবারক হোসেনকে বসার ঘরে এক ঘন্টা বসে থাকতে হলো। বসার ঘর দেখে মনে হয় না এখানে কেউ বসে। এক দিকে গাবদা গাবদা কিছু সোফা। অন্য দিকে তিন-চারটা বেতের চেয়ার। সোফার কভার নেই। একটা সোফার গদি ছিঁড়ে ভেতরের কাঠ বের হয়ে গেছে। ঘরের সাজসজ্জা বলতে দেয়ালে কাবা শরীফের ছবি। ছবিটা ঝকঝকে। ঠিক সন্ধ্যা ৭টায় তাঁর ডাক পড়ল।

কর্নেল সাহেবকে দেখে মোবারক হোসেন ধাক্কার মতো খেলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, একুশ-বাইশ বছরের একজন রূপবান যুবক, চুপ করে বসে আছে। প্রেমঘটিত জটিলতায় সে কিছু সমস্যায় আছে। যার জন্যে তার বয়স সামান্য বেশি লাগছে।

যে ঘরে কর্নেল সাহেব বসে আছেন, সেই ঘরটা বেশ বড়। তবে ঘরে আলো কম। এই কম আলোতেও কর্নেল সাহেবের চোখে কালো চশমা। কালো চশমার কারণে মনে হচ্ছে, কর্নেল সাহেবের চোখ উঠেছে। কর্নেল সাহেব ছাড়াও ঘরে আরেকজন ব্যক্তি উপস্থিত। তিনি সম্ভবত বাঙালি। তবে সাধারণ বাঙালির চেয়ে অনেক লম্বা। তিনি বসেছেন বড় একটা টেবিলের পেছনে। তাঁর সামনে চায়ের কাপ। চায়ের কাপটা এস্ট্রে হিসেবে কাজ করছে। চায়ের কাপের পাশে

www.MurchOna.com

ছ'প্যাকেট K-2 সিগারেট। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ বা তারচেয়ে বেশি। চিমশে ধরনের চেহারা। আজ শেভ করেন নি বলে মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কোনো কারণ ছাড়াই তিনি মাঝে মাঝে ঠোঁট ফাঁক করছেন। তখন তাঁর দাঁত দেখা যাচ্ছে। অতিরিক্ত সিগারেট খাবার জন্যেই হয়তো তাঁর দাঁতে লাল লাল ছোপ পড়েছে। ভদ্রলোকের সমস্ত মনোযোগ তাঁর সামনে রাখা চায়ের কাপের দিকে। তিনি একবারও মোবারক হোসেনের দিকে তাকান নি। কর্নেল সাহেব তাকিয়েছেন কি-না তাও মোবারক হোসেন ধরতে পারছেন না। কারণ কর্নেল সাহেবের চোখ কালো চশমায় ঢাকা।

ইন্সপেক্টর মোবারক হোসেন, সিট ডাউন প্লিজ।

মোবারক হোসেন কর্নেল সাহেবের সামনে রাখা চেয়ারে বসলেন। তাঁর নিজের উপর খুবই রাগ লাগছে, কারণ ঘরে ঢুকে তিনি সালাম দিতে ভুলে গেছেন। এখন সালাম দেয়াটা কি ঠিক হবে ?

হাউ আর ইউ ইন্সপেক্টর ?

মোবারক হোসেন বললেন, স্যার, আমি ভালো আছি। বলেই মনে হলো এটা কী করলাম! বাংলা তো উনি বুঝবেন না। আর এমন তো না যে ইংরেজি ভাষাটা তাঁর জানা নেই। তিনি অনায়াসে বলতে পারতেন— স্যার, আই এম ফাইন।

কর্নেল সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আচমকা মোবারক হোসেনকে চমকে দিয়ে সুন্দর বাংলায় স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন— ইন্সপেক্টর, তুমি কি কোনো কারণে ভীত ?

মোবারক হোসেন বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে বললেন, জি-না স্যার।

সরাসরি কাজের কথায় চলে যাই— তুমি কি শেখ মুজিবর রহমানকে কাছ থেকে দেখেছ ?

জি-না স্যার।

কখনো তাকে দেখতে যাও নি ? তাঁকে সালাম করবার জন্যে যাও নি ?

জি-না স্যার।

শত শত মানুষ রোজ তাকে দেখতে যায়। তাঁর দোতলা বাড়ির ব্যালকনির নিচে দাঁড়িয়ে থাকে তাঁর কথা শোনার জন্যে। তাকে এক নজর দেখার জন্যে। তুমি যাও নি কেন ?

মোবারক হোসেন শান্ত গলায় বললেন, স্যার, আমার শেখ সাহেবের বাড়িতে কোনো দিন ডিউটি পড়ে নাই।

www.MurchOna.com

ডিউটি পড়লে যাবে ?

অবশ্যই স্যার।

কর্নেল সাহেব এবার মোবারক হোসেনের দিকে সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, তোমার কি ধারণা শেখ মুজিব পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা চায় না-কি অখণ্ড পাকিস্তানের কর্তৃত্ব চায় ?

স্যার, আমি জানি না। এইগুলি অনেক বড় ব্যাপার। আমি সামান্য পুলিশ ইন্সপেক্টর। সরকারের নুন খাই।

সরকার যদি শেখ মুজিবের হাতে চলে যায়, তাহলে তো তুমি শেখ মুজিবের নুন খাবে ?

জি স্যার।

কর্নেল সাহেব তাঁর শার্টের পকেট থেকে সিগারেট বের করলেন। সাধারণত সিগারেট প্যাকেটে থাকে— ইনার সিগারেট প্যাকেট ছাড়া অবস্থায় পকেটে আছে। ব্যাপারটা মজার তো! কর্নেল সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, তোমার দেশের কোন জিনিসটা সবচে' ভালো ?

মোবারক হোসেন বললেন, স্যার, আপনি তোমার দেশ বলছেন কেন ? দেশটা তো আপনারও।

কর্নেল সাহেবের ঠোঁটে সামান্য হাসি দেখা গেল। তিনি সেই হাসি তৎক্ষণাৎ মুছে ফেলে গম্ভীর গলায় বললেন— তোমাকে খুশি করার জন্যে বলেছি। এই দেশ যে আমার সেটা আমি জানি। যাই হোক, প্রশ্নের জবাব দাও— তোমার দেশের কোন জিনিসটা তোমার সবচে' ভালো লাগে ?

মোবারক হোসেন শান্ত গলায় বললেন, মুক্তাগাছার মণ্ডা।

জিনিসটা কী ?

এক ধরনের মিষ্টান্ন। ছানা দিয়ে তৈরি হয়। ভাপে পাকানো হয়।

এত জিনিস থাকতে তোমার কাছে তোমার দেশের সবচে' পছন্দের জিনিস মুক্তাগাছার মণ্ডা!

জি স্যার।

ভালো কথা, এখন বলো— তোমার কি মনে হয় এই দেশটা আলাদা হয়ে যাবে ? দুই দেশের পতাকা হবে দুই রকম ?

স্যার পাকিস্তান ভাঙবে না।

কোন যুক্তিতে বলছ ভাঙবে না ?

www.MurchOna.com

কোনো যুক্তি না। আমার মন বলছে ভাঙবে না।

কর্নেল সাহেব পকেট থেকে আরেকটি সিগারেট বের করে ঠোঁটে দিতে দিতে বললেন, আমারও তাই ধারণা। যার রাজনৈতিক গুরু সোহ্‌রাওয়ার্দী তিনি পাকিস্তান ভাঙতে চাইবেন না। তিনি চাইবেন অখণ্ড পাকিস্তানের ক্ষমতায় যেতে। তবে জেনারেল ইয়াহিয়াকেও তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। যদিও জেনারেল ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সব কথাই মেনে নিচ্ছেন। নভেম্বরের জলোচ্ছ্বাসের পর মাওলানা ভাসানী চাইলেন ইলেকশন পিছিয়ে দিতে। মানুষের এত দুর্ভোগ, এর মধ্যে ইলেকশন কী! কিন্তু শেখ মুজিব ইলেকশন পিছিয়ে দিতে রাজি হলেন না। জেনারেল ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে খুশি করার জন্যে ইলেকশন পিছালেন না। আমার ধারণা ইয়াহিয়া শুধু একটা জিনিসই চাচ্ছেন— যা হবার হোক, যার ইচ্ছা ক্ষমতায় যাক, শুধু পাকিস্তান টিকে থাকুক। ইন্সপেক্টর মোবারক!

জি স্যার

তোমার মনের ইচ্ছাটাও তো সে-রকম। তাই না?

জি স্যার।

তোমাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি, এখন থেকে তোমার ডিউটি শেখ মুজিবর রহমান সাহেবের ধানমণ্ডির বাড়িতে। তুমি সেই বাড়িতে ঢুকবে। নিজের একটা জায়গা করে নিবে। কীভাবে করবে সেটা তোমার ব্যাপার।

স্যার, আমার কাজটা কী?

ঐ বাড়িতে অবস্থান নেওয়াটাই তোমার কাজ। আর কিছু না।

আর কিছুই না?

না আর কিছু না। প্রতি সপ্তাতে একবার বুধবার সন্ধ্যায়— জোহর সাহেবের সঙ্গে এই বাড়িতে দেখা করবে। তার সঙ্গে গল্পগুজব করবে। জোহর কে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। ঐ যে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে।

মোবারক হোসেন জোহর সাহেবের দিকে তাকাল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিনীত ভঙ্গিতে সালাম দিল। জোহর তার জবাব দিলেন না। আগের মতোই চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কর্নেল সাহেব বললেন, জোহর পূর্ণিয়া জেলার লোক। আমার অতি ঘনিষ্ঠ একজন। সে একজন কবি। তার শায়ের শুনলে মুগ্ধ হবে। তার পছন্দের কবির নাম শুনলেও তুমি চমকে উঠবে। তার পছন্দের কবির নাম টেগোর। তোমাদের রবীন্দ্রনাথ।

www.MurchOna.com

মোবারক হোসেন চমকালেন না। তবে বিস্মিত হবার ভঙ্গি করলেন। কর্নেল সাহেব বললেন, জোহর একজন চেইন স্মোকার। এখন ইন্সপেক্টর মোবারক বলো তো দেখি— তুমি এই ঘরে ঢোকার পর থেকে জোহর কয়টা সিগারেট খেয়েছে ?

নয়টা।

ভালো। তোমার অবজারবেশন ভালো। তুমি যেতে পার।

স্যার চলে যাব ?

হ্যাঁ চলে যাবে।

স্লামালিকুম স্যার।

ওয়ালাইকুম সালাম। ইন্সপেক্টর শোন, তোমার ছেলের জন্মদিন উৎসব থেকে তোমাকে বঞ্চিত করেছি— এতে তুমি কিছু মনে করবে না। দেশের কল্যাণের জন্যে ছোটখাটো স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়।

মোবারক হোসেন চমকালেন না। এরা তার ছেলের জন্মদিন জানে— এতে বিস্মিত হবার কিছু নাই। গোয়েন্দা বিভাগ তার সম্পর্কে কিছু না জেনেশুনে তাকে ডাকবে না। তার ছেলের নাম যে ইয়াহিয়া— এটাও তারা অবশ্যই জানে।

ইন্সপেক্টর!

ইয়েস স্যার।

তুমি কিছু বলবে ?

জি-না স্যার।

তোমাকে সামান্য টিপস দিয়ে দেই। শেখ মুজিবের আস্থাভাজন হওয়া খুবই সহজ কাজ। এই মুহূর্তে প্রতিটি বাঙালির প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তিনি সমস্ত বাঙালিকে বিশ্বাস করেন আর আমরা প্রতিটি বাঙালিকে অবিশ্বাস করি। তিনিও ভুল করছেন। আমরাও ভুল করছি। ভুলের মাশুল তিনি যেমন দেবেন। আমরাও দেব। কে কতটুকু দেবে কে জানে! ঠিক আছে, তুমি যাও। Happy birthday to your son.

ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর বাড়িটাকে কি বাড়ি বলা যাবে ? বাড়ি মানেই অলস দুপুর। বাড়ি মানেই ভাদ্র মাসের গরমে আচমকা উড়ে আসা হিমেল হাওয়া। বাড়ি মানে বারান্দার রেলিং-এ শুকাতে দেয়া রঙিন শাড়ি।

এখানে সেরকম কিছু নেই— বাজারের মতো ভিড়। এই একদল আসছে। এই যাচ্ছে। যারা আসছে প্রথম কিছুক্ষণ খুবই উত্তেজিত অবস্থায় থাকছে।

কয়েকবার স্লোগান দেয়ার পর তাদের উত্তেজনা ঝপ করে অনেকখানি কমে যাচ্ছে। তখন তাদের খানিকটা দিশাহারাও মনে হচ্ছে। স্লোগান পর্ব শেষ। এখন কী করা উচিত তা বুঝতে না পেরে দিশাহারা। দল নিয়ে এসে হুট করে চলে যাওয়া যায় না। কিছুক্ষণ থাকতে হয়। দল পরিচালনা করে যারা এসেছেন, শেখ সাহেবের সঙ্গে দেখা না করে চলে গেলে তাদের মান থাকে না।

গ্রহকে ঘিরে উপগ্রহ ঘুরপাক খায়। শেখ সাহেব বিশাল গ্রহ। তাকে ঘিরে ঘুরপাক খাওয়া উপগ্রহের সংখ্যাও সেই কারণে অনেক। তাদের ডিঙিয়ে শেখ সাহেবের দেখা পাওয়া মুশকিল। তবু চেষ্টা চালাতে হয়।

মোবারক হোসেন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে থাকেন। কাণ্ডকারখানা দেখেন। তাঁর ভালোই লাগে। দুপুরে কখনো কখনো বড় বড় হাঁড়ি ভর্তি খাবার আসে। কোনোদিন তেহারি, কোনোদিন খিচুড়ি মাংস। তখন চারদিকে আলাদা উত্তেজনা তৈরি হয়। এই উত্তেজনা দেখতেও খারাপ লাগে না। সবচে' ভালো লাগে পাতি নেতাদের জ্ঞানী জ্ঞানী আলোচনা। পাতি নেতাদের সঙ্গেও পাতি উপগ্রহ থাকে। পাতি নেতাদের আলোচনা চলে পাতি উপগ্রহদের সঙ্গে।

মাওলানা কী চাচ্ছে বুঝলাম না। তার দলের স্লোগান 'ভোটের আগে ভাত চাই'। ভাতের অধিকার নিশ্চিত করার জন্যেই তো ভোট দরকার। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হওয়া অস্বাভাবিক না যে, ইয়াহিয়ার সাথে তাঁর একটা অশুভ আঁতাত হয়েছে। এদিকে আবার কমুনিস্ট পার্টির হাবভাব ভালো লাগছে না। কম্যুনিস্টরা কী করবে না করবে সেটা বোঝা অবশ্যি খুবই মুশকিল। বিষয়টা নিয়ে শেখ সাহেবের সঙ্গে বসতে হবে।

যিনি বিষয়টা নিয়ে শেখ সাহেবের সঙ্গে বসতে চাচ্ছেন— তাঁর ভঙ্গি এরকম যেন তিনি শেখ সাহেবের প্রধান উপদেষ্টাদের অন্যতম। এই শ্রেণীর নেতারা দলীয় কর্মীদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্যে কিছুক্ষণ পর পর স্লোগানের আয়োজন করে। সবার চেষ্টা থাকে যেন তাদের স্লোগানটা অন্যদের চেয়ে আলাদা হয়।

'ইয়াহিয়ার বুকে লাথি মারো
সোনার বাংলা স্বাধীন করো।'

'একটা দু'টা মিলিটারি ধরো
সকাল বিকাল নাশতা করো।'

ছাত্রনেতাদের ভাবভঙ্গি সবার চেয়ে আলাদা। যেন বিরাট আন্দোলন তারাই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শেখ মুজিবর রহমান সঙ্গে আছেন ভালো কথা। সঙ্গে না থাকলেও খুব অসুবিধা হবে না, আমরা চালিয়ে নিয়ে যাব। দেশ স্বাধীন করা

www.MurchOna.com

আমাদের কাছে কোনো ব্যাপার না। শেখ মুজিবর রহমান এদের প্রশ্রয়ও দিচ্ছেন। প্রশ্রয় না দিয়ে তাঁর হয়তো উপায়ও নেই।

মোবারক হোসেনের এই বাড়িতে তৃতীয় দিনের ঘটনা। সকাল হচ্ছে। শেখ মুজিব ফজরের নামাজ শেষ করে দোতলা থেকে একতলায় নামলেন। সরাসরি এগিয়ে গেলেন মোবারক হোসেনের দিকে। ভরাট গলায় বললেন, তুই কে?

মোবারক হোসেন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পা ছুঁয়ে সালাম করল।

তোকে প্রায়ই দেখি। তুই কে?

স্যার, আমি আইবির লোক।

তোকে কি আমার বাড়িতে ডিউটি দিয়েছে?

জি স্যার।

তোর সঙ্গে পিস্তল আছে?

আছে।

তোর ডিউটি কী?

কে আসে কে যায় এইটা খেয়াল করা।

শেখ সাহেব হেসে ফেলে বললেন, তুই তো তোর গোপন কথা সবই বলে ফেললি। তুই আইবির লোক, তুই তোর পরিচয় গোপন রাখবি না?

আমি সরকারের হুকুমে আসলেও আমি ডিউটি করি আপনার। আমি খেয়াল রাখি যেন কেউ আপনার কোনো ক্ষতি করতে না পারে।

আমার ডিউটি করিস কী জন্যে?

কারণ আপনিই সরকার।

শেখ মুজিব এই কথায় খুবই তৃপ্তি পেলেন। মোবারক হোসেনের কাঁধে হাত রেখে বললেন, তুই আমার জন্যে কী করতে পারবি?

আপনি যা করতে বলবেন, করতে পারব। যদি বলেন ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়। আমি পড়ব।

তোর নাম কী?

মোবারক হোসেন। পুলিশ ইন্সপেক্টর।

দেশের বাড়ি কোথায়?

কিশোরগঞ্জ।

ভালো জায়গায় জন্ম। বীর সখিনার দেশ। ছেলেমেয়ে কী?

www.MurchOna.com

তিন মেয়ে এক ছেলে। তিন মেয়ের নাম— মরিয়ম, মাসুমা, মাফরুহা আর ছেলের নাম ইয়াহিয়া।

কী বলিস তুই, ছেলের নাম ইয়াহিয়া ?

আমার দাদিজান রেখেছেন। নবির নামে নাম।

আয় আমার সঙ্গে।

স্যার, কোথায় যাব ?

তোকে নিয়ে বাড়ির ছাদে উঠব। তারপর তোকে হুকুম দিব ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়তে। দেখি হুকুম তালিম করতে পারিস কি-না।

মোবারক হোসেন শান্ত গলায় বললেন, স্যার চলেন।

শেখ মুজিব মোবারক হোসেনকে নিয়ে দোতলায় এলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, এই আমাদের দু'জনকে নাশতা দাও। এ হলো আমার এক ছেলে।

শেখ মুজিবের চোখে-মুখে তৃপ্তি ও আনন্দ ঝলমল করতে লাগল।

www.MurchOna.com

ইরতাজউদ্দিন কাশেমপুরীর মনটা আজ খারাপ। তিনি নীলগঞ্জ হাইস্কুলের বারান্দায় কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে এখন টিচার্স কমনরুমে বসে আছেন। তাঁর হাতে দুদিন আগের বাসি খবরের কাগজ। দুদিন আগে ঢাকা শহরে কী ঘটেছে কাগজে মোটামুটি তাই লেখা। নীলগঞ্জ ঢাকা থেকে দুদিন পিছিয়ে আছে। ইরতাজউদ্দিন খবরের কাগজটা পড়ার চেষ্টা করছেন। তাঁর মন বসছে না। মেজাজ বিগড়ে গেলে কোনো কিছুতেই মন বসে না। হেডমাস্টার মনসুর সাহেব আজ সকালে তাকে কিছু কথা বলেছেন, যা শোনার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। মনসুর সাহেব বয়সে তার ছোট। বয়োকনিষ্ঠ একজন মানুষের কাছ থেকে কঠিন কথা শুনলে মন খারাপ হয়ে যায়। তবে বয়স কোনো ব্যাপার না। ধানী মরিচ সাইজে ছোট হলেও তার ঝাঁঝ বেশি। সেভাবে চিন্তা করলে হেডমাস্টার সাহেবের কঠিন কথাগুলো হজম করে নেওয়া যায়। ইরতাজউদ্দিন হজম করতে পারছেন না। কারণ হেডমাস্টার সাহেবের কথাগুলো তার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না।

ব্যাপারটা সামান্য। ঢাকা থেকে ফেরার সময় তিনি স্কুলের জন্যে একটা বড় পতাকা কিনে এনেছেন। ১২ টাকা নিয়েছে দাম। দাম বেশি নিলেও জিনিসটা সিল্কের তৈরি, সাইজেও আগেরটার তিনগুণ। সবুজ রঙটা গাঢ়। আগেরটার রঙ জ্বলে গিয়েছিল। পতাকাটা আজ তিনি নিজের হাতে টানিয়েছেন। ঝকঝকে নতুন পতাকা বাতাস পেয়ে ডানা মেলে উড়ছে। দেখলেই মন ভরে যায়। বাঁশটা যদি আরো লম্বা হতো আর পতাকাটা আরো বড় হতো, তাহলে অনেক দূর থেকে চোখে পড়ত। মানুষজন অহঙ্কার নিয়ে বলত, ঐ যে দেখা যায় পতাকা— আমাদের নীলগঞ্জ হাইস্কুলের পতাকা। গ্রামের মানুষ ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে অহঙ্কার করতে ভালোবাসে।

ইরতাজউদ্দিন মুগ্ধ চোখে পতাকার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তার কাছে মনে হলো, নীল আকাশে সবুজ রঙের একটা টিয়া পাখি উড়ছে। গভীর আনন্দে ইরতাজউদ্দিন সাহেবের চোখে যখন প্রায় পানি এসে গেছে— তখন

স্কুলের দপ্তরি মধু এসে বলল, আপনেরে হেডস্যার ডাকে। তিনি আনন্দ নিয়েই হেডমাস্টার সাহেবের ঘরে ঢুকলেন। হেডমাস্টার সাহেব তার খুব পছন্দের মানুষ। ইরতাজউদ্দিন মনে মনে ঠিক করে ফেললেন, পতপত করে নতুন পতাকা উড়ছে— এই সুন্দর দৃশ্যটা হেডমাস্টার সাহেবকে দেখাবেন।

নীলগঞ্জ হাইস্কুলের হেডমাস্টার মনসুর সাহেব তাকে দেখে শুকনো গলায় বললেন, বসুন মাওলানা সাহেব। বলেই তিনি কী একটা লেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তার সামনে যে কেউ বসেছে, এটা যেন তার আর মনেই রইল না।

মনসুর সাহেব (এমএ. বিটি. গোল্ড মেডেল) মানুষটা ছোটখাটো। গায়ের রঙ ভয়াবহ ধরনের কালো। ছাত্ররা আড়ালে তাকে ডাকে 'অমাবস্যা স্যার'। স্বভাবে-চরিত্রে অসম্ভব কঠিন। গত ন'বছর ধরে তিনি এই স্কুলের হেডমাস্টার। এ ন'বছরে শুধু একদিনই নাকি তাকে হাসতে দেখা গেছে। ১৯৬৩ সালের মে মাসের ৮ তারিখে। সেদিন মেট্রিক পরীক্ষার রেজাল্ট হয়েছিল এবং নেপালচন্দ্র হাওলাদার নামের এই স্কুলের একজন ছাত্র ফোর্থ স্ট্যান্ড করেছিল। আবারো কোনো একদিন এই স্কুল থেকে কেউ স্ট্যান্ড করলে মনসুর সাহেব হয়তো হাসবেন। সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ। গ্রামের স্কুলে ভালো ছাত্র আসছে না।

ইরতাজউদ্দিন বসেই আছেন। হেডমাস্টার সাহেবের লেখালেখির কাজ শেষ হচ্ছে না। ইরতাজউদ্দিনের মনে হলো— হেডমাস্টার সাহেব আজ যেন অন্যদিনের চেয়েও গম্ভীর। মনে হয় তার শরীরটা ভালো না। কিংবা দেশ থেকে খারাপ কোনো চিঠি পেয়েছেন। প্রায়ই হেডমাস্টার সাহেব দেশ থেকে খারাপ চিঠি পান। মনসুর সাহেবের স্ত্রীর মাথা পুরোপুরি খারাপ। ভদ্রমহিলা থাকেন তার বাবার কাছে। সেখানে তার উপর নানান ধরনের চিকিৎসা চলে। চিকিৎসার কারণে কিংবা প্রাকৃতিক কারণে ভদ্রমহিলার মাথা মাঝে-মাঝে ঠিক হয়, তখন হেডমাস্টার সাহেব তাকে নীলগঞ্জ নিয়ে আসেন। সেই সময় হেডমাস্টার সাহেবের মুখ ঝলমল করতে থাকে। তাঁকে দেখে মনে হয় সুখী একজন মানুষ। গায়ের কালো রঙ তখন তেমন কালো লাগে না। সেই সময় প্রায় প্রতিদিনই তিনি স্ত্রীকে নিয়ে সোহাগী নদীর পাড় ধরে হাঁটেন। তাদের বাড়ির কাছেই একটা বটগাছ— যার কয়েকটা ঝুরি নেমে গেছে সোহাগী নদীর পানিতে। সেই বটগাছের গুঁড়িতেও প্রায়ই হেডমাস্টার সাহেবের স্ত্রীকে বসে থাকতে দেখা যায়। ঘোমটাটানা লাজুক ধরনের একটি মেয়ে। যার ভাব-ভঙ্গি এমন যেন নতুন বিয়ে হওয়া বউ, স্বামীর সঙ্গে যার এখনো তেমন করে পরিচয় হয় নি। মহিলা বসে থাকেন, তার আশপাশে হাঁটাহাঁটি করেন হেডমাস্টার সাহেব। বড়ই মধুর দৃশ্য। কিছুদিন পর ভদ্রমহিলার মাথা আবার যথানিয়মে খারাপ হয়। হেডমাস্টার সাহেব

বিষণ্ণ মুখে তাকে শ্বশুরবাড়ি রেখে আসেন। স্কুলে ফিরে কিছুদিন তার খুব মেজাজ খারাপ থাকে। অকারণে সবাইকে বকাঝকা করেন। তারপর আবার স্বাভাবিক হয়ে যান। সোহাগী নদীর পাড়ে একা একা হাঁটেন। বটগাছের ঝুরিতে একা বসে থাকেন।

হেডমাস্টার সাহেব লেখা বন্ধ করে চোখ তুলে তাকালেন। প্রায় বিড়বিড় করে বললেন, আমার বড় শ্যালককে একটা পত্র লিখলাম। আমার স্ত্রীর অবস্থা ভালো না। তারা তাকে পাবনার মেন্টাল হাসপাতালে ভর্তি করতে চায়।

কী হয়েছে?

নতুন করে কিছু হয় নাই। পুরনো ব্যাধি। তবে এবার নাকি বাড়াবাড়ি। আমার বড় শ্যালকের স্ত্রীকে মাছ কাটা বটি দিয়ে কাটতে গিয়েছিল। সবাই এখন ভয় পাচ্ছে। ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। এখন তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রেখেছে। খুব চিৎকার চেঁচামেচিও না-কি করে।

ইরতাজউদ্দিন কিছু বললেন না। চুপ করে রইলেন। তার মনটা খারাপ হলো। আর তখনি ভুরু কুঁচকে হেডমাস্টার সাহেব কথা বলা শুরু করলেন।

ইরতাজউদ্দিন সাহেব।

জি।

দেখলাম স্কুলে একটা পতাকা টানিয়েছেন।

জি, ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছি। বারো টাকা দাম নিয়েছে। কাপড়টা সিল্কের। জাতীয় পতাকা আজকাল পাওয়াই মুশকিল। কেউ বিক্রি করতে চায় না।

নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় কাজে খরচ করেছেন। অপ্রয়োজনীয় খরচ করার মতো অবস্থা স্কুলের নেই। যেখানে মাস্টারদের বেতন দিতে পারি না...

ইরতাজউদ্দিন নিচু গলায় বললেন, জাতীয় পতাকা অপ্রয়োজনীয় কোনো ব্যাপার না।

পতাকা তো একটা আমাদের ছিল।

সেটার রঙ জ্বলে গেছে।

মনসুর সাহেব গম্ভীর মুখে বললেন, এই দেশের জন্যে রঙ জ্বলে যাওয়া পতাকাই ঠিক আছে, রঙ তো বাস্তবেও জ্বলে গেছে।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, আপনার কথা বুঝলাম না।

হেডমাস্টার সাহেব বিরস গলায় বললেন, এক সময় এই পতাকাটাকে নিজের মনে হতো, এখন হয় না। সারা দেশে কী হচ্ছে খবর নিশ্চয়ই রাখেন, না রাখেন না?

www.MurchOna.com

জি, খবর রাখি।

লক্ষণ খুব খারাপ। পতাকা বদলে যেতে পারে। কাজেই আমার ধারণা, আপনি অকারণে দরিদ্র একটা স্কুলের বারোটা টাকা খরচ করিয়ে দিয়েছেন।

ইরতাজউদ্দিন বিস্মিত গলায় বললেন, পতাকা বদল হয়ে যাবে ?

হ্যাঁ, যাবে। চট করে বদল হবে না। তবে হবে। লক্ষণ সে-রকমই। মাওলানা ভাসানী পল্টনের মাঠে কী বক্তৃতা দিয়েছেন জানেন ?

জি-না।

না জানারই কথা, কোনো কাগজে আসে নাই। সব খবর তো কাগজে আসে না। কোনটা আসবে কোনটা আসবে না তা তারা ঠিক করে দেন।

মাওলানা ভাসানী কী বলেছেন ?

তিনি বলেছেন— নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবার। স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

কী বলেন এসব ?

পতাকা বদল হয়ে যাবে। চানতারা পতাকা থাকবে না। মাওলানা সাহেব সুফি মানুষ। উনার জ্বীন সাধনা আছে। জ্বীনদের মারফতে তিনি আগে আগে খবর পান। চানতারা পতাকা থাকবে না।

ইরতাজউদ্দিন চিন্তিত মুখে বললেন, যদি হয়ও সেটা ভালো হবে না।

ভালো হবে না কেন ?

হিন্দুর গোলামি করতে হবে। মুসলমান হিন্দুর গোলামি করবে সেটা কি হয় ?

হেডমাস্টার সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, কপালে গোলামি লেখা থাকলে গোলামি করতে হবে, উপায় কী ? তবে দেশ স্বাধীন হলেই হিন্দুর গোলামি করতে হবে— এ কী ধরনের চিন্তা ? আপনি আধুনিক মানুষ। আপনি উন্নত চিন্তা করবেন, সেটা তো স্বাভাবিক। এখন তো আমরা গোলামিই করছি। অন্য কিছু তো করছি না। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সার্ভিসে বাঙালির সংখ্যা কত জানেন ? শতকরা দশেরও কম। সেনাবাহিনীতে বাঙালির সংখ্যা জানেন ? না জানাই ভালো। পশ্চিমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরে যাবার আমাদের উপায় আছে ? কোনো উপায় নেই। শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব ইলেকশানে জিতে কি পেরেছেন এসেম্বলিতে বসতে ? পারেন নি। কারণ তাঁকে বসতে দেওয়া হবে না। কোনোদিনও না। এখন যা হচ্ছে তার নাম ধানাই আর পানাই। কাজেই আমাদের সময় হয়ে আসছে পতাকা খুলে ফেলে দেওয়ার।

পতাকা নামিয়ে ফেলব ?

www.MurchOna.com

হ্যাঁ। আপাতত পুরনো পতাকাই উড়ুক। নতুনটা না।

জি আচ্ছা।

আর পতাকার দাম বাবদ বাইশ টাকা আপনাকে স্কুল ফান্ড থেকে দেওয়া হবে না। পারচেজ কমিটির অনুমোদন ছাড়া আপনি পতাকা কিনেছেন। এটা আপনি পারেন না। সবকিছু নিয়মের ভিতর দিয়ে হতে হবে। নিয়মের বাইরে যাওয়া যাবে না।

জি আচ্ছা।

আর শুনুন, আমার স্ত্রীর জন্য একটু দোয়া করবেন।

জি, অবশ্যই করব। জোহরের নামাজের পরেই দোয়া করব ইনশাআল্লাহ।

ইরতাজউদ্দিন মন খারাপ করে হেডমাস্টার সাহেবের ঘর থেকে বের হলেন।

'স্বাধীন পূর্ববাংলা' এই জাতীয় কথাবার্তা ইদানীং খুব শোনা যাচ্ছে, কিন্তু এগুলি কোনো কাজের কথা না। অকাজের কথা। অখণ্ড হিন্দুস্তানে মুসলমানরা অনেক কষ্ট করেছে। জিন্নাহ সাহেব মহাপুরুষ মানুষ ছিলেন, তিনি অভাগা মুসলমানদের মুক্তি দিয়েছিলেন। অকৃতজ্ঞের মতো সেইসব কথা ভুলে গেলে চলবে না। মুসলমানদের ভুলে গেলে চলবে না যে কোনো হিন্দুর বাড়িতে তারা ঢুকতে পারত না। হিন্দু বাড়িতে মুসলমান ঢুকলে সেই বাড়ি অপবিত্র হয়ে যেত। হিন্দু ময়রার মিষ্টির দোকানে বসে তারা মিষ্টি খেতে পারত না। মুসলমানরা নগদ পয়সা দিয়ে ভিখিরির মতো দুহাত বাড়িয়ে দিত। মিষ্টি ছুড়ে দেওয়া হতো সেই হাতে। এই অপমানের ভেতর দিয়ে তাঁকে অসংখ্যবার যেতে হয়েছে। আজ যারা 'স্বাধীন বাংলা' 'স্বাধীন বাংলা' করছে, তারা কি এই অপমানের ভেতর দিয়ে গিয়েছে ? মাওলানা ভাসানী তো গিয়েছেন। তাহলে তিনি কেন এই কাণ্ডটা করছেন ? তার মতো বুদ্ধিমান লোক হিন্দুদের চাল বুঝতে পারবেন না তা কী করে হয় ?

ইন্ডিয়া যে একটা গভীর ষড়যন্ত্র করছে— এ তো বোঝাই যাচ্ছে। পুরো জাতিকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। খুব সূক্ষ্মভাবে করছে। এটা আর কিছুই না, জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে দাবাখেলায় হেরে যাবার শোধ তোলার চেষ্টা। এতদিন পর তারা একটা সুযোগ পেয়েছে। এই সুযোগ তারা হাতছাড়া করবে না।

জোহরের নামাজের পর মাওলানা ইরতাজউদ্দিন পাকিস্তানের সংহতি ও মঙ্গলের জন্য দীর্ঘ প্রার্থনা করলেন। হেডমাস্টার সাহেবের স্ত্রীর বিষয়ে দোয়া করার কথা ছিল। করতে ভুলে গেলেন। তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। তিনি আবারো নফল নামাজে বসলেন।

www.MurchOna.com

সেদিনই দুপুর একটায় রেডিওতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলেন। তারিখটা হলো পহেলা মার্চ ১৯৭১।

রেডিও পাকিস্তান ঢাকা থেকে তার ভাষণ প্রচার করা হলো। তিনি বললেন—

> যথাক্রমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বশীল দু'টি প্রধান দলের মধ্যকার অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বাধ্য হয়েছি ১৯৭১ সালের ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদের বৈঠক মুলতবি করতে। তবে আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, এ মুলতবি দুই/তিন সপ্তাহের বেশি অতিক্রান্ত হবে না এবং এই স্বল্প পরিসর সময়ে আমি আমাদের দেশের দুই অঞ্চলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে সৌহার্দ্য আনয়নে সব ধরনের প্রচেষ্টাই করব।

সন্ধ্যা পার হয়েছে। মাগরেবের নামাজ শেষ করে ইরতাজউদ্দিন রান্না বসিয়েছেন। আয়োজন সামান্য। ভাত, ডাল আর আলুভর্তা। বৈয়মে খাঁটি ঘি আছে। আলুভর্তার সঙ্গে দু'চামচ ঘি দিয়ে দিবেন। ক্ষুধা পেটে অমৃতের মতো লাগবে। নবিজী দু'টা খেজুর খেয়ে অনেক রাত পার করেছেন। সেই তুলনায় রাজ ভোগ।

আলুভর্তা করা গেল না। তিনটা আলু ছিল। তিনটাই পচা। তাছাড়া আলুভর্তার প্রধান উপকরণ কাঁচামরিচ বা শুকনামরিচ কোনোটাই নেই।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। সবসময় সর্ব পরিস্থিতিতে শুকুরগুজার করতে হবে। আল্লাহপাক শুকুরগুজারি বান্দা পছন্দ করেন।

হাঁড়িতে পানি ফুটছে— ইরতাজউদ্দিন ফুটন্ত পানিতে ডাল ছাড়বেন, তার ঠিক আগে আগে মধু এসে বলল, হেড স্যার ডাকে। রাতে তার সাথে আপনেরে খাইতে বলছেন।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, রান্না কী ?

মধু বলল, মৈরলা মাছের ঝোল, টাকি ভর্তা, মাষকলাই-এর ডাইল।

রেঁধেছে কে ? তুই ?

জে।

ইরতাজউদ্দিন আবারো বললেন, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। মধু হেডমাস্টার সাহেবের বাড়িতে থাকে। রান্নাবান্না করে। তার রান্নার হাত খুবই ভালো।

ম্যাছের কাটাকুটা, সামান্য লাউপাতা কুমড়াপাতা দিয়ে সে এমন জিনিস তৈরি করে যে মোহিত হয়ে খেতে হয়। তার রান্না মিষ্টি কুমড়ার ভর্তা যে খায় নি, সে জানেই না ভর্তার স্বাদ কী।

মধু!

জি স্যার।

দেশের অবস্থা তো ভালো না রে মধু। কী হয় কে জানে!

মধু দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, হউক গা। কপালের লিখন না হবে খণ্ডন।

মধুকে অতিরিক্ত আনন্দিত মনে হচ্ছে। কারণে অকারণে দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে। ইরতাজউদ্দিন ভুরু কুঁচকে বললেন, গাঁজা খেয়েছিস না-কি?

মধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, খাইতেও পারি, আবার নাও খাইতে পারি।

এই জিনিসটা না খেলে হয় না?

হয়। খাইলেও হয়, না খাইলেও হয়।

ইরতাজউদ্দিন ডাল পানিতে ভিজিয়ে ফেলেছেন। পানি থেকে তুলে কুলায় মেলে দিলেন। শুকিয়ে গেলে আবার ব্যবহার করা যাবে। কোনো কিছুই নষ্ট করা উচিত না। আল্লাহপাক অপচয়কারী পছন্দ করেন না।

স্যার গো, দিনের অবস্থা কিন্তু ভালো না। ঝড় তুফান হইতে পারে।

ইরতাজউদ্দিন সামান্য চিন্তিত বোধ করলেন। তিনি যে চালাঘরে বাস করেন তার অবস্থা শোচনীয়। প্রধান খুঁটির সব ক'টাতে উইপোকা ধরেছে। ঝড়ের বড় ঝাপ্টা এই ঘর নিতে পারবে না। ঘর নতুন করে বাঁধতে হবে। ঠিক করে রেখেছিলেন, বর্ষার আগে আগে ঘরের কাজটা ধরবেন। মনে হয় না এইবারও পারবেন। সব নির্ভর করছে আল্লাহপাকের ইচ্ছার উপর। উনি ইচ্ছা করলে হবে। উনি ইচ্ছা না করলে হবে না। তাঁর অনুমতি ছাড়া কিছুই হবে না। তাহলে মানুষের চেষ্টার মূল্যটা কী?

মধু খিকখিক করে হাসছে। ইরতাজউদ্দিন বললেন, কী হয়েছে?

মধু বলল, কিছু হয় নাই। একটা শিল্লুক মনে আসছে। বলব?

বল শুনি।

গাই এ ভাঙ্গে নল খাগরী, বাছুর ভাঙ্গে আইল
ছয় মাস হইল গাই বিয়াইছে বাছুর আইছে কাইল।

কন দেহি জিনিসটা কী?

জানি না।

খুবই সোজা। একটু চিন্তা নিলেই হবে।

চিন্তা নিতে পারছি না।

জিনিসটা হইল গিয়া কচ্ছপের আন্ডা।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, কচ্ছপের আন্ডা হলে তো ভালোই।

আরেকটা বলি ?

শিল্লুক শুনব নারে মধু। চল রওনা দেই।

মধু উসখুস করছে। শিল্লুক তার খুব পছন্দের একটা বিষয়। এই অঞ্চলে শিল্লুক-ভাঙ্গানি হিসাবে তার নাম-ডাক আছে। বিয়ে-শাদি হলেই তার ডাক পড়ে। বরযাত্রীদের কঠিন কঠিন শিল্লুক দিয়ে সে নাকানি-চুবানি খাওয়ায়।

দিনের অবস্থা আসলেই ভালো না। আকাশে ঘন মেঘ। মাঝে-মাঝে বিজলি চমকাচ্ছে। বিজলির চমকে দেখা যাচ্ছে পশ্চিম দিক থেকে মেঘ উড়ে উড়ে আসছে। পশ্চিমি মেঘ ভালো জিনিস না। ঝড়-ঝাপ্টা হবে।

ইরতাজউদ্দিন দ্রুত পা চালাচ্ছেন। বৃষ্টি নামার আগেই হেডমাস্টার সাহেবের বাড়ি পৌঁছানো দরকার। থানার সামনে দিয়ে গেলে সময় বেশি লাগবে। তবে রাস্তা ভালো। ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক। জেলেপাড়ার ভেতর দিয়ে গেলে অতি দ্রুত পৌঁছানো যাবে। সমস্যা একটাই— জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাস্তা। মাঝে-মধ্যে খুব সাপের উপদ্রব হয়। ইরতাজউদ্দিন সাপ ভয় পান।

বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। ঠাণ্ডা বাতাসও ছেড়েছে। শরীর জুড়িয়ে যাওয়া ঠাণ্ডা। চারদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক এই অন্ধকারেও চিকচিক করছে। ইরতাজউদ্দিনের মনে হচ্ছে তিনি সড়ক না, নদীর উপর দিয়ে হাঁটছেন। থানার সামনে দিয়ে যাবার সময় তাঁর মুখে পাঁচ ব্যাটারি টর্চের আলো পড়ল। মুখে টর্চের আলো ফেলা বিরাট অভদ্রতা। এই অভদ্রতাটা থানাওয়ালারা সবসময় করে। তাদের দোষও দেয়া যায় না। তাদের মানুষ চিনতে হবে। কে চোর কে সাধু জানতে হবে।

মাওলানা সাহেব, স্লামালিকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম।

আমাকে চিনেছেন ? আমি ওসি ছদরুল আমিন।

গলা শুনে চিনতে পারি নাই। পরিচয়ে চিনেছি।

মুখের উপর টর্চের আলো ফেলেছি, বেয়াদবি মাফ করে দিবেন। আপনি যান কই ?

হেডমাস্টার সাহেবের বাড়িতে যাচ্ছি। উনি খবর পাঠিয়েছেন।

উনাকে আমার সালাম দিবেন। বিশিষ্ট লোক।

অবশ্যই দিব।

দেশের খবর তো মাওলানা সাহেব শুনেছেন— ইয়াহিয়া অধিবেশন স্থগিত করেছে। এখন লাগবে ক্যাঁচাল। ঢাকায় পোস্টিং থাকলে অবস্থা কেরোসিন হয়ে যেত। পাবলিকের সঙ্গে কাটাকাটি মারামারি। পুলিশ দেখলেই পাবলিক ক্ষেপে যায়। ক্ষেপিস কেন রে বাবা ? পুলিশ কি তোরই বাপ-ভাই না ? তুই ভাত-মাছ খাস, পুলিশও খায়। তোর 'গু'-এ যেমন দুর্গন্ধ, পুলিশের 'গু'-তেও সেইরকম দুর্গন্ধ। আচ্ছা ঠিক আছে, মাওলানা সাহেব আপনি যান। আপনাকে দেরি করায়ে দিয়েছি। গায়ে একটা-দু'টা বৃষ্টির ফোঁটাও পড়তেছে। আসসালামু আলায়কুম।

ওয়ালাইকুম সালাম।

ইরতাজউদ্দিন হাঁটতে শুরু করলেন। থানার ওসি'কে রাস্তায় দেখে মধু একটু পিছিয়ে পড়েছিল, এখন সে এগিয়ে এলো। গলা নিচু করে বলল, স্যার, আমরার ওসি সাহেবের বেজায় সাহস এইটা জানেন ?

না।

আরে বাপরে— সাহস কী! তার সাহসের একটা গফ করব ?

দরকার নাই।

তাইলে একটা শিল্লুক ভাঙ্গানি দেন। কন দেখি স্যার— 'চামড়ার বন্দুক বাতাসের গুল্লি' এইটা কী ?

জানি না। কী ?

এইটা হইল গিয়া আপনের— 'পাদ'। পাদে যে শব্দ হয় সেই শব্দটা হইল গুল্লি। চামড়ার বন্দুক হইল— পুটকি।

ইরতাজউদ্দিন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এত বড় বেয়াদব— এ ধরনের অশ্লীল কথাবার্তা তাঁর সঙ্গে বলছে ? কানে ধরে একশবার উঠবোস করানো দরকার। যাতে ভবিষ্যতে কোনোদিন এই ধরনের কথাবার্তা না বলে।

বৃষ্টির ফোঁটা ঘন হয়ে পড়তে পড়তে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। মধু বলল, লক্ষণ ভালো না, বিষ্টির ফোঁটা পড়তে পড়তে বন হইলে বেজায় পরমাদ।

ইরতাজউদ্দিন কঠিন গলায় বললেন, চুপ করে থাক। আর একটা কথা বললে এমন চড় খাবি...

কথা বইল্যা দোষ কী করলাম!

অনেক দোষ করেছিস। আর কথা না।

হেডমাস্টার সাহেব বারান্দায় চৌকির উপর বসে আছেন। ঘরের ভেতর হারিকেন জ্বলছে। হারিকেনের আলোয় তাঁকে আবছা দেখা যাচ্ছে। বারান্দায় পেতে রাখা চৌকি হেডমাস্টার সাহেবের পছন্দের জায়গা। এখানে বসলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। সামনে বুড়ো ফসলের মাঠ। দক্ষিণ দিকে নদী। বর্ষা মৌসুমে সামনের মাঠের পুরোটাই ডুবে যায়। বাতাস এলে সমুদ্রের মতো ঢেউ ওঠে। ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হয়। বারান্দা থেকে এই শব্দ শোনা যায়। হেডমাস্টার সাহেবের বড় ভালো লাগে।

ইরতাজউদ্দিন বারান্দায় উঠতে উঠতে বললেন, আসসালামু আলায়কুম। খবর দিয়েছেন ?

হেডমাস্টার সাহেব বললেন, খানা খেতে ডেকেছি। দিনের পর দিন একা খেতে ভালো লাগে না। মন যখন অস্থির থাকে, তখন আরো ভালো লাগে না।

মধু বদনায় করে পানি নিয়ে এসেছে। জলচৌকিতে দাঁড়িয়ে ইরতাজুদ্দিন পা ধুলেন। উঠে এলেন চৌকিতে। হেডমাস্টার সাহেব বললেন, আপনার ভাবির কথা মন থেকে দূর করতে পারছি না। শেষে আমার বড় শ্যালককে একটা চিঠি লিখলাম। চিঠিটা আপনাকে পড়ে শোনাতে চাচ্ছি।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, পড়ুন শুনি।

হেডমাস্টার সাহেব তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ করে চিঠি মুখস্থ বলে যেতে থাকলেন। যে-কোনো চিঠি একবার লেখা হয়ে গেলে দাড়ি-কমাসহ তাঁর মনে থাকে। মানুষটার স্মৃতিশক্তি অস্বাভাবিক।

> জনাব আব্দুর রহমান।
>
> প্রিয় ভ্রাতা।
>
> পরসমাচার তোমার ভগ্নির বর্তমান অবস্থার কথা পাঠ করিয়া মুহ্যমান হইয়াছি। এ কী কঠিন পরীক্ষায় পতিত হইলাম ? এই পরীক্ষার শেষ কোথায় ? বেচারি নিজে কষ্ট পাইতেছে, অন্যদেরও কষ্ট দিতেছে। তাহার বিষয়ে কী ব্যবস্থা নেয়া যায় সে-সম্পর্কে আমার পক্ষে কিছু বলা অসম্ভব। এত দূরে বসিয়া প্রকৃত অবস্থা জানা আমার পক্ষে অসম্ভব। তোমরা যাহা ভালো মনে করো তাহাই করা বাঞ্ছনীয়।
>
> তোমার অতি আদরের ভগ্নির জন্যে তোমরা কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিবে না। এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

www.MurchOna.com

পাবনা মানসিক হাসপাতালে তাহাকে ভর্তি করাইবার
ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি নাই। আল্লাহপাকের কাছে
প্রার্থনা যেন হাসপাতালে তাহার সুচিকিৎসা হয়।

ইতি

চিঠি মুখস্থ বলা শেষ করে হেডমাস্টার সাহেব ইরতাজউদ্দিনের দিকে তাকালেন। ইরতাজউদ্দিন বললেন, পুনশ্চতে কিছু লিখেছেন?

না।

চিঠির বক্তব্যের সঙ্গে আপনি কি একমত?

অবশ্যই।

ইরতাজউদ্দিন ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আপনি একমত না। আপনার মনে সংশয় আছে। সংশয় আছে বলেই আপনি আমাকে চিঠিটা শুনিয়েছেন। আপনার মন চাচ্ছে যেন আমি বলি আপনি যা করেছেন ঠিকই করেছেন। আপনি আমার Support চাচ্ছেন।

হেডমাস্টার সাহেব কিছু বললেন না। এক দৃষ্টিতে ইরতাজউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ইরতাজউদ্দিন বললেন, আপনি একটা কাজ করেন। ভাবিকে আপনার কাছে নিয়ে আসেন। আপনার পাশে থাকলে ভাবি সাহেবার মনে একটা পরিবর্তন আসতে পারে। তারপরেও যদি কিছু না হয়, আমরা দু'জন উনাকে হাসপাতালে দিয়ে আসব। ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আসব।

আমাকে নিয়ে আসতে বলছেন?

জি।

তাহলে বরং এটাই করি?

হেডমাস্টার সাহেবকে দেখে মনে হলো— তার বুক থেকে পাষাণ ভার নেমে গেছে। তিনি সহজে নিঃশ্বাস নিতে পারছেন।

ইরতাজউদ্দিন বললেন, ক্ষুধা হয়েছে। খানা দিতে বলেন। আকাশের অবস্থা ভালো না। সকাল সকাল বাড়ি ফিরব। পশ্চিম আকাশ কেমন লাল হয়ে আছে। ঝড়-তুফানের লক্ষণ।

মধু এসে বিড়বিড় করে বলল, খানা দেওন যাইব না। দিরং হইব।

হেডমাস্টার সাহেব বললেন, দেরি হবে কেন? রান্না তো আগেই করা।

মধু সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে উদাস চোখে মাথা চুলকাতে লাগল। জানা গেল, কুকুর খাবারে মুখ দিয়েছে বলেই নতুন করে রান্না বসাতে হবে। সেটাই এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না। চাল বাড়ন্ত। চাল কিনে আনতে হবে।

হেডমাস্টার সাহেব অবাক হয়ে বললেন, বলিস কী ?

মধু বলল, হারামি কুত্তা একটা আছে, বড় ত্যক্ত করতাছে। বিষ খাওয়াইয়া এরে মারণ ছাড়া গতি নাই।

হেডমাস্টার সাহেব বললেন, আমার শরীরটা ভালো না। আমি আগেই ঠিক করেছিলাম রাতে কিছু খাব না। এক গ্লাস তোকমার শরবত খেয়ে শুয়ে পড়ব। মাওলানা সাহেবের খাবার ব্যবস্থা করা দরকার। উনি ক্ষুধার্ত। ঘরে চিড়া মুড়ি আছে না ?

ইরতাজউদ্দিন বললেন, আমার ভাতের ক্ষিধা হয়েছে। এই ক্ষিধা চিড়া মুড়ি খেলে যাবে না। আমি ঘরে গিয়ে ভাত চড়াব।

হেডমাস্টার সাহেব বললেন, মধুকে সঙ্গে নিয়ে যান, রেঁধে দিয়ে আসবে। ও নিজেও চারটা খাবে।

ইরতাজউদ্দিন মধুকে নিয়ে পথে নামলেন। ডিসট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় উঠার পর পর প্রচণ্ড শব্দে কয়েকবার বিদ্যুৎ চমকাল।

জঙ্গলের দিক থেকে শোঁ শোঁ শব্দ আসছে। মধু ভীত গলায় বলল— ঝড় আসতাছে গো। আইজ খবর আছে।

দেখতে দেখতে ঝড় এসে গেল। ঝড়ের প্রথম ধাক্কায় মধু ছিটকে রাস্তা থেকে খালে পড়ে গেল।

ইরতাজউদ্দিনকে দৌড়ে এসে আশ্রয় নিতে হলো থানায়। ঝড়ের তাণ্ডব চলল অনেক রাত পর্যন্ত। রাতে তাঁকে খেতে হলো ওসি সাহেবের বাসায়। ওসি সাহেবের স্ত্রী লম্বা ঘোমটা টেনে অতি যত্নে ইরতাজউদ্দিনকে খাওয়ালেন। মহিলা সন্তান-সম্ভবা। শরীর ঢেকে ঢুকে রাখার চেষ্টায় ব্যস্ত।

ওসি সাহেব থানায় নেই। ঝড় আসছে দেখে তিনি তিনজন কনস্টেবল নিয়ে বের হয়ে পড়েছেন। তার উদ্দেশ্য ডাকাত হাসান মাঝিকে ধরা। ঝড়-বৃষ্টির রাতে সে নিশ্চয়ই তার তৃতীয়পক্ষের স্ত্রীর কাছে রাত কাটাতে আসবে। হাসান মাঝির তৃতীয়পক্ষের স্ত্রীর নাম রঙিলা। সে আগে গৌরীপুরের নটিবাড়িতে নটির কাজ (দেহব্যবসা) করত। হাসান মাঝি তাকে বিয়ে করে মিন্দাপুর গ্রামে ঘর তুলে দিয়েছে। মিন্দাপুর নীলগঞ্জ থেকে দুই-আড়াই মাইল দূরে। সে যে মাঝে-মাঝে এখানে রাত কাটায়, সে-খবর ওসি সাহেব জানেন। তার ভাগ্য ভালো হলে দেখা যাবে ব্যাটা আজই এসেছে।

রান্নার আয়োজন ভালো। গরুর মাংস, পাবদা মাছের ঝোল, করলা ভাজি, বেগুন ভর্তা।

www.MurchOna.com

ইরতাজউদ্দিন বললেন, মাগো, বড়ই তৃপ্তি করে খেয়েছি। আল্লাহপাক কার রুজি কোথায় রাখেন বলা মুশকিল। খাওয়া শেষ করে তিনি হাত তুলে মোনাজাত করলেন, হে আল্লাহপাক, হে গাফুরুর রহিম, যে খানা আজ আমি এত তৃপ্তি করে খেয়েছি তার জন্যে তোমার দরবারে শুকরিয়া। যে বিপুল আয়োজন করে আমাকে খাইয়েছে, তার ঘরে যেন এরচেয়েও দশগুণ ভালো খানা সবসময় থাকে— তোমার পাক দরবারে এই আমার প্রার্থনা। আমিন।

দোয়া শেষ করে ইরতাজউদ্দিন তাকিয়ে দেখেন, ওসি সাহেবের স্ত্রী চোখের পানি মুছছে। ইরতাজউদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন, কাঁদছেন কেন গো মা ?

মহিলা শাড়ির আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, আপনি এত সুন্দর করে দোয়া পড়লেন! শুনে চোখে পানি এসে গেছে।

ঝড় থামার পর ইরতাজউদ্দিন বাড়ি ফিরলেন। বাড়ির সামনে এসে তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। বাড়ির কোনো চিহ্নই নেই। ঝড় উড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে। তিনি কিছুই বললেন না। মধু শুধু বলল, স্যার, আফনেরে তো শুয়াইয়া দিছে।

ইরতাজউদ্দিন জবাব দিলেন না। মধু বলল, মন খারাপ কইরেন না। একটা শিল্লুক দেই, ভাঙেন—

যায় না চোখেতে দেখা কর্ণে শোনা যায়
উড়াল দিয়া আসে হে উড়াল দিয়া যায়।

স্যার পারছেন ? খুব সোজা।

ইরতাজউদ্দিন জবাব দিলেন না। মধু আনন্দিত গলায় বলল, এইটা হইল ঝড়। ঝড় উড়াল দিয়া আসে উড়াল দিয়া যায়। এরে চউক্ষে দেখা যায় না।

www.MurchOna.com

কলিমউল্লাহ নামটা কোনো আধুনিক কবির জন্যে তেমন মানানসই না। কবিতা মানেই তো শব্দের খেলা। কলিমউল্লাহ নামের মধ্যে কোনো খেলা নেই। এই নাম উচ্চারণের সময় মুখ বড় হয়ে যায়। জিব দেখা যায়। কিন্তু কলিমউল্লাহ একজন কবি। এই মুহূর্তে সে *দৈনিক পাকিস্তান* অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার বয়স পঁচিশ। সে জগন্নাথ কলেজে বি.কম পড়ে। বি.কম পরীক্ষা সে আগে দু'বার দিয়েছে। পাশ করতে পারে নি। তৃতীয়বারের জন্যে জোরেসোরে পরিশ্রম করে যাচ্ছে। কলিমউল্লাহ্‌র বাবা দ্বিতীয়বার পরীক্ষা ফেলের কথা শুনে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছেন। তাতে তার তেমন অসুবিধা হচ্ছে না। সে দু'টা টিউশনি করে। কাটাবনের কাছে একটা হোটেলের সঙ্গে মাসকাবারি ব্যবস্থা করা আছে, সেখানে খায়। রাতে ঘুমাতে যায় ইকবাল হলে। গ্রাম-সম্পর্কের এক বড় ভাই, ইতিহাসের থার্ড ইয়ার অনার্সের ছাত্র রকিব আলি ইকবাল হলে থাকেন। তার ঘরের মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়ে থাকা। হলে এই বিষয়টা চালু আছে। রকিব ভাইয়ের বিছানাটা আলাদা রেখে মেঝেতে যে ক'জন ইচ্ছা শুয়ে থাকতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া বড় ভাইরা আশ্রয়হীন ছোট ভাইদের না দেখলে কে দেখবে? রুমের দরজা সবসময় খোলা থাকে। রাত একটা দেড়টায় হলে এসে উপস্থিত হলেও তেমন কোনো অসুবিধা হয় না।

অসুবিধা একটাই— নিরিবিলি কবিতা লেখাটা হয় না। এই কাজটা তাকে করতে হয় টিউশনির সময়। ছাত্রকে এক ঘণ্টা পড়াবার জায়গায় দু'ঘণ্টা পড়ালে সবাই খুশি হয়। বাড়তি সময়টা সে কাজে লাগায়। ছাত্রকে রচনা লিখতে দিয়ে সে কবিতা লেখে। কলিমউল্লাহ্‌ ঠিক করে রেখেছে কবিতা, লিখে খ্যাতিমান হলে সে একটা কবিতার বই বের করবে। বইটার নাম দিবে 'টিউশন কাব্য'। যে বইটির প্রতিটি কবিতা ছাত্রকে পড়াতে গিয়ে লেখা। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিটি কবিতার শেষে রচনার তারিখ ও স্থান দেয়া থাকবে। যেমন 'মেঘবালিকাদের দুপুর' কবিতার নিচে লেখা থাকবে— মন্টুদের ঝিকাতলার বাসা। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১।

কবিতার বইটা বের হবে ছদ্মনামে। অনেকগুলি ছদ্মনাম নিয়ে সে চিন্তা করছে। কোনোটিই তেমন মনে ধরছে না। একটা নাম মোটামুটি পছন্দ হয়েছে, সেটা হলো শাহ্ কলিম। এই ছদ্মনামটা মূলের কাছাকাছি। নামের আগে শাহ্ যুক্ত করায় মরমী আধ্যাত্মবাদী কবি ভাব চলে আসে। তারপরেও এই নাম আধুনিক না। গ্রাম্য কবিয়ালটাইপ নাম। যারা মুখে মুখে গান রচনা করে এবং একটা পর্যায়ে গানে নিজের নাম ঢুকিয়ে দেয়। যেমন—

শাহ্ কলিমে কয়
রোজ-হাসরের দিনে তোমার পরাজয় ॥
পিতা নয় মাতা নয়
ব্রাদার ভগ্নি কেহই নয়
হৃদয়ে জাগিবে ভয়,
জানিবা নিশ্চয়।
রোজ-হাসরের দিনে তোমার পরাজয়।

'শাহ্ কলিম'-এর পাশাপাশি আরেকটা নাম তার পছন্দের তালিকায় আছে— 'ধূর্জটি দাশ'। কঠিন নাম, তবে বেশ আধুনিক। শাহ্ কলিম নামটা মনে এলে একটা বোকা-সোকা বাবরি চুলের লোকের চেহারা মনে আসে। ধূর্জটি দাশ-এ মনে হয় গম্ভীর চোখে চশমা পরা বুদ্ধিমান একজন মানুষ। নামটা হিন্দু, এটা একটা সমস্যা। সে যদি কোনো একদিন খুব বিখ্যাত হয়ে যায়, তাহলে সমালোচকরা তাকে ধরবে। আপনি কেন হিন্দু ছদ্মনাম গ্রহণ করেছেন ? এটা কি হীনমন্যতার কারণে ? মুসলমান নাম কবির নাম হিসেবে চলে না এই বোধ থেকে ? এ দেশের অনেক কবিই তো ছদ্মনাম গ্রহণ করেছেন। এমনকি আমাদের প্রধান কবি শামসুর রাহমানও এক সময় ছদ্মনামে লিখতেন। হিন্দু ছদ্মনাম লেখার কথা তো তাঁর মনে হয় নি। আপনার মনে হলো কেন ?

রোদ মাথার উপর চিড়বিড় করছে। কলিমউল্লাহ্ মনস্থির করতে পারছে না *দৈনিক পাকিস্তান* অফিসে ঢুকবে কি ঢুকবে না। তার ইচ্ছা কবি শামসুর রাহমানের হাতে একটা কবিতা দিয়ে আসা। ডাকে কবিতা পাঠিয়ে লাভ নেই। পত্রিকা অফিসের লোকজন খাম খুলে কিছু পড়ে না। এত সময় তাদের নেই। টেবিলের পাশে রাখা ঝুড়িতে সরাসরি ফেলে দেয়।

কবি শামসুর রাহমানের সঙ্গে সে কীভাবে কথা বলবে তা নিয়ে অনেক ভেবেছে। মনে মনে রিহার্সেলও দিয়েছে। যদিও সে জানে কোনো রিহার্সেলই কাজে লাগবে না। কবি কোন প্রসঙ্গে কথা বলবেন তা তো জানা নেই। ঘরে ঢোকা মাত্র কবি হয়তো বলবেন, এখন যান। পরে আসবেন। এখন ব্যস্ত আছি।

তবে কবি যদি টুকটাক কথা বলেন এবং যদি বলেন, তুমি কি আমার কোনো কবিতা পড়েছ ?— তাহলে কেল্লা ফতে। কলিমুল্লাহ কবির একটা কবিতা— 'আসাদের শার্ট' ঝাড়া মুখস্থ করে এসেছে। গড়গড় করে বলে কবিকে মুগ্ধ করা যাবে। কবি-সাহিত্যিকরা অল্পতেই মুগ্ধ হয়।

তিনবার 'ইয়া মুকাদ্দিমু' পড়ে ডান পা আগে ফেলে কলিমউল্লাহ *দৈনিক পাকিস্তান* অফিসে ঢুকে গেল। 'ইয়া মুকাদ্দিমু'র অর্থ 'হে অগ্রসরকারী'। আল্লাহর পবিত্র নিরানব্বই নামের এক নাম। এই নাম তিনবার পড়ে ডান পা ফেলে যে-কোনো কাজে অগ্রসর হওয়ার অর্থ সাফল্য। বি.কম পরীক্ষা দেবার জন্যে হলে ঢোকার আগে আগে এই নাম সে পড়তে পারে নাই। কিছুতেই নামটা মনে পড়ে না। মনে পড়লে অবশ্যই ঘটনা ভিন্ন হতো।

কবি শামসুর রাহমান বিশাল এক সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে বসে আছেন। তাঁর ডান পাশে জমিদারদের নায়েব টাইপ চেহারার ফর্সা এবং লম্বা এক লোক, ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছে। মাথা দোলাচ্ছে, হাত নাড়ছে। কবি তার দিকে তাকিয়ে আছেন কিন্তু সব কথা মনে হয় শুনছেন না। কবিরা ভ্যাড়ভ্যাড়ানি শুনতে ভালোবাসে না।

কলিমউল্লাহর মনে হলো, কবি সাহেব তাকে দেখে খুশি হয়েছেন। অন্তত কিছু সময়ের জন্যে হলেও নায়েব সাহেবের ভ্যাড়ভ্যাড়ানি শুনতে হবে না।

শামসুর রাহমান টেবিলে হাত রেখে গালে হাত দিয়ে সুকান্ত-টাইপ ভঙ্গিতে বসেছেন। তিনি কলিমুল্লাহর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার কাছে কী ?

কলিমউল্লাহ বলল, স্যার, আমি একটা কবিতা নিয়ে এসেছি। কবিতাটা আমি ডাকে পাঠাতে পারতাম কিন্তু আমার অনেক দিনের শখ কবিতাটা আমি আপনার হাতে দেই।

কবি কিছু বলার আগেই পাশে বসা নায়েবটা বলল, টেবিলে রেখে চলে যান।

কলিমউল্লাহ নায়েবের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, ঐ গাধা, তুই কথা বলছিস কেন ? আমি তো তোর সঙ্গে কথা বলছি না। তোর ভ্যাড়ভ্যাড়ানি শোনার আমার কোনো প্রয়োজন নাই। মনে মনে এই কথা বললেও সে মুখে বলল, আমি কবিতাটা কবির হাতে দিব এই জন্যে এসেছি। টেবিলে রেখে দেবার জন্যে আসি নি।

নায়েব বলল, জিনিস একই। কবি টেবিল থেকে কবিতাটা হাতে নেবেন।

কলিমউল্লাহ বলল, জিনিস এক না। আমরা যদি কাউকে ফুল দিতে চাই আমরা তার হাতে দেই। টেবিলের এক কোনায় রেখে দেই না। আমি যে

কবিতাটা লিখেছি সেটা হয়তো খুবই তুচ্ছ, তবে আমার কাছে তা ফুলের মতোই। আমি কবির হাতেই সেই ফুল দিতে চাই।

কলিমউল্লাহ্ নিজের কথা বলার ক্ষমতায় নিজেই মুগ্ধ হলো। অবশ্যি এই অংশটি সে আগেই রিহার্সেল দিয়ে ঠিক করে রেখেছে। জায়গামতো লাগানো গেছে এতেই সে খুশি।

শামসুর রাহমান হাত বাড়িয়ে কবিতা নিতে নিতে বললেন, আপনি কী করেন ? ছাত্র ?

জি ছাত্র। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় এমএসসি করছি (এই মিথ্যা কথাটা যে সে বলবে তাও আগেই ঠিক করা। বিজ্ঞানের জটিল বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে কবিতা লেখার মধ্যে অন্য ব্যাপার আছে। কবি নিশ্চয়ই ঢাকা ইউনির্ভাসিটিতে গিয়ে খোঁজ নেবেন না।)

আপনার নাম কী ?

স্যার আমার নাম শাহ্ কলিম।

ছদ্মনাম ?

জি-না, আসল নাম। আমরা শাহ্ বংশ।

ও আচ্ছা।

কলিমউল্লাহ্ ফাঁক খুজছে 'আসাদের শার্ট' কবিতাটা মুখস্থ শুনিয়ে দেয়ার জন্যে। ফাঁক পাওয়া যাচ্ছে না। সে তো নিজ থেকে হড়বড় করে কবিতা আবৃত্তি শুরু করতে পারে না। নায়েব চেহারার লোকটাই সুযোগ তৈরি করে দিল। সে কলিমউল্লাহ্‌র দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে বলল, কবিতা যে লিখছেন ছন্দ জানেন ? চাক্কা ছাড়া যেমন গাড়ি হয় না, ছন্দ ছাড়া কবিতা হয় না। কবিতাকে চলতে হয়। চাক্কাবিহীন গাড়ি হলো গদ্য। চাক্কাওয়ালা চলমান গাড়ি হলো কবিতা। বুঝেছেন ?

কলিমউল্লাহ্ মুখে বলল (অতি বিনয়ের সঙ্গে), স্যার, বোঝার চেষ্টা করছি। মনে মনে বলল, চুপ থাক ছাগলা। তোকে উপদেশ দিতে হবে না।

নায়েব বলল, (তার উপদেশ দেয়া শেষ হয় নি) কবিতা লেখা শুরুর আগে প্রচুর কবিতা পড়তে হবে। অন্য কবিরা কী লিখছেন, তারা শব্দ নিয়ে, ছন্দ নিয়ে কী experiment করছেন তা জানতে হবে। আপনি যে কবি শামসুর রাহমানের কাছে এসেছেন, তাঁর কোনো কবিতা কি আপনি পড়েছেন ?

কলিমউল্লাহ্ মনে মনে বলল, এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করার জন্যে তোর অতীতের সব অপরাধ এবং ভবিষ্যতের দু'টা অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম। মনে মনে কথা বলা শেষ হওয়া মাত্র সে গড়গড় করে কবির 'আসাদের শার্ট'

www.MurchOna.com

কবিতাটা মুখস্থ বলে যেতে লাগল। তার উচ্চারণ ভালো, সে আবৃত্তিও ভালো করছে। কবিকে দেখে মনে হচ্ছে না তিনি অভিভূত হয়েছেন। মনে হয় তার আগে আরো অনেকেই এসে কবিকে কবিতা মুখস্থ করে শুনিয়েছে। তাঁর জন্যে এটা নতুন কিছু না।

গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের
জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট
উড়ছে হাওয়ায়, নীলিমায়।
বোন ভাই-এর অম্লান শার্টে দিয়েছে লাগিয়ে
নক্ষত্রের মতো কিছু বোতাম কখনো
হৃদয়ের সোনালি তন্তুর সূক্ষ্মতায়;
বর্ষিয়সী জননী সে শার্ট উঠোনের রৌদ্রে দিয়েছেন মেলে
ডালিম গাছের মৃদু ছায়া আর রোদ্দুর শোভিত
মায়ের উঠোন ছেড়ে এখন সে শার্ট
শহরের প্রধান সড়কে
কারখানার চিমনি চূড়োয়
গমগমে এভিন্যুর আনাচে-কানাচে
উড়ছে, উড়ছে অবিরাম।

কবি পুরো কবিতা শেষ করতে দিলেন না, তার আগেই বললেন, আপনি বসুন। চা খাবেন ?

কলিমউল্লাহ্ বলল, স্যার, চা খাব না। তবে আপনি বসতে বলেছেন, আমি কিছুক্ষণ বসব। আপনার সামনে কিছুক্ষণ বসে থাকা আমার জন্যে পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

কলিমউল্লাহ্ বসল। তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নায়েব ব্যাটা কবির দিকে ফিরে হাত-মাথা নেড়ে গল্প শুরু করল, যেন এই ঘরে তারা দু'জনই আছে আর কেউ নেই।

তারপর শুনুন কবি, কী ঘটনা— আমি নেতার সঙ্গে বরিশাল থেকে স্টিমারে করে ফিরছি। সারাদিন খুব পরিশ্রম গিয়েছে। এখানে মিটিং ওখানে মিটিং। ভেবেছিলাম রাতে স্টিমারে ভালো ঘুম হবে। সেটা হলো না। চাঁদপুরের কাছাকাছি এসে ঘুম ভেঙে গেল। স্টিমারের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছি, দূরে দেখা যাচ্ছে চাঁদপুর শহর। শহরের বাতি পানিতে পড়েছে। এদিকে আবার ভোর হচ্ছে। ভোরের আলো। মায়াবী একটা পরিবেশ।

কলিমউল্লাহ্ মনে মনে বলল, চুপ থাক ব্যাটা। মায়াবী পরিবেশ! তুই তো মায়াবী বানানই জানস্ না।

আমি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ চমকে উঠলাম। কে যেন আমার কাঁধে হাত রেখেছেন। তাকিয়ে দেখি নেতা, তাঁর হাতে পাইপ। নেতা আমার নাম ধরে বললেন, কী দেখিস, বাংলার শোভা ?

কলিমউল্লাহ্ মনে মনে বলল, নেতা তোর কাঁধে হাত রেখে কথা বলেছে ? তুই কি নেতার ইয়ারবন্ধু ? বাকোয়াজ বন্ধ করবি ?

আমি নেতাকে বললাম, আপনি এত ভোরে উঠেন তা জানতাম না। নেতা বললেন, বাংলার শোভা আমাকে বাদ দিয়ে তোরা দেখে ফেলবি তা তো হতে দেব না। আয় আমার ঘরে আয়। চা খেয়ে যা। আমি নেতার কেবিনে গেলাম। উনি নিজেই চা বানিয়ে আমার হাতে দিলেন।

কলিমউল্লাহ্ মনে মনে বলল, শুধু চা বানিয়ে তোর হাতে দিলেন ? তোর গা হাত পা ম্যাসেজ করে দেন নাই ?

নেতার সঙ্গে তখন আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হলো। আমি নেতাকে বললাম, আপনি কিছু একটা করেন। মাওলানা ভাসানীকে সামলান। তাঁর সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলুন। নেতা বললেন, মাওলানাকে নিয়ে তোদের চিন্তা করতে হবে না। আমি মাওলানাকে চিনি। মাওলানা আমাকে চেনে।

কলিমউল্লাহ্ মনে মনে বলল, তুই তো দেখি আমার চেয়েও বড় মিথ্যাবাদী! তুই হয়ে গেলি শেখ মুজিবের উপদেষ্টা ?

কলিমউল্লাহ্ উঠে পড়ল। এই বকবকানি আর শোনা যায় না। সে ঘর থেকে বের হবার আগে কবি এবং নায়েব সাহেব দু'জনকেই পা ছুঁয়ে সালাম করল। কবি খুবই বিব্রত হলেন, তবে নায়েব সাহেব এমন ভাব করলেন যেন প্রতিদিন পঞ্চাশজনের মতো তরুণ উঠতি কবি তাকে কদমবুসি করে।

পরের সপ্তাহে শাহ্ কলিমের কবিতা 'মেঘবালিকাদের দুপুর' দৈনিক পাকিস্তানের সাহিত্যপাতায় প্রকাশিত হয়। তার পরের সপ্তাহে দৈনিক পূর্বদেশে প্রকাশিত হয় একটি কাব্য নাটিকা। এর দুটি চরিত্র। একটির নাম পরাধীনতা। সে অন্ধ তরুণী। আরেকটা চরিত্রের নাম স্বাধীনতা। সে অসম্ভব রূপবান একজন যুবা পুরুষ।

শাহ্ কলিম এর পরপরই বাবরি চুল রেখে ফেলল। দাড়ি কাটা বন্ধ করে দিল। আপাতত তার প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ, তাকে যথাসময়ে আবার আনা হবে।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

আজ বুধবার।

মোবারক হোসেনের ছুটির দিন। ছুটির দিনেও তিনি কিছু সময় অফিস করেন। সকাল দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত শেখ সাহেবের বাড়িতে থাকেন। সেখান থেকে সরাসরি চলে যান আমিনবাজার। সপ্তাহের বাজার আমিনবাজার থেকে করে চলে আসেন মৌলবীবাজার। সেখানে কুদ্দুস নামের একজন কসাই তাকে গরুর মাংস দেয়। বাজারের সেরা মাংস। তিনি বাসায় ফিরেন দুপুর বারোটার মধ্যে। তখন ইয়াহিয়াকে গোসল দেয়া হয়। গোসলের আগে তার গায়ে খাঁটি সরিষার তেল মাখানো হয়। তেল মাখানোর সময় সে খুব হাত-পা ছুড়ে হাসে। আবার যখন তাকে গামলার পানিতে নামানো হয়, তখন সে হাত-পা ছুড়ে কাঁদে। শিশুপুত্রের হাসি এবং কান্না দুটাই তিনি দেখতে ভালোবাসেন।

মোবারক হোসেন সপ্তাহে একদিন দুপুরে ঘুমান। ঘুম ভাঙার পর মোহাম্মদপুর যাবার ব্যাপারে প্রস্তুতি নিতে থাকেন। প্রস্তুতি মানে মানসিক প্রস্তুতি। মোহাম্মদপুরের শের শাহ্ সুরী রোডে যেতে হবে মনে হলেই তিনি এক ধরনের অস্বস্তি অনুভব করেন। বুধবার দুপুরের ঘুমও তাঁর ভালো হয় না। ঘুমের মধ্যে বিকট এবং অর্থহীন স্বপ্ন দেখেন। একবার স্বপ্নে দেখলেন, কর্নেল শাহরুখ খানের কোলে তিনি বসে আছেন। স্বপ্নের মধ্যে ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। যেন কর্নেল সাহেবের কোলে বসে থাকাটাই যুক্তিযুক্ত এবং শোভন। আরেকবার স্বপ্নে দেখলেন— তিনি, কর্নেল সাহেব এবং জোহর সাহেব খেতে বসেছেন। টেবিলে আস্ত খাসির একটা রোস্ট সাজানো। সবাই সেই রোস্ট থেকে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে খাসিটা জীবিত। যখনই তার গা থেকে মাংস ছেঁড়া হচ্ছে তখনই সে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে এবং বিড়বিড় করে বলছে— আস্তে, আস্তে।

এরকম কুৎসিত এবং অর্থহীন স্বপ্ন দেখার কোনো মানে হয় না। জোহর সাহেব তার সঙ্গে খুবই সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলেন। মাঝে-মাঝে

www.MurchOna.com

হাসি তামাশাও করেন। সন্ধ্যাবেলা চায়ের সঙ্গে কাবাব খেতে দেন। মাঝে-মাঝে থাকে গরুর পায়া। গরম গরম রুমালি রুটি দিয়ে পায়া খেতে অতি সুস্বাদু।

জোহর সাহেব বেশিরভাগ কথাবার্তাই বলেন খাবারদাবার নিয়ে। তিনি কোথায় কখন কোন ভালো খাবারটা খেয়েছেন সেই গল্প। মিঠা কাবাব নামের একটা কাবাবের কথা তার কাছে প্রায়ই শোনা যায়। গাজরের রসে মাংস জ্বাল দেয়া হয়। তারপর সেই মাংস টুকরা টুকরা করে আগুনে ঝলসে খাওয়া। জোহর সাহেবের ধারণা, বেহেশতেও এই খানা পাওয়া যাবে কি-না সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে।

খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে রাজনীতি নিয়েও কথা হয়। রাজনৈতিক আলাপের সময় এই মানুষটা কোনোরকম সংশয় ছাড়া কথা বলেন। তখন তার চোখ বন্ধ থাকে। তাকে দেখে মনে হয়, তিনি যা বলছেন তা যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন।

বুঝলেন ইন্সপেক্টর সাহেব, একটা দেশ স্বাধীন হবে কি হবে না তা সেই দেশের মানুষ কিংবা সেই দেশের কোনো বিপ্লবী নেতার উপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির খেলার উপর। ভারত চাচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হোক, এতে তার সুবিধা। তার চিরশত্রু পাকিস্তানের একটা শিক্ষা হয়। পাকিস্তানের কোমর ভেঙে যায়। আরেক দিকে আছে চীন। ভারতের আরেক শত্রু। কাজেই পাকিস্তানের বন্ধু। বিরাট এক শক্তি। ১৯৬০ সনে ভারতের উপর এমন চড়াও হয়েছিল যে ভারতের বুকের রক্ত জমে পানি হয়ে গিয়েছিল। চীন কিছুতেই চাইবে না পাকিস্তান ভেঙে যাক। যেহেতু চীন চাচ্ছে না, আমেরিকাও চাইবে না। ভারতের পাশে থাকবে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এইসব হিসাব-নিকাশে যে পাল্লা ভারী হবে সেই পাল্লাই... বুঝতে পারছেন?

জি পারছি।

শেখ মুজিব যদি বোকামি করেন, কোনোরকম প্রস্তুতি ছাড়াই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দেন, তাহলে কী হবে দেখা যাক। সাতদিনের মাথায় মিলিটারি বিদ্রোহ দমন করবে। ভারত যদি যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে, তাহলে পনেরো দিনের মাথায় সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। অনেক বড় বড় বিপ্লবী নেতাকে তখন দেখা যাবে— 'পাক সার যামিন শাদ বাদ' গান করছেন। মানুষ সবসময় শক্তের পূজারী। দুর্বলকে মানুষ কখনো পছন্দ করে না। কেন বলুন তো?

জানি না।

www.MurchOna.com

কারণ বেশিরভাগ মানুষই দুর্বল। সে তার নিজের দুর্বলতা জানে। এই দুর্বলতা সে ঘৃণা করে। কাজেই অন্যের দুর্বলতাকেও সে ঘৃণা করে। Mankind abhors timidity because he is timid. এখন ইন্সপেক্টর সাহেব বলুন দেখি, শেখ মুজিব কি ভুল করবেন? স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন? ঢাল-তলোয়ার ছাড়া নিধিরাম সর্দার হতে চাইবেন।

জি করবেন। এটা ছাড়া তাঁর অন্য কোনো বিকল্প নাই। মানুষ তাঁকে নেতা বানিয়েছে, মানুষের ইচ্ছাকে তাঁর দাম দিতে হবে।

স্বাধীনতার ঘোষণা যদি সত্যি সত্যি দেয়া হয়, তাহলে কী পরিমাণ মানুষ এই দেশে মারা যাবে সেই সম্পর্কে তাঁর কি কোনো ধারণা আছে? শুধুমাত্র ঢাকা শহরের রাস্তাতেই এক হাঁটু রক্ত হবার কথা। বাদ দেন এসব, যা হবার হবে। এখন বলেন আছেন কেমন?

জি ভালো।

ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী সবাই ভালো?

জি।

এদের ঢাকায় রেখে লাভ নাই। এদের কোনো নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দেন।

নিরাপদ জায়গা কোনটা?

সেটাই একটা কথা, নিরাপদ জায়গাটা কী? এই বিষয়ে একটা শের আছে। পুরোপুরি মনে নাই, ভুলে গেছি। ভাবার্থ হলো—

আমাকে একটা নিরাপদ জায়গার সন্ধান
হে পারোয়ার দেগার তুমি দাও
যে নিরাপদ স্থানে প্রেম আমাকে স্পর্শ করবে না।

দুপুর বারোটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত মোবারক হোসেন পুত্রের হাসি এবং কান্না দেখলেন। তিনি বড়ই মজা পেলেন। এই সময়টাতে তার একবারও শের শাহ্ সুরী রোডের কথা মনে পড়ল না। আজই যে সেখানে যেতে হবে এবং আজই কর্নেল সাহেব উপস্থিত থাকবেন— এটাও মনে থাকল না। অথচ তিনি খবর দিয়ে রেখেছেন। মুক্তাগাছার মণ্ডা নিয়ে আসরের নামাজের আগেই একজনের আসার কথা। কর্নেল সাহেবকে মণ্ডা খাওয়াতে হবে।

বুধবারে তাঁকে বাসায় পাওয়া যায়— এই খবরটা হয়তো প্রচার হয়ে গেছে। অনেকেই এই দিনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে। বেশিরভাগই আসে দুপুরে

খাওয়ার সময়। আজ এসেছেন মুসলেম উদ্দিন সরকার। মোবারক হোসেনের ছোট মামা। তিনি টুকটাক ব্যবসা করেন। কোনো ব্যবসাই গোছাতে পারেন না। টাকা-পয়সার টানাটানি হলেই ভাগ্নের কাছে টাকা ধার করতে আসেন। মোবারক হোসেন প্রতিবারই বিরক্ত হন, তবে প্রতিবারই কিছু না কিছু সাহায্য করেন।

দুপুরে মোবারক হোসেন একা খেতে পছন্দ করেন। খাবার সময় কেউ সামনে থাকবে না। সবগুলি পদ হাতের কাছে সাজানো থাকবে, তিনি নিজের মতো ধীরে-সুস্থে খাওয়াদাওয়া সারবেন। তাঁর হাত ধোয়ার শব্দ শুনে একজন কেউ পিরিচে দু'টা জর্দা দেয়া পান নিয়ে আসবে।

আজ তাঁকে বাধ্য হয়ে ছোট মামাকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসতে হলো। ছোটমামা মুসলেম উদ্দিন সরকার ভাগ্নের দিকে তাকিয়ে আনন্দিত গলায় বললেন, তুই এমন বিরক্ত মুখ করে আমার দিকে তাকাচ্ছিস কী জন্যে? আজ টাকা ধার করতে আসি নাই। গণ্ডগোলের বাজারে আমার ব্যবসা ভালো যাচ্ছে। ভালো পয়সা কামাচ্ছি।

এখন আপনার কিসের ব্যবসা?

লবণের ব্যবসা আর মোমবাতির ব্যবসা। কেরোসিনের ব্যবসাতেও নামব। কেরোসিনের ব্যবসাতেও রমরমা ভাব। শুধু আল্লা আল্লা করতেছি। গণ্ডগোল আরো কিছুদিন চলুক। দুই মাস চললেই আল্লাহর কাছে হাজার শুকুর। তুই রাজি থাকলে কেরোসিনের ব্যবসায় তোকে পার্টনার নিতে পারি। ফিফটি ফিফটি শেয়ার। করবি পার্টনারশিপ ব্যবসা?

না।

আচ্ছা থাক, যে জন্যে এসেছি সেটা শোন। তোর বড় মেয়ের বিয়ে দিবি? মেয়ে ইন্টারমিডিয়েট দিবে— এখন বিয়ে দেয়া যায়। হাতে ভালো ছেলে আছে।

মোবারক হোসেন কথা বলছেন না। শুনে যাচ্ছেন। খাওয়ার সময় কথা বলতে তাঁর মোটেই ভালো লাগে না।

ছেলে অত্যন্ত ভালো। এই ছেলে হাতছাড়া করলে আল্লাহ নারাজ হবেন। সুযোগ তো তাঁরই করে দেয়া।

মোবারক হোসেন বললেন, ছেলে কী করে?

ছেলে কিছু করে না, তবে ভবিষ্যতে বড় কিছু করবে ইনশাল্লাহ।

মোবারক হোসেন বিরক্ত চোখে তাকালেন। কী সুন্দর বিয়ের প্রস্তাব— ছেলে কিছু করে না, তবে ভবিষ্যতে বড় কিছু করবে!

www.MurchOna.com

মুসলেম উদ্দিন সরকার আগ্রহ নিয়ে বললেন, ছেলের বাবা-মা নাই। মা জন্মের সময় মারা গেছেন। বাবা মারা গেছেন— ছেলের বয়স যখন এগারো। ছেলে নিজের চেষ্টায়, বন্ধুবান্ধবদের চেষ্টায় লেখাপড়া করেছে।

মোবারক হোসেন কিছু বললেন না। কথা বলার কোনো মানে হয় না। পাত্র কিছু করে না, এতিম— এরপর আর কথা কী ?

তুই ছেলেটাকে একদিন দেখ।

প্রয়োজন দেখি না।

ছেলেটাকে দেখলে, তার সঙ্গে কথা বললে তোর ভালো লাগবে। ছেলে অত্যন্ত রূপবান।

মোবারক হোসেন বললেন, অত্যন্ত রূপবানকে আমার দেখতেও ভালো লাগে না, কথা বলতেও ভালো লাগে না।

আমি তাকে আজ সন্ধ্যায় তোদের বাসায় আসতে বলেছি।

কেন ?

তোদের সঙ্গে চা খাবে।

মোবারক হোসেন অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, মামা শুনুন, এটা তো আপনার কেরোসিনের ব্যবসা না যে আপনি হঠাৎ কোনো এক ডিলারের কাছ থেকে একশ' টিন কেরোসিন কিনে ফেললেন। আপনি কী মনে করে কারো সঙ্গে আলোচনা না করে ছেলেকে রাতে চা খেতে বলেছেন ?

মুসলেম উদ্দিন সরকার বললেন, কারো সঙ্গে আলোচনা করি নাই— এটা তো ঠিক না। তোর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করেছি। বৌমা খুব আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়েছে।

মোবারক হোসেন ঠাণ্ডা গলায় বললেন, আপনি অবশ্যই ছেলেকে না করে আসবেন।

মুসলেম উদ্দিন বললেন, তুই শান্ত হ। এত রাগ করার কিছু নাই। আমি বিকালের মধ্যেই নিজে গিয়ে না করে আসব। ভালো একটা ছেলে হাতছাড়া হয়ে গেল— এটাই একটা আফসোস। বড়শিতে মাছ মারার সময় মাঝে মাঝে খুব বড় মাছ বড়শি গিলে তারপর সুতা ছিঁড়ে চলে যায়। তখন বর্শেলের আফসোসের সীমা থাকে না। আমার সে-রকম আফসোস হচ্ছে। এই মাছটা ছিল বিরাট কালবোস। কালবোস চিনিস ?

মোবারক হোসেন জবাব দিলেন না। তার খাওয়া শেষ হয়েছে। তিনি হাত-মুখ ধুয়ে পান মুখে দিচ্ছেন।

কালবোস হলো রুই এবং কাতলের শংকর। বাবা হলো রুই মাছ, মা হলো কাতল মাছ। অতি স্বাদু মাছ। একটাই সমস্যা— এরা বংশবিস্তার করতে পারে না। এই জন্যেই কালবোসের সংখ্যা এত কম। হঠাৎ হঠাৎ পাওয়া যায়।

মামা, আমি কিছুক্ষণ রেস্ট নেব। ফ্যান ছেড়ে শুয়ে থাকব।

আমিও চলে যাব। দেখি ছেলেকে পাই কি-না। সে থাকে পুরান ঢাকায়। গলির ভিতর গলি, তার ভিতরে গলি। বাড়ি খুঁজে পাওয়াই সমস্যা। এক কামরার একটা ঘর ভাড়া করে থাকে। ঘরে ঢুকলে মনে হয়, টিনের ট্রাংকের ভিতর ঢুকে পড়েছি।

মোবারক হোসেন শোবার ঘরের দিকে রওনা হলেন।

মুসলেম উদ্দিন বললেন, ছেলের সম্পর্কে আসল কথাটাই তো তোকে বলা হয় নি। গল্প-উপন্যাসে এক ধরনের ছেলের কথা থাকে যারা জীবনে কোনো পরীক্ষায় সেকেন্ড হয় না। সে-রকম ছেলে। ফিজিক্স অনার্সে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট, এমএসসি-তে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট, ইন্টারমিডিয়েটে ফার্স্ট। শুধু ম্যাট্রিকে সেকেন্ড হয়েছিল। ছেলের কোনো দাবি-দাওয়া নাই, শুধু তাকে ক্যাশ এগারো হাজার টাকা দিতে হবে। তার কিছু ঋণ আছে, সে ঋণ শোধ করবে। ভবিষ্যতে এই ছেলে কী করবে চিন্তা কর। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার হয়ে ঢুকবে। কমনওয়েলথ স্কলারশিপ পেয়ে স্ত্রী নিয়ে চলে যাবে পিএইচডি করতে। ছেলেকে চা খেতে আসতে বলব?

মোবারক হোসেন চুপ করে আছেন।

মুসলেম উদ্দিন বললেন, বলব চা খেতে আসার জন্য? আসুক না। এসে চা খেয়ে যাক। কত লোকই তো তোর এখানে এসে চা-নাস্তা খেয়ে যায়। তাতে অসুবিধা কী?

সন্ধ্যার সময় আমি থাকব না।

তাহলে একটু রাত করে আসতে বলি। আমাদের সঙ্গে রাতের খানা খাক। বলব? বেচারা দিনের পর দিন হোটেলে খায়, একবার বাড়ির খাওয়া খেয়ে দেখুক খাওয়া কাকে বলে।

মোবারক হোসেন 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বললেন না। ঘুমোতে চলে গেলেন। ঘুমে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। এটা খারাপ লক্ষণ। যখন প্রচণ্ড ঘুম পায় তখন বিছানায় যাওয়া মাত্র ঘুম কেটে যায়।

কর্নেল সাহেবকে আজ আরো সুন্দর লাগছে। তিনি পরেছেন ফুলতোলা হাফ হাওয়াই সার্ট। সাদা রঙের উপর হালকা সবুজ ফুল। মাথায় লাল রঙের কাপড়ের ক্যাপ। চোখ যথারীতি কালো চশমায় ঢাকা। কর্নেল সাহেবকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি একজন টুরিস্ট। সমুদ্রতীরের কোনো এক শহরে বেড়াতে এসেছেন। স্ত্রীকে হোটেলে রেখে জরুরি একটা মিটিং সারতে এসেছেন। মিটিং শেষ করেই স্ত্রীর কাছে যাবেন। তারা হাত ধরাধরি করে সমুদ্রের কাছে বেড়াতে যাবে। মিটিং-এ মন বসছে না বলেই তিনি বারবার আঙুল দিয়ে টেবিলে ঠকঠক করছেন।

ইন্সপেক্টর, তোমার এই মাটির হাঁড়িতে কী আছে ?

মুক্তাগাছার মণ্ডা। আপনার জন্য আনিয়েছি।

তোমার দেশের যে জিনিসটা তোমার সবচে' প্রিয় সেটা ?

ইয়েস স্যার।

থ্যাংকয়্যু। এখন বলো, কেমন আছ ?

স্যার, ভালো আছি।

আমি খবর নিয়েছি, তুমি খুব ভালোভাবে তোমার ডিউটি পালন করছ। আমি তোমার উপর খুশি। You are a good Pakistani officer.

থ্যাংকয়্যু স্যার।

তোমার সঙ্গে যে পিস্তলটা আছে, সেটা আমি রেখে দেব।

মোবারক হোসেন চিন্তিত গলায় বললেন, স্যার, আমাকে অফিসে হিসাব দিতে হবে। আপনার কাছে পিস্তল দিয়ে দিলে আমি বিপদে পড়ব।

তোমাকে বিপদে ফেলতে চাই না। তুমি বরং আগামীকাল তোমার অফিসে পিস্তল জমা দিয়ে দিবে।

জি আচ্ছা, স্যার।

তোমাদের এই পিস্তলগুলি পুরনো। ট্রিগার টিপলে দেখা গেল গুলি হলো না। আমি তোমাকে ভালো একটা পিস্তল দিব।

মোবারক হোসেনের পেটে কেমন যেন শব্দ হচ্ছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। পায়ের নিচটা অবশ হয়ে যাচ্ছে এরকম অনুভূতি। মনে হচ্ছে তিনি চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে আছেন। ধীরে ধীরে তার শরীর ডেবে যাচ্ছে। আশেপাশে কেউ নেই যে তাকে টেনে তুলবে। জোহর সাহেব অবশ্যি আছেন। তিনি আগের মতো মাথা নিচু করে সিগারেট টেনে যাচ্ছেন। ক'টা সিগারেট খাওয়া হয়েছে সেই হিসাব রাখা হয় নি। কর্নেল সাহেব হঠাৎ যদি জিজ্ঞেস করেন, তিনি জবাব দিতে পারবেন না। কর্নেল সাহেব নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত হবেন।

ইন্সপেক্টর।

ইয়েস স্যার।

তুমি হঠাৎ খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছ। কী জন্যে ?

স্যার, আমি চিন্তিত না।

অবশ্যই তুমি চিন্তিত। তোমার কপাল ঘামছে। তুমি মনে মনে কী ধারণা করছ সেটা বলব ? তোমার ধারণা আমি নতুন পিস্তল দিয়ে তোমাকে নির্দেশ দিব— যাও, শেখ মুজিবকে খুব কাছ থেকে গুলি করো। তোমার প্রতি এটাই হাই কমান্ডের নির্দেশ। তাই ভাবছ না ?

মোবারক হোসেন তাকালেন জোহর সাহেবের দিকে। তার ঠোঁটে চাপা হাসি। এই ভদ্রলোক ক'টা সিগারেট খেয়েছেন ? কর্নেল সাহেব যদি সিগারেটের সংখ্যা জিজ্ঞেস করেন, তাহলে বিপদে পড়ে যেতে হবে। হে আল্লাহপাক, কর্নেল সাহেব আজ যেন সিগারেটের সংখ্যা না জিজ্ঞেস করেন।

ইন্সপেক্টর।

ইয়েস স্যার।

আমরা এ ধরনের কোনো পরিকল্পনা করলেও করতে পারি। আততায়ীর হাতে শেখ মুজিবের মৃত্যু। দলপতি শেষ মানেই দল শেষ। তবে এ ধরনের পরিকল্পনা করা হলে তার দায়িত্ব আমরা তোমাকে দিব না। তুমি বাঙালি। কোনো বাঙালিকে আমরা বিশ্বাস করি না। তোমার হাতের টিপ কেমন তাও জানি না। ভালো হবার কথা না। আমাদের দরকার সার্প শুটার। বুঝতে পারছ ?

জি স্যার।

কর্নেল সাহেব মাথা ঝাঁকালেন। পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট বের করে ঠোঁটে দিলেন। সিগারেট ধরালেন না। তবে তিনি সিগারেটে টান দিচ্ছেন এবং ধোঁয়া ছাড়ার ভঙ্গি করছেন। এটা যেন এক ধরনের খেলা।

ইন্সপেক্টর।

ইয়েস স্যার।

একটা শক্তিশালী বাঘ চুপচাপ বসে আছে। তোমরা বাঘটাকে খোঁচাচ্ছ। কাঠি দিয়ে খোঁচাচ্ছ, গায়ে পানি ঢেলে দিচ্ছ। বাঘটার কানের কাছে ক্রমাগত চিৎকার করছ— 'জয় বাংলা, জয় বাংলা'। এই বাঘ তো অবশ্যই ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যাও। জোহর, তুমি তাকে পিস্তল আর ছয় রাউন্ড গুলি দিয়ে দাও। মিষ্টির জন্যে ধন্যবাদ।

মোবারক হোসেন রাতে বাসায় ফিরলেন জ্বর নিয়ে। জ্বর এবং তীব্র মাথার যন্ত্রণা। মুসলেম উদ্দিন ছেলেটিকে নিয়ে এসেছেন। তার নাম নাইমুল। দেখে মনে হচ্ছে ছায়ার কচুগাছ। প্রাণহীন বিবর্ণ। লম্বাতেও বেশি। স্কুলে এই ছেলেকে নিশ্চয়ই তালগাছ ডাকা হতো। মরিয়ম বেঁটে। এই তালগাছের সঙ্গে মরিয়মকে একেবারেই মানাবে না। ছেলের চোখে-মুখে উদ্ধত ভঙ্গি আছে। চোখে চোখ পড়ার পরেও চোখ নামিয়ে নিচ্ছে না। তাকিয়ে থাকছে।

মোবারক হোসেন তাদের সঙ্গে খেতে বসলেন, কিন্তু কিছু খেতে পারলেন না। তার জ্বর বেড়েছে। পেটে মোচড় দিচ্ছে। তিনি খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লেন।

মুসলেম উদ্দিন যখন তার ভাগ্নেকে জিজ্ঞেস করলেন, কি-রে ছেলেটাকে পছন্দ হয়েছে ? তখন মোবারক হোসেন বললেন, ছেলে পছন্দ হয় নি। কিন্তু বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন। ছেলের আত্মীয়স্বজনকে খবর দিন। ওদের সঙ্গে কথা বলেন। তবে আমাকে এইসবের মধ্যে জড়াবেন না। বিয়ের তারিখ ঠিক করে জানাবেন। আমি খরচ দিব। ছেলে ক্যাশ টাকা যেন কত চায় ?

এগারো হাজার।

মোবারক হোসেন বললেন, এগারো হাজার টাকা দিয়ে দিব। কোনো সমস্যা নাই।

www.MurchOna.com

কবিতা একবার পড়লে অনেকক্ষণ মাথায় থাকে। কবিতার শব্দগুলি না থাকলেও ছন্দটা থাকে। ট্রেন চলে যাবার পরেও যেমন ট্রেনের ঝিক ঝিক শব্দ মাথায় বাজতে থাকে সে-রকম। এ ধরনের একটা ব্যাপার শাহেদের হয় তার বড় ভাইয়ের চিঠি পাওয়ার পর। চিঠিটা অনেকক্ষণ মাথায় থাকে।

ইরতাজউদ্দিন চিঠি লেখেন রুলটানা কাগজে। সাদা কাগজে তাঁর লাইন ঠিক থাকে না বলে তিনি সাদা কাগজে লিখতে পারেন না। অক্ষরগুলি বড় বড় এবং স্পষ্ট। অক্ষর যেমন স্পষ্ট চিঠির বক্তব্যও স্পষ্ট। এই মানুষটার ভেতর কোনো অস্পষ্টতা নেই।

শাহেদ তার বড় ভাইয়ের চিঠি গতকাল দুপুরে একবার পড়েছে। রাতে ঘুমুতে যাবার সময় একবার পড়েছে। এখন আরেক দুপুর। শাহেদ ঠিক করেছে, আজ সারাদিনের জন্যেই সে বের হয়ে যাবে। ফিরবে সন্ধ্যার পর। এর মধ্যে একটা ফাঁক বের করে বড় ভাইজানকে লেখা চিঠিটা পোস্ট করে দেবে।

বড় ভাইজান লিখেছেন—

> প্রিয় শাহেদ, আসমানী ও রুনি, (তিনজনের নামে এক চিঠি। এই অদ্ভুত মানুষ শাহেদের বিয়ের পর কখনো শাহেদকে আলাদা চিঠি লিখেন নি। রুনির জন্মের পর সব চিঠিতেই তারা দুইজন ছাড়াও রুনির নাম আছে।)
>
> তোমাদের জন্যে অতীব দুশ্চিন্তায় আছি। সুদূর পল্লীগ্রামে আছি। শহরের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছি না। লোকমুখে নানান খবরাদি পাই। কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা তা আলাদা করিতে পারি না। দুশ্চিন্তায় কালক্ষেপণ করি। প্রতি রাতেই আলাদা করিয়া তোমাদের তিনজনের জন্যে আল্লাহপাকের নিকট দোয়া করি। তাহাতেও মন শান্ত হয় না। মন যে শান্ত হয় না তাহার প্রমাণ প্রায় প্রতি রাতেই

তোমাদের নিয়া আজেবাজে স্বপ্ন দেখি। একটি স্বপ্নে দেখিলাম তুমি মা রুনিকে কোলে নিয়া দৌড়াইতেছ। তোমার পাশে রুনির স্নেহময়ী মা আসমানী। তোমাদের পিছনে ভীষণ-দর্শন একজন বলশালী পুরুষ বল্লম হাতে তোমাদের তাড়া করিতেছে। যে-কোনো মুহূর্তে সে বল্লম নিক্ষেপ করিবে এমন অবস্থা।

যদিও জানি স্বপ্ন মানবমনের দুশ্চিন্তার ফসল ছাড়া আর কিছুই না। তারপরেও চিন্তায় অস্থির হইয়াছি। এমন নজির আছে যে মহান আল্লাহপাক স্বপ্নের মাধ্যমে আমাদের সাবধান করিতেছেন।

ঘটনা যাহাই হউক, পত্রপ্রাপ্তির তিনদিনের মাথায় তুমি অতি অবশ্যই সবাইকে নিয়া চলিয়া আসিবা। ইহা তোমার প্রতি আমার আদেশ।

আল্লাহপাক তোমাদের সর্ব বিপদ হইতে মুক্ত রাখুন। আমিন।

ইতি
ইরতাজউদ্দিন

বড় ভাইয়ের কাছে লেখা শাহেদের চিঠি খুবই সংক্ষিপ্ত। সে শুধু লিখেছে—

ভাইজান, আমরা আসছি। এক সপ্তাহের মধ্যেই আসছি।

আসমানী বলল, এই, কোথায় যাচ্ছ?

শাহেদ জবাব দিল না। এরকম ভাব করল যেন সে আসমানীর কথা শুনতে পায় নি। আসমানী আবারো বলল, ভরদুপুরে তুমি যাচ্ছ কোথায়?

শাহেদ এবারো জবাব দিল না। গত দুদিন ধরে সে আসমানীর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। শাহেদ নিঃশব্দে ঝগড়া করার চেষ্টা করছে। সমস্যা হচ্ছে, সে কথা না বলে দীর্ঘ সময় থাকতে পারে না। আসমানী পারে। একনাগাড়ে আঠারো দিন কথা না-বলার রেকর্ড আসমানীর আছে। গিনিজ বুক অফ রেকর্ড স্বামী-স্ত্রীর কথা বলা না-বলা জাতীয় বাঙালি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। মাথা ঘামালে স্বামী-স্ত্রীর একনাগাড়ে দীর্ঘ সময় কথা না-বলার রেকর্ড ধরে রাখার ব্যবস্থা করত। এবং শাহেদের ধারণা সেখানে অবশ্যই আসমানী নাম থাকত।

কথা না-বলে দিনের পর দিন পাশাপাশি বাস করা আসমানীর কাছে কিছুই না। কথা বলতে না পারলেই সে যেন ভালো থাকে। সমস্যা হয় শুধু শাহেদের। আসমানীর সঙ্গে কথা বলতে না পারলে তার পেট ফুলতে থাকে। সাত-আট ঘণ্টা পার হওয়ার পর দমবন্ধ দমবন্ধ ভাব হয়, তারপর এক সময় খুব অসহায় লাগতে থাকে। মনে হয় তার ভয়ঙ্কর কোনো অসুখ করেছে। নিঃশ্বাসের কষ্ট হওয়ার অসুখ।

আটচল্লিশ ঘণ্টা হলো শাহেদ কথা না বলে আছে। দমবন্ধ স্টেজ পার করে সে এখন আছে অসহায় স্টেজে। তারপরেও ঠিক করেছে, আসমানী ক্ষমা প্রার্থনা না করা পর্যন্ত সে কথা শুরু করবে না। আসমানীর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, সে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত। চক্ষুলজ্জার জন্য পারছে না। আসমানী এখন নিজ থেকে আগ বাড়িয়ে অনেক অপ্রয়োজনীয় কথা বলছে। আশেপাশে ঘুরঘুর করছে।

দুদিন আগের ঝগড়ার দায়দায়িত্ব বেশিরভাগই আসমানীর। শাহেদ রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে বলেছে, আসমানী, তুমি এক কাজ করো। নীলগঞ্জে ভাইজানের কাছে চলে যাও।

আসমানী বলল, কেন ?

ঢাকার অবস্থা ভালো না। লক্ষণ খুব খারাপ। কখন কী হয়! কী দরকার রিস্ক নিয়ে ?

তুমি ঢাকায় থাকবে ?

হ্যাঁ।

তুমি ঢাকায় থাকবে আর আমি চলে যাব ? ঢাকার অবস্থা আমার জন্য খারাপ আর তোমার জন্য রসগোল্লা ?

এরকম করে কথা বলছ কেন ?

কী রকম করে কথা বলছি ?

খুবই অশালীন ভঙ্গিতে কথা বলছ। যে মেয়ে ইংরেজিতে মাস্টার্স করেছে, তার কথাবার্তা কি আরো শালীন হবে না ?

অশালীন কথা কোনটা বললাম ? রসগোল্লা শব্দটা অশালীন ? তাহলে শালীন শব্দ কোনটা ? পান্তুয়া ? নাকি রসমালাই ?

প্লিজ, চুপ করো।

না, আমি চুপ করব না। তুমি আমাকে ব্যাখ্যা করবে কেন ঢাকা আমার জন্যে খারাপ আর তোমার জন্যে পান্তুয়া।

শাহেদ বিরক্ত হয়ে বলেছে, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি থাকো। তোমাকে কোথাও যেতে হবে না।

আসমানী গম্ভীর গলায় বলেছে, ঠিক করে বলো তো, কোনো কারণে কি আমাকে তোমার অসহ্য বোধ হচ্ছে ? কথায় কথায় নীলগঞ্জ চলে যাও। যেন আমি নীলগঞ্জ চলে গেলে তুমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচ। আমি একা নীলগঞ্জ গিয়ে কী করব ? তোমার মাওলানা ভাইয়ের সঙ্গে হাদিস-কোরান নিয়ে গল্প করব ?

বললাম তো যেতে হবে না।

আর আমাকে যদি যেতেই হয় আমি নীলগঞ্জ যাব কেন ? আমার কি যাওয়ার জায়গার অভাব আছে ?

সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি বাড়াবাড়ি করছ আসমানী।

শুধু আমি সামান্য ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করি ? তুমি করো না ? তুমি কি সবসময় অসামান্য ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করো ? ঐ দিন চায়ে চিনি বেশি হয়েছিল বলে তুমি কি কাপসুদ্ধ চা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দাও নি ?

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হতে পারত। শেষ হলো না। আসমানী বালিশ নিয়ে উঠে গেল। শাহেদ বলল, কোথায় যাচ্ছ ?

আসমানী বলল, তা দিয়ে তোমার দরকার কী ? তুমি তোমার ঘুম ঘুমাও। আমি পাশে নেই, কাজেই রাতে ভালো ঘুম হওয়ার কথা। কে জানে হয়তো সুন্দর সুন্দর স্বপ্নও দেখবে।

আসমানী ঘুমুতে গেল বসার ঘরের সোফায়। শাহেদ এই সোফার নাম দিয়েছে 'রাগ-সোফা'। স্বামী-স্ত্রীর ভেতর ঝগড়া হলে একজন কেউ সেই সোফায় গিয়ে শোয়। সেই একজনটা বেশিরভাগ সময়ই আসমানী।

আসমানী সোফায় ঘুমুতে গেছে। শাহেদ আছে বিছানায়। রুনি তার সঙ্গে। আসমানী রাগারাগি যাই করুক রুনিকে সঙ্গে নিয়ে মশার কামড় খাওয়ায় না। শাহেদ মশারির ভেতর বসে আছে। তার কাছে মনে হচ্ছে, এমন কিছু ঘটে নি যে রাতে আলাদা ঘুমুতে হবে। ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি তো বটেই। আসমানী বেশ কিছুদিন থেকে বাড়াবাড়ি করছে। দেশের অনিশ্চিত অবস্থা মনের উপর চাপ ফেলে, সবাই কিছুটা হলেও অস্বাভাবিক আচরণ করে। সেই যুক্তিতে আসমানীকে ক্ষমা করা যায়। পরক্ষণেই মনে হলো, প্রতিবার আগ বাড়িয়ে এত ক্ষমার দরকার কী ? সে হবে ক্ষমার সাগর আর আসমানী হবে চৌবাচ্চা। কেন ? দেখি না কথা না-বলে কত দিন থাকা যায়।

শাহেদ প্যান্ট পরতে পরতে ভাবল, কথা বলা শুরু করা যাক। এমনিতেও নিজের কোমর সরু হয়ে গেছে কিংবা প্যান্টের কোমর কোনো এক অস্বাভাবিক কারণে বড় হয়ে গেছে। বেল্ট ছাড়া পরা যাবে না। বেল্ট খুঁজে বের করা যাবে না। আসমানীকে বললে সে নিমেষে বের করে দেবে। জিনিস খুঁজে বের করার অলৌকিক ক্ষমতা আসমানীর আছে।

শাহেদ বলল, (আসমানীর দিকে না তাকিয়ে) বেল্টটা কোথায় দেখ তো।

আসমানী বলল, দেখছি, তুমি যাচ্ছ কোথায় বলো।

কাজ আছে, কাজে যাচ্ছি।

কোনো কাজে যাওয়া-যাওয়ি নেই। রুনিকে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে। চার দিন ধরে জ্বর চলছে। তুমি তো কপালে হাত দিয়ে মেয়ের জ্বরটা পর্যন্ত দেখ নি।

সন্ধ্যাবেলা নিয়ে যাব।

সন্ধ্যাবেলা না, এখনি নিয়ে যাবে।

এখন ডাক্তার পাব কোথায়?

তাহলে অপেক্ষা করো, যখন ডাক্তার পাবে তখন নিয়ে যাবে। এর আগে বেরুতে পারবে না।

আসমানী, তোমার কি মনে হয় না তুমি বাড়াবাড়ি করছ?

বাড়াবাড়ি করলে করছি, তুমি বেরুতে পারবে না। আমি তোমাকে যেতে দেব না।

শাহেদ শান্তমুখে জুতার ফিতা লাগাচ্ছে। জুতার ফিতা লাগানোর সহজ কাজটা সে কখনো ঠিকমতো করতে পারে না। কীভাবে কীভাবে প্যাঁচ লেগে আন্ধা গিট্টু হয়ে যায়। এবারো বোধহয় হয়ে গেল।

আসমানী শীতল গলায় বলল, তুমি তাহলে বেরুচ্ছ?

হুঁ।

বেশ, যাও, বাসায় ফিরে এসে কিন্তু আমাকে দেখবে না।

তুমি যাবে কোথায়?

যেখানে ইচ্ছা যাব, তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

বেল্ট খুঁজে দিতে বলছি, খুঁজে দাও।

বেল্টটা খুঁজে বের করতে পারব না। তুমি খুঁজে নাও। তুমি অন্ধ না, তোমার চোখ আছে।

www.MurchOna.com

শাহেদ ঘর থেকে বের হলো মন খারাপ করে। আসমানী অবুঝের মতো আচরণ করছে। এরকম সে কখনো ছিল না। তার হয়েছেটা কী? না-কি সমস্যা তার? সে এমন কিছু করছে যে আসমানী রেগে যাচ্ছে? দু'জনের কেউ কাউকে বুঝতে পারছে না।

বাসায় ফিরতে ফিরতে শাহেদের সন্ধ্যা হয়ে যাবে এবং সে নিশ্চিত বাসায় ফিরে দেখবে দরজায় তালা ঝুলছে। আসমানী রুনিকে নিয়ে চলে গেছে। তখন আবার বের হতে হবে তাদের খোঁজে। ঢাকায় মা-বাবা ছাড়াও আসমানীর বেশ কিছু আত্মীয়স্বজন আছে। সে এমন একজনের বাড়িতে উঠবে যার ঠিকানা শাহেদ জানে না। দেশের পরিস্থিতি ভয়াবহ। যে-কোনো সময় শহরে মিলিটারি নেমে যাবে। অতি যে মূর্খ সেও এই সত্যটা খুব ভালো করেই জানে। জানে না শুধু আসমানী। সে ফট করে রিকশা নিয়ে বের হয়ে পড়বে। এই সময়ে আর যাই করা যাক ছেলেমানুষি করা যায় না। আসমানী বেছে বেছে ছেলেমানুষি করার জন্য এই সময়টাই বেছে নিয়েছে। আশ্চর্য এক মেয়ে!

রাস্তায় পা দিয়েই শাহেদের মন ভালো হয়ে গেল। ব্যাপারটা সে আগেও লক্ষ করেছে— ইদানীং উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটতে তার ভালো লাগে। এর কারণ কী হতে পারে? নগরী কোনো বিশেষ ঘটনার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। সেই প্রস্তুতি কাছ থেকে দেখার আনন্দ? নগরীর উত্তেজনার সাক্ষী হবার আনন্দ? নগরীর মানুষরা অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে, সেই কাছাকাছি আসার আনন্দ?

বড় বড় উৎসবের আগে আগে এই ঘটনাগুলি ঘটে। কোরবানির ঈদে গরু কিনে পথে হাঁটার সময় অপরিচিতজনরা আনন্দের সঙ্গে কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, কত দিয়ে কিনলেন? দাম শোনার পর খুশি খুশি গলায় বলে, ভাই আপনি জিতেছেন। গরু মাশাল্লাহ্ ভালো হয়েছে।

ঠিক এইরকম ব্যাপার এখন ঘটছে। যে দোকানে চাল-ডাল কিনতে যাচ্ছে তাকে নিতান্ত অপরিচিত মানুষ অন্যদের সঙ্গে উপদেশ দিচ্ছে— কেরোসিন বেশি করে কিনে রাখেন। কেরোসিনের শর্টেজ হবে। কেরোসিন, দেয়াশলাই আর মোমবাতি।

চায়ের দোকানে চা খেতে গেলে পাশ থেকে কেউ একজন অবধারিতভাবে জিজ্ঞেস করবে, ভাইসাহেব, দেশের অবস্থা কী বুঝেন? দেশ কি স্বাধীন হবে— আপনার কী ধারণা? দেশ স্বাধীন হবে কি হবে না এই নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে দীর্ঘ আলোচনা চলে। আশপাশের লোকজনও তাতে অংশ নেয়। এক সময় আলোচনা ঐকমত্যে শেষ হয়। দেশ যে স্বাধীন হবে— এই বিষয়ে সবাই একশ' ভাগ নিশ্চিত হয়। এই উপলক্ষে আরেক দফা চা খাওয়া হয়।

www.MurchOna.com

নগরী স্বাধীনতার জন্যে অপেক্ষা করছে। এই অপেক্ষা খুব কাছ থেকে দেখা এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা। শাহেদ মনের আনন্দে দুপুর একটা পর্যন্ত পথে পথে ঘুরল।

রোদ উঠেছে কড়া। ঘামে শরীর ভিজে গেছে। বাসায় গিয়ে সাবান ডলে গোসলটা আরামদায়ক হবে কিন্তু শাহেদের বাসায় যেতে ইচ্ছা করছে না। আসমানীর কাছে রাগ দেখাতে ইচ্ছা করছে। সে যদি রাত বারোটা পর্যন্ত বাইরে থাকে তাহলে রাগ দেখানোটা জমবে।

শাহেদ রিকশা নিয়ে নিল। সে যাবে আগামসি লেনে। সেখানে দুটা রুম ভাড়া করে তার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু নাইমুল থাকে। তার সঙ্গে অনেক দিন যোগাযোগ নেই। নাইমুলের সমস্যা হলো, সে নিজ থেকে কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করবে না। অন্যদের তার কাছে যেতে হবে।

প্রচণ্ড বেগে মধ্যবয়স্ক রিকশাওয়ালা ঝড়ের মতো রিকশা টানছে। শাহেদ বলল, কোনো তাড়াহুড়ো নাইরে ভাই, রিকশা আস্তে চালাও। রিকশার গতি তাতে কমল না। রিকশাওয়ালা দাঁত বের করে বলল, টাইট দিয়া বসেন, উড়াল দিয়া নিয়া যাব।

শাহেদ বলল, উড়াল দেয়ার দরকার নাই। এক্সিডেন্ট করবে। জানে মরব। এখন মরে গেলে স্বাধীন দেশ দেখে যেতে পারব না।

স্বাধীন তাইলে আইতেছে কী কন স্যার?

আসছে তো বটেই।

আইজ শেখ সাব স্বাধীন ডিক্লার দিব।

কে বলেছে?

এইটা সবেই জানে।

রিকশাওয়ালা রিকশার গতি কমাল। সম্ভবত স্বাধীনতা নিয়ে যাত্রীর সঙ্গে কথা বলতে তার ভালো লাগছে।

স্বাধীন হইলে আমরার মতো গরিবের দুঃখ-কষ্ট কিছু থাকব না, কী কন স্যার?

থাকার তো কথা না।

খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড় সব দিব ইসটেট। ঠিক না স্যার? সবই ফিরি।

শাহেদ চুপ করে রাইল। স্বাধীনতার এই চিত্রটা নিয়ে আলোচনায় না যাওয়াই ভালো।

www.MurchOna.com

শেখ সাব একটা বাঘের বাচ্চা। কী কন স্যার ?

অবশ্যই বাঘের বাচ্চা।

খাঁটি মায়ের খাঁটি দুধ খাইয়া বড় হইছে। কী কন স্যার ?

অবশ্যই।

জীবনে একটা শখ ছিল শেখ সাবরে একদিন আমার রিকশায় তুলব। বিষ্যুদবার হাইকোর্টের মাজারে গিয়া দোয়াও করছি। জানি না দোয়া কবুল হইব কি না।

শাহেদ বলল, সৎ দোয়া সৎ ইচ্ছা সব সময় কবুল হয়।

আগামসি লেনে নেমে শাহেদ ভাড়া দিতে গেল। রিকশাওয়ালা ভাড়া নিবে না। শাহেদ বলল, ভাড়া নিবে না কেন ? রিকশাওয়ালা বলল, স্বাধীন হইলে তো সবই ফিরি হইব। ধরেন দেশ স্বাধীন হইছে।

শাহেদ রিকশাওয়ালার দিকে তাকিয়ে আছে। এর চেহারা মনে রাখা দরকার। দেশ যদি সত্যি সত্যি স্বাধীন হয়, তখন একে খুঁজে বের করতে হবে।

ভোঁতা পাথরের মতো মুখ। মাথার চুল খাবলা-খাবলাভাবে উঠে গেছে। কোনো একজন বিখ্যাত লোকের চেহারার সঙ্গে রিকশাওয়ালার চেহারার মিল আছে। সেই লোকটাকে মনে পড়ছে না। রিকশাওয়ালা হাসিমুখে বলল, এমন নজর কইরা কী দেখেন ?

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শাহেদের বিখ্যাত লোকের নামটা মনে পড়ল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন।

নাইমুলের ঘরের দরজা বন্ধ। কড়ায় ঝাঁকুনি দিতেই নাইমুল বলল, দরজা খোলা আছে। জোরে ধাক্কা দিলেই খুলবে। ভেতরে চলে আয়।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শাহেদ বলল, আমি কড়া নাড়ছি বুঝলি কী করে ? তুই তুই করছিলি। অন্য কেউ তো হতে পারত।

নাইমুল বলল, অনুমানে বলেছি। সাত-আট দিন পর পর তোর দেখা পাওয়া যায়। আজ নাইনথ ডে।

নাইমুল খালি গায়ে লুঙ্গি পরে বিছানায় শুয়ে আছে। তার মুখের উপর বিশাল সাইজের একটা বই ধরা। সতীনাথ ভাদুড়ির গ্রন্থাবলি। ঘর খুবই ছোট। কোনোমতে একটা খাট এবং একটা চেয়ার-টেবিল এঁটেছে। ঘরে একটা আলনা আছে, সেই আলনা বসানো আছে খাটের মাথায়। সেই কারণে খাট ছোট হয়ে গেছে। নাইমুলের মতো লম্বা মানুষ পা মেলে ঘুমুতে পারে না, তাকে পা

www.MurchOna.com

খানিকটা গুটিয়ে রাখতে হয়। তবে ঘরের সিলিং অনেক উঁচুতে। সেই উঁচু সিলিং থেকে লম্বা রডের মাথায় ফ্যান ঘুরছে। নাইমুল বই থেকে চোখ না সরিয়ে বলল— কোনো কথা না। স্ট্রেইট বাথরুমে চলে যা। বালতিতে পানি তোলা আছে। সাবান আছে, গামছা আছে, একটা লুঙ্গিও আছে। আরাম করে গোসল কর। তারপর কথা হবে।

শাহেদ বলল, বাসায় গিয়ে গোসল করব।

যা বলছি শোন। তোর ঘামে ভেজা শরীর দেখে আমারই অস্বস্তি লাগছে।

শাহেদ বাথরুমে ঢুকে পড়ল। গায়ে পানি ঢালার পর তার মনে হলো, দীর্ঘ একত্রিশ বছর জীবনে সে এত আরামের গোসল কোনো দিনও করে নি।

নাইমুল বলল, এই গাধা, গোসল করে আরাম পাচ্ছিস?

শাহেদ বলল, পাচ্ছি।

নাইমুল বলল, দুই বালতি পানি আছে। প্রথম বালতি পানি গায়ে ঢেলে শরীর ঠাণ্ডা কর। শরীর পুরোপুরি ঠাণ্ডা হবার পর গায়ে সাবান মাখবি। তাড়াহুড়ার কিছু নেই, ধীরে সুস্থে সাবান মাখ। তারপর সেকেন্ড বালতি। দুপুরে কি আমার এখানে খাবি?

খেতে পারি।

তাহলে তোকে আজ ইলিশ মাছের ডিম খাওয়াব। এই ডিম খাওয়ার পর পৃথিবীর কোনো খাবার তোর মুখে রুচবে না।

ডিম কে রাঁধছে?

গনি মিয়া বাবুর্চি। হোটেলে বলা আছে। খাওয়া যথাসময়ে চলে আসবে। হড়বড় করে পানি ঢালছিস কেন? আস্তে আস্তে ঢাল। শরীর আরাম পাক।

শাহেদ গায়ে পানি ঢালছে। আরামে ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছা করছে বাথরুমের ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে খানিকক্ষণ ঘুমায়। সে ঘুমাবে কেউ একজন গায়ে পানি ঢালবে। নাইমুলের গলা শোনা গেল— শাহেদ, তোকে বলা হয় নি। আমি বিয়ে করছি।

শাহেদ বলল, সে কী!

নাইমুল বলল, চমকে উঠলি কেন? আমি চিরকুমার থাকব— এরকম তো কখনো বলি নি।

মেয়ে দেখা হয়েছে?

হুঁ। চাকমা টাইপ চেহারা।

বলিস কী! মেয়েও ঠিক হয়ে গেছে? আমরা কিছুই জানলাম না।

www.MurchOna.com

বিয়ে করব আমি, তোদের জানার দরকার কী ?

বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে ?

হ্যাঁ।

কবে ?

আজ।

ঠাট্টা করছিস ?

আমি জীবনে কখনো কারো সঙ্গে ঠাট্টা করেছি— এরকম উদাহরণ আছে ?

বিয়ে কখন ?

রাতে। কাজি ডাকিয়ে বিয়ে। কবুল কবুল কবুল— ঝামেলা শেষ।

শাহেদ গায়ে পানি ঢালা বন্ধ করল। তার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু নাইমুল। আজ রাতে তার বিয়ে— এই খবরটা জানানোর প্রয়োজনও সে বোধ করে নি। নাইমুল সবসময় এরকম। সে কি আসলেই এরকম, না-কি এটা তার এক ধরনের 'শো' ? সবাইকে জানানো— তোমরা আমাকে দেখ, আমি নাইমুল, আমি জীবনে কখনো কোনো পরীক্ষায় সেকেন্ড হই নি। আমি তোমাদের মতো না। আমি আলাদা।

শাহেদ!

বল।

মেয়ের নাম মরিয়ম। আমি ঠিক করেছি শর্ট করে তাকে ডাকব মরি।

ভালো তো ।

আমার শ্বশুরসাহেব পুলিশের লোক। তার নাম মোবারক হোসেন।

তুই কি সত্যিই আজ বিয়ে করছিস ?

হ্যাঁ। আজ বিয়ে করাটাই আমার জন্যে সুবিধা। আজ বিশেষ দিন। ৭ই মার্চ। শেখ সাহেব স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। এক সময় এই দিনটি আমাদের জাতীয় দিবস হয়ে যাবে। সরকারি ছুটি থাকবে। আমি আমার ম্যারেজ ডে কখনো ভুলব না। ভালো কথা, তুই কি শেখ সাহেবের ভাষণ শুনতে যাবি ?

হ্যাঁ।

কী দরকার ? রেডিওতে প্রচার হবে, রেডিও শোন। ক্রিকেট খেলা এবং ভাষণ— এইসব রেডিওতে শোনা ভালো।

শাহেদ বাথরুম থেকে বের হলো। নাইমুলের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল, গোসল করে আরাম পেয়েছি।

www.MurchOna.com

নাইমুল মুখের উপর ধরে রাখা বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বলল, আরাম পাবি জানতাম।

শাহেদ বলল, আমি এখন যাচ্ছি।

নাইমুল বিস্মিত গলায় বলল, যাচ্ছি মানে কী ?

যাচ্ছি মানে যাচ্ছি।

ভাত খাবি না ?

না।

তুই কি রাগ করে চলে যাচ্ছিস না-কি ?

রাগ করব কেন ? রাগ করার মতো তুই তো কিছু করিস নি।

এই যে তোকে কোনো খবর না দিয়ে বিয়ে করে ফেলছি। আসলে বিয়ের মতো পার্সোনাল কোনো ব্যাপার নিয়ে আমি ঢাক পিটাতে চাই না। এমন তো না যে তুই আমার স্বভাব জানিস না।

শাহেদ কিছু না বলে দরজার দিকে এগুচ্ছে। নাইমুল বলল, সাতটার আগে চলে আসিস, বরযাত্রী যাবি। ধীরেন স্যারের কাছে যাব। উনাকেও বলব, বরযাত্রী যেতে। আমার ধারণা স্যারকে বললেই তিনি যাবেন। তোর কী ধারণা ?

শাহেদ জবাব না দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। সে আহত এবং অপমানিত বোধ করছে। নাইমুল তাকে খবর না দিয়ে বিয়ে করে ফেলছে ? শাহেদের গা জ্বালা করছে।

শাহেদ রেসকোর্সের দিকে এগুচ্ছে। শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্সের ময়দানে ভাষণ দেবেন। তিনি কী বলেন তা শোনা অতি জরুরি। ঘরে বসেও শোনা যেত, রেডিওতে ভাষণ প্রচার করা হবে। তবে কিছুই বলা যায় না। হঠাৎ হয়তো ভাষণ বন্ধ করে ইয়াহিয়া খান রাস্তায় মিলিটারি নামিয়ে দেবে। সেই প্রস্তুতি তাদের নেওয়া আছে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর বদল হয়েছে। ভাইস এডমিরাল এস এম আহসানের বদলে নতুন গভর্নর হয়ে এসেছে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান। টিক্কা খান, নামটাই তো ভয়াবহ। ইয়াহিয়া তাকে শুধু শুধু নিয়ে আসছে না। তার মাথায় অন্য পরিকল্পনা। যে-কোনো দিন এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন হবে। কী ভয়ঙ্কর যে হবে সেই দিন কে জানে! ডুমস ডে। দেশের বেশিরভাগ মানুষ ডুমস ডের ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। তারা কল্পনা করছে স্বাধীন দেশে বাস করছে। স্বাধীনতা এত সস্তা না।

রেসকোর্সের ময়দানে মানুষের স্রোত নেমেছে। তারা চুপচাপ চলে আসছে তা না। স্লোগান দিতে দিতে এগুচ্ছে— 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ

স্বাধীন করো।' 'ভুট্টোর মুখে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' 'পরিষদ না রাজপথ—রাজপথ, রাজপথ।' 'তোমার আমার ঠিকানা— পদ্মা-মেঘনা-যমুনা।' ঢাকায় যত মানুষ ছিল সবাই বোধহয় চলে এসেছে। লাখ লাখ মানুষ। যেদিকে চোখ যায় শুধু মানুষের মাথা। অনেকে আবার বাচ্চাকাচ্চা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। ঘোমটা দেওয়া বৌরাও আছে। তারা চোখ বড় বড় করে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। বাবার ঘাড়ে বসে একটা বাচ্চা মেয়ে ট্যা ট্যা করে কাঁদছে। মেয়েটার মাথায় চুল বেণি করা। বেণির মাথায় লাল ফিতা বাঁধা। কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটা মাথা ঝাঁকাচ্ছে আর তার বেণি নাড়ছে। সুন্দর লাগছে দেখতে। শাহেদ মুগ্ধ চোখে মেয়েটির বেণি নাড়ানো দেখল। তার মনে হলো রুনিকে নিয়ে এলে হতো। তাকে ঘাড়ে বসিয়ে মানুষের সমুদ্রের এই অসাধারণ দৃশ্য দেখানো যেত। এই দৃশ্য দেখাও এক পরম সৌভাগ্য। পৃথিবীর কোথাও কি এত মানুষ কখনো একত্রিত হয়েছে?

ভাষণ শুরু হওয়ার আগে আগে দুটা হেলিকপ্টার উড়ে গেল। মানুষের সমুদ্রে একটা ঢেউ উঠল। চাপা আতঙ্কের ঢেউ। শাহেদের পাশে বুড়োমতো এক লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে একটা ছাতা। ছাতাটাকে লাঠির মতো বাগিয়ে ধরে আছে সে, যেন এক্ষুণি যুদ্ধ শুরু হবে। সে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে ছাতা হাতে। বুড়ো শাহেদের দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে বলল, আইজ শেখসাব স্বাধীন ডিক্লার দিব। বলেই সে থু করে পানের পিক ফেলল। সেই পিক পড়ল শাহেদের প্যান্টে। সাদা প্যান্টে লাল পানের পিক, মনে হচ্ছে রক্ত লেগে গেছে। শাহেদ কঠিন কিছু কথা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ভাষণ শুরু হয়ে গেল। চারদিকে ভয়াবহ নীরবতা, লাখ লাখ মানুষ নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছে। তারা তাদের মহান নেতার প্রতিটি শব্দ শুনতে চায়। কোনো কিছুই যেন বাদ না পড়ে।

মাঝে মাঝে শেখ মুজিব দম নেবার জন্যে থামছেন আর তখনই আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ধ্বনি উঠছে— 'জয় বাংলা!' 'জয় বাংলা!'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভরাট গলা ভেসে আসছে। মাথার উপরে চিলের মতো উড়ছে হেলিকপ্টার। শাহেদ ভাষণ শুনছে আকাশের দিকে তাকিয়ে। আজই ঘটে যাবে না তো? হয়তো আজই ফেলে দিল হেলিকপ্টার থেকে কিছু বোমা।

> আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সকলে জানেন এবং বুঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, ঢাকা আমার ভাইয়ের রক্তে

suman_ahm@yahoo.com
www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

> রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম ? নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এ দেশের ইতিহাসকে আমরা গড়ে তুলব।...

হেলিকপ্টার বড় যন্ত্রণা করছে। এরা কী চাচ্ছে ? বাচ্চা মেয়েটা কাঁদতে শুরু করেছে। মনে হয় সে ভয় পাচ্ছে।

ভাষণ শেষ হবার পর শাহেদ কি ফিরে যাবে বন্ধুর কাছে ? আজ তার বিয়ে। সেই বিয়েতে শাহেদ অবশ্যই অনুপস্থিত থাকতে পারে না। তার উপর রাগ হচ্ছে। রাগ চাপা থাক। রাগ দেখানোর সময় আরো পাওয়া যাবে। এ-কী, সে ভাষণ না শুনে মনে মনে কী সব ভাবছে ? নেতার প্রতিটি কথা খুব মন দিয়ে শুনতে হবে। এই ভাষণে অনেক সাংকেতিক নির্দেশও থাকতে পারে।

> সৈন্যরা তোমরা আমার ভাই। তোমরা ব্যারাকে থাকো, তোমাদের কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু আর তোমরা গুলি করার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।

শাহেদ গভীর মনোযোগে বক্তৃতা শোনার চেষ্টা করছে। অতিরিক্ত মনোযোগের কিছু সমস্যা আছে— মাঝে-মাঝে সব আবছা হয়ে যায়। মানুষের মস্তিষ্ক এত মনোযোগ নিতে পারে না। সে কিছু সময়ের জন্যে বিশ্রাম নেয়।

www.MurchOna.com

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর দরজা খুলল। কোমরে ধুতি পেঁচানো খালি গায়ের যে মানুষটি দরজা খুললেন— তাঁর নাম ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়ের প্রফেসর এখন অবসর জীবনযাপন করছেন। সময় কাটছে বই পড়ে। সকালে নাশতা খেয়ে তিনি বই পড়া শুরু করেন। দুপুরের খাবারের পর কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমুতে যান। ঘুম ভাঙার পর আবার বই পড়া শুরু হয়। শেষ হয় রাতে ঘুমুতে যাবার সময়। তাঁর অবসর জীবন বড়ই আনন্দে কাটছে।

নাইমুল নিচু হয়ে তার অতি পছন্দের মানুষের পা ছুঁয়ে কদমবুসি করতে করতে বলল, স্যার কি ঘুমাচ্ছিলেন ? ঘুম থেকে তুললাম ?

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী আসলেই ঘুমুচ্ছিলেন। এই কথা শুনলে ছাত্র যদি অস্বস্তি বোধ করে সে কারণেই তিনি হাসিমুখে অবলীলায় মিথ্যা বললেন, আরে না। এই সময় কেউ ঘুমায় না-কি ?

নাইমুল বলল, স্যার, আমাকে চিনতে পেরেছেন ?

আরে চিনব না কেন ? অবশ্যই চিনেছি। আসো, ভিতরে আসো। তুমি আছ কেমন, ভালো ?

নাইমুল বলল, স্যার আজও যদি আমাকে চিনতে না পারেন, তাহলে ঘরে ঢুকব না। এর আগে যে কয়বার এসেছি, কোনোবারই আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি অথচ ভাব করেছেন যে চিনে ফেলেছেন।

অবশ্যই চিনেছি।

তাহলে আপনি আমার নাম বলুন।

দাঁড়াও, চশমাটা পরে আসি। চশমা ছাড়া দূরের জিনিস কিছুই দেখি না।

নাইমুল হাসিমুখে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী শোবার ঘর থেকে চশমা পরে এলেন এবং বেশ কিছুক্ষণ নাইমুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার নাম শাহেদ। হয়েছে ?

নাইমুল ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, ফিফটি পারসেন্ট কারেক্ট হয়েছে স্যার।

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, ফিফটি পারসেন্ট কীভাবে কারেক্ট হবে ?

আমার নাম নাইমুল। আপনি শাহেদের নাম বলেছেন। শাহেদ আমার বন্ধু। তাকে নিয়ে আপনার কাছে তিন-চারবার এসেছি। আপনি শাহেদের নাম মনে রেখেছেন। অথচ সে আপনার ছাত্র না। আমি আপনার ডাইরেক্ট স্টুডেন্ট।

শাহেদ আছে কেমন ?

ভালো আছে।

তাকে আনলে না কেন ? তোমার একা আসা উচিত হয় নি। তাকে সঙ্গে করে আনা উচিত ছিল।

নাইমুল বলল, তাকে আনা উচিত ছিল কেন স্যার ?

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী তাঁর ছাত্রের দিকে তাকিয়ে বিব্রত ভঙ্গিতে হাসলেন। ছাত্ররা মাঝে-মাঝে তাকে খুবই বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে।

নাইমুল, চা খাবে ?

খাব।

যাও, রান্নাঘরে চলে যাও। পানি গরমে দাও। চায়ের সঙ্গে আজ তোমাকে অসাধারণ একটা জিনিস খাওয়াব। তিলের নাড়ু। তুমি কতক্ষণ থাকবে এখানে ?

ঘণ্টাখানিক। আমি সাতটার সময় চলে যাব।

ঠিক আছে। কোনো অসুবিধা নেই।

আমি আপনার কাছে বিশেষ একটা কাজে এসেছি স্যার।

কী কাজ ?

আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। আমার মুরুব্বি কেউ ঢাকায় নেই। আপনি আমার সঙ্গে গার্জিয়ান হিসেবে যাবেন।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বললেন, অবশ্যই অবশ্যই।

অবশ্যই অবশ্যই বলা তাঁর মুদ্রাদোষ। কোনো কথা না শুনেই তিনি বলেন অবশ্যই অবশ্যই। ইউনিভার্সিটিতে তাঁর নাম ছিল 'অবশ্যই স্যার'।

নাইমুল বলল, স্যার, আপনি কি আমার কথা মন দিয়ে শুনেছেন ?

কোন কথার ব্যাপারে জানতে চাচ্ছ ?

এই যে আমি বললাম, আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি, আপনি আমার গার্জিয়ান।

অবশ্যই মন দিয়ে শুনেছি। এবং তোমাকে একটা সত্যি কথা বলি— এখন তোমাকে আমি চিনেছি। তুমি যখন বললে নাম নাইমুল, তখনো চিনতে পারি নি। এখন তোমার কথা বলার ধরন থেকে চিনেছি। তুমি তো কমনওয়েলথ স্কলারশিপ পেয়েছ ?

www.MurchOna.com

জি স্যার। এবারডিন ইউনিভার্সিটিতে আমার প্লেসমেন্ট হয়েছে শুধুমাত্র আপনার একটা চিঠির কারণে।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বিস্মিত হয়ে বললেন, চিঠি কখন লিখলাম ?

চা খেতে খেতে নাইমুল স্যারের সঙ্গে গল্প শুরু করল। গল্প করার সময় সাধারণত মুখোমুখি বসা হয়। ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর বিচিত্র স্বভাবের একটি হচ্ছে, তিনি তার ছাত্রদের সঙ্গে গল্প করার সময় তাদের নিজের বাঁ পাশে বসান। এবং বেশিরভাগ সময় তাঁর বাঁ হাত ছাত্রের পিঠের উপর রাখেন। নাইমুলের ধারণা— স্যার মুখ দেখেন না বলেই ছাত্রদের কখনোই চিনতে পারেন না। তবে যে-কোনো ছাত্রের পিঠে হাত দিয়ে তিনি নাম বলতে পারবেন।

স্যার, আমি একটা বিশেষ দিনে বিয়ে করছি। সেটা কি বুঝতে পারছেন ?

বিশেষ দিনটা কী ?

আজ সাতই মার্চ।

সাতই মার্চ বিশেষ দিন কেন ?

স্যার, আপনি নিজে একটু চিন্তা করে বলুন তো সাতই মার্চ কেন বিশেষ দিন।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় ভুরু কুঁচকে সামান্য চিন্তার ভেতর দিয়ে গেলেন। নাইমুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, সাত হলো একটা প্রাইম নাম্বার। মৌলিক সংখ্যা। মার্চ মানে তিন। তিন আরেকটা প্রাইম নাম্বার। এই জন্যেই দিনটা বিশেষ দিন। হয়েছে ?

হয় নি স্যার। আজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিবেন। হয়তো ইতিমধ্যে দিয়েও ফেলেছেন।

স্বাধীনতার ঘোষণা ? বলো কী ? ইন্টারেস্টিং তো!

যদিও তিনি যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে বললেন, ইন্টারেস্টিং তো, নাইমুল জানে তিনি মোটেই ইন্টারেস্ট পাচ্ছেন না। এই মানুষটার কাছে পদার্থবিদ্যার যে-কোনো সমস্যা জাগতিক সমস্যার চেয়ে অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং।

নাইমুল বলল, দেশ, রাজনীতি— এইসব নিয়ে আপনি কি কখনোই কিছু ভাবেন না ?

কে বলল ভাবি না ? ভাবি তো। প্রায়ই ভাবি।

মোটেও ভাবেন না। আপনার সমস্ত ভুবন জুড়ে আছে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। আপনি এর বাইরে কোনো কিছু নিয়েই ভাবেন না।

www.MurchOna.com

সেটা কি দোষের ?

জি স্যার দোষের। আপনি দেশ বা রাজনীতির বাইরের কেউ না। আপনি সিস্টেমের ভেতর আছেন।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী শান্ত গলায় বললেন, নাইমুল, তোমার কথার কাউন্টার লজিক কিন্তু আছে। সবার কাজ কিন্তু ভাগ করা। একদল মানুষ যুদ্ধ করবেন, তারা যোদ্ধা। একদল রাজনীতি করবেন। তারা সেটা বুঝেন। অর্থনীতিবিদেরা দেশের অর্থনীতি নিয়ে ভাববেন। আমি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার লোক, আমি সেটা নিয়ে ভাবব। তুমি যে সিস্টেমের কথা বললে— এসো সেই সিস্টেম সম্পর্কে বলি। সিস্টেম কী ? সিস্টেম হলো, Observable part of an experiment. একগ্লাস পানিতে আমি এক চামচ সোডিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে দিলাম। এখন আমার সিস্টেম হলো, গ্লাসে রাখা লবণের দ্রবণ। তর্কের খাতিরে ধরে নেই এটা একটা Closed System.

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী প্রবল আগ্রহে বক্তৃতা করে যাচ্ছেন। তাঁর বক্তৃতার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, তিনি একগাদা ছাত্র-ছাত্রীর সামনে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অতি জটিল কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করছেন। নাইমুল এক ফাঁকে ঘড়ি দেখল। হাতে সময় আছে। স্যারকে মনের আনন্দে আরো কিছুক্ষণ কথা বলার সুযোগ দেয়া যেতে পারে। এই মানুষটার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। সবাই হয় ইন্ডিয়া কিংবা আমেরিকায় চলে গেছে। এই মানুষটা ওয়ারির তিন কামরার ছোট্ট বাড়ি কামড়ে পড়ে আছে। তাঁর একটাই কথা— নিজের বাড়ি-ঘর দেশ ছেড়ে আমি যাব কোথায় ? আমি কেন ইন্ডিয়াতে যাব ? আমার জন্ম হয়েছে এই দেশে। দেশ ছেড়ে চলে যাব ? আমি কি দেশের এত বড় কুসন্তান ?

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী তাঁর বিখ্যাত ভোকসওয়াগন গাড়ি বের করলেন। নাইমুল বলল, রিকশায় করে গেলে কেমন হয় স্যার ?

রিকশায় করে যাবে কেন ? আজ তোমার বিয়ে।

আপনার সঙ্গে গাড়িতে করে যেতে ভয় লাগে স্যার। আপনি নিজের মনে গাড়ি চালান। রাস্তার দিকে তাকান না।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বিস্মিত হয়ে বললেন, নাইমুল, আমার সম্পর্কে তোমাদের ভুল ধারণা আছে। আমি অত্যন্ত সাবধানী চালক। এখন পর্যন্ত আমি গাড়িতে কোনো একসিডেন্ট করি নি।

গাড়িতে একসিডেন্ট করেন নি, তাঁর কারণ কিন্তু স্যার আপনার ড্রাইভিং না।

তাহলে কী ?

www.MurchOna.com

আপনি গাড়ি নিয়ে কখনো বের হন না। ঘরেই থাকেন। আমি নিশ্চিত, আপনি গত তিন মাসে আজ প্রথম গাড়ি বের করেছেন।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বিরক্ত গলায় বললেন, তুমি তর্ক-প্রিয় হয়ে যাচ্ছ। তর্ক ভালো জিনিস না।

গাড়িতে উঠেই তাঁর বিরক্তি অতি দ্রুত কেটে গেল। তিনি গভীর আগ্রহে Kaluza-klein theory সম্পর্কে বলতে লাগলেন। নাইমুল, মন দিয়ে শোন কী বলি— Kaluza তাঁর পেপার পাঠালেন আইনস্টাইনের কাছে। তারিখটা মনে রাখ— এপ্রিলের একুশ, সনটা খেয়াল করো— উনিশ শ' উনিশ। Kaluza সেই পেপারে পাঁচটা ডাইমেনশনের কথা প্রথম বললেন। এর আগে আইনস্টাইন চারটা ডাইমেনশনের কথা বলেছিলেন। Kaluza কী করলেন— ডাইমেনশন একটা বাড়ালেন। আইনস্টাইন বলেছিলেন— না, পেপার গ্রহণযোগ্য না।

নাইমুল বলল, স্যার, আপনি রাস্তার দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন না। আমার দিকে তাকিয়ে চালাচ্ছেন।

আমি ঠিকই গাড়ি চালাচ্ছি— তুমি মন দিয়ে শোন কী বলছি। অক্টোবরের ১৪ তারিখ উনিশ শ' একুশ সনে ঠিক দু'বছর পর আইনস্টাইন তাঁর মত বদলালেন। তিনি Kaluza-র পেপার একসেপ্ট করলেন। অরিজিনাল সেই পেপার আমি জোগাড় করেছি। পেপারটা জার্মান ভাষায়। আমার এখন দরকার ভালো জার্মান জানা লোক। তোমার খোঁজে কি জার্মান জানা লোক আছে?

নাইমুলের মজা লাগছে। কী অদ্ভুত মানুষ! জগতের কোনো কিছুর সঙ্গেই এই মানুষটির যোগ নেই। রাস্তায় জনস্রোত। অদ্ভুত অদ্ভুত শ্লোগান হচ্ছে—

> ইয়াহিয়া ভুট্টো দুই ভাই
> এক দড়িতে ফাঁসি চাই॥
>
> ইয়াহিয়ার চামড়া
> তুলে নিব আমরা।
>
> বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো
> ইয়াহিয়াকে খতম করো॥

অথচ ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর দৃষ্টি একবারও সেদিকে যাচ্ছে না। তাঁর জগৎ Kaluza-র পঞ্চম ডাইমেনশনে আটকে গেছে।

নাইমুল!

জি স্যার।

www.MurchOna.com

তুমি সত্যি সত্যি একা বিয়ে করতে যাচ্ছ— এটা খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা।

একা তো যাচ্ছি না। আপনিও যাচ্ছেন। আমি আমার দু'জন আত্মীয়কেও খবর দিয়েছি, তারাও চলে আসবেন। সরাসরি মেয়ের বাড়িতে চলে যাবেন।

তাহলে বরযাত্রীর মোট সংখ্যা দাঁড়াল চার। আরেকজন হলে ভালো হতো।

ভালো হতো কেন স্যার ? Kaluza সাহেবের থিওরিতে পাঁচটা ডাইমেনশন, আমার বিয়েতেও বরযাত্রী পাঁচজন এই কারণে ?

ঠিক ধরেছ। তোমার বুদ্ধি ভালো। আমি তোমার বুদ্ধি দেখে খুশি হয়েছি।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ছাত্রের বুদ্ধিতে এতই খুশি হলেন যে গাড়ি নিয়ে রাস্তার পাশের নর্দমায় পড়ে গেলেন।

অনেক ঠেলাঠেলি করেও গাড়ি সেখান থেকে উঠানো গেল না। তিনি হতাশ গলায় ছাত্রকে বললেন, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। তুমি একটা রিকশা করে চলে যাও। আমাকে ঠিকানা দিয়ে যাও। আমি গাড়ি উঠানোর ব্যবস্থা করে চলে আসব।

নাইমুল বলল, আমি আপনাকে রেখে একা একা চলে যাব ?

অবশ্যই যাবে। তুমি হচ্ছ বর। সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তোমার দেরি হলে সবাই দুশ্চিন্তা করবে। বিশেষ করে মেয়েটি। তুমি যাও তো। এটা তোমার প্রতি আমার আদেশ। ঠিকানাটা বলো, আমি মুখস্থ করে রাখি।

নাইমুল চলে যাবার পরপরই লোকজন মিলে ঠেলে তাঁর গাড়ি তুলে দিল। ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ছাত্রের দেয়া ঠিকানায় রওনা হলেন। তাঁকে নাইমুল বলেছে ১৮নং সোবাহানবাগ। কিন্তু তিনি চলে গেলেন চামেলীবাগে। অনেক রাত পর্যন্ত তিনি চামেলীবাগের আঠারো নম্বর দোতলা বাড়ি খুঁজতে লাগলেন। যে বাড়ির গেট হলুদ রঙের। বাড়ির সামনে দুটা কাঁঠাল গাছ আছে।

www.MurchOna.com

মরিয়ম কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না— তার বিয়ে হয়ে গেছে। তার যেন কেমন লাগছে। গা হাত পা কাঁপছে। বুকে ধুকধুক শব্দ হচ্ছে। প্রচণ্ড পানির পিপাসা হচ্ছে কিন্তু এক চুমুক পানি খেলেই পিপাসা চলে যাচ্ছে। পানি খেতে আর ভালো লাগছে না। কিছুক্ষণ পর আবার পিপাসা হচ্ছে। সে নিজের কপালে হাত দিল। গায়ে কি জ্বর আছে ? জ্বরের সময় এরকম উল্টাপাল্টা লাগে। না জ্বর তো নেই। কপাল ঠাণ্ডা।

কী আশ্চর্য! বসার ঘরে যে লম্বা রোগা ছেলেটি বসে আছে, সে তার স্বামী। যাকে সে আগে কোনোদিন দেখে নি, যার সঙ্গে কোনো কথা হয় নি। মাত্র পনেরো মিনিট আগে থেকে সে তার জীবনের সবচে' ঘনিষ্ঠজন। বিয়ে নামক অদ্ভুত একটা ঘটনায় আজ রাত আটটা সাত মিনিট থেকে দু'জন শুধু দু'জনের।

মরিয়ম তার স্বামীকে এখনো ভালোমতো দেখে নি। দূর থেকে আবছাভাবে দেখেছে। তার খুবই ইচ্ছা করছে কাছ থেকে দেখতে। তার চোখ দু'টা কেমন ? বিড়াল-চোখা না তো ? বিড়াল-চোখা মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা যায় না। কথা বললে মনে হয় বিড়ালের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। এই বুঝি মানুষটা মিঁউ করে উঠবে। তার কি জোড়া ভুরু ? জোড়া ভুরুর মানুষ মরিয়মের খুব অপছন্দ। যার যা অপছন্দ তাই সে পায়। দেখা যাবে নাইমুল নামের মানুষটার জোড়া ভুরু। আচ্ছা থাকুক জোড়া ভুরু। কপালে যা থাকে তাই তো হবে। বিয়ে হলো কপালের ব্যাপার।

একটু আগে তার সবচে' ছোটবোন মাফরুহা এসে বলল, বুবু, তোমার বর খুব সুন্দর। মরিয়মের ইচ্ছে করছিল জিজ্ঞেস করে— তোর দুলাভাইয়ের জোড়া ভুরু না-কি ? চট করে দেখে আয় তো। লজ্জায় প্রশ্নটা সে করতে পারে নি।

মাফরুহা বলল, দুলাভাই কিন্তু রাতে থাকবে না। এখনই চলে যাবে।

মরিয়মের বুক ধক করে উঠল। সে এখনো দেখলই না, তার আগেই চলে যাবে ? এমন ঘটনা কি এর আগে কখনো ঘটেছে— বর এসে বিয়ে করেই উধাও

www.MurchOna.com

হয়ে গেছে ? মরিয়মের মনটা খারাপ হয়ে গেল। সে অবশ্যি অবহেলার ভঙ্গিতে বলল, চলে গেলে চলে যাবে। আমার কী ? যাবে কখন ?

দুলাভাইয়ের ছোট চাচা তো এক্ষুনি চলে যাবেন বলছেন। উনি নারায়ণগঞ্জ থাকেন। অনেক দূর যেতে হবে। তাঁর সঙ্গে দুলাভাইও চলে যাবেন কি-না বুঝতে পারছি না। দুলাভাই কিছু বলছেন না।

মরিয়ম বলল, দুলাভাই দুলাভাই করছিস কেন ? শুনতে বিশ্রী লাগছে। চেনা নেই, জানা নেই একটা মানুষ।

কথাটা মরিয়মের মনের কথা না। ছোট বোনের মুখে দুলাভাই ডাকটা শুনতে তার খুবই ভালো লাগছে। কী সুন্দর টেনে টেনে বলছে— 'দু ... লা ভাই'।

মাফু, দেখ তো আমাকে কি বিয়ের শাড়িতে মানিয়েছে ? (ছোট বোনকে মরিয়ম আদর করে মাফু ডাকে)

মাফরুহা বলল, তোমাকে খুবই সুন্দর লাগছে।

খোঁজ নিয়ে আয় তো ওরা সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছে কি-না। ওরা চলে গেলে মা যে এত রান্নাবান্না করেছেন সেগুলি কে খাবে ? মাসুমা সন্ধ্যা থেকে চুলার পাড়ে বসে আছে। তার কষ্ট হচ্ছে না ?

মাফরুহা খোঁজ নিতে গেল। মরিয়ম দাঁড়ালো আয়নার সামনে। সে আগেও কয়েকবার দাঁড়িয়েছে। প্রতিবারই নিজেকে সুন্দর লেগেছে। এখন মনে হয় একটু বেশি সুন্দর লাগছে। অথচ খুবই সাধারণ শাড়ি। 'ওরা' নিয়ে এসেছে। সবুজ রঙের শাড়ি। ভাগ্যিস কড়া সবুজ না। গ্রামের মেয়েরাই শুধু কটকটে কড়া রঙের সবুজ শাড়ি পরে। শাড়ি যত সাধারণই হোক মরিয়ম ঠিক করে রেখেছে, এই শাড়ি সে খুব যত্ন করে রাখবে। প্রতিবছর ৭ মার্চ বিয়ের দিনে এই শাড়ি সে পরবে। তার মেয়েরা বড় হলে মায়ের বিয়ের শাড়ি দেখতে চাইবে। মেয়েদের কেউ একজন হয়তো বলবে, তোমার বিয়ের শাড়ি এত সস্তা কেন মা ? এ তো সত্যি ক্ষেত শাড়ি। পরলে মনে হবে ধানক্ষেত।

তখন মরিয়ম বলবে, আমাদের খুব তাড়াহুড়ার বিয়ে হয়েছিল। দেশজুড়ে তখন অশান্তি। তোর বাবার হাতে কোনো টাকা-পয়সা নেই। সে তার দূরসম্পর্কের এক চাচা এবং এক ফুফাকে নিয়ে এসেছিল। সন্ধ্যাবেলা বাসায় এসেছে, তখনো আমি জানি না যে আমার বিয়ে।

মা, তোমার বিয়েতে কোনো উৎসব হয় নি ?

না।

গায়েহলুদ-টলুদ কিছুই হয় নি ?

না, সে-রকম করে হয় নি। তবে শাড়ি পরার আগে গোসল করলাম, তখন তোর ছোট খালা আমার গালে এক গাদা হলুদ মেখে দিল। মসলা পেষার পাটায় হলুদ পেষা হয়েছিল। শুকনা মরিচের ঝাল চোখে লেগে গেল। কী জ্বলুনি! চোখ দিয়ে সমানে পানি পড়ছে, আর সবাই ভাবছে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে এই জন্যে কাঁদছি।

তোমার কান্না পাচ্ছিল না ?

না।

বিয়ের দিন সবারই কান্না পায়। তোমার পাচ্ছিল না কেন মা ?

জানি না। তখন সময়টা তো অন্যরকম ছিল। প্রতিদিন মিটিং মিছিল, পুলিশের গোলাগুলি, কার্ফু— এই জন্যেই বোধহয়।

বাবাকে প্রথম দেখে কি তোমার ভালো লেগেছিল মা ?

না দেখেই ভালো লেগেছিল।

সেটা কেমন কথা! না দেখে ভালো লাগে কীভাবে ?

তুই যা তো। তোকে এত কিছু ব্যাখ্যা করতে পারব না।

মরিয়মের ধারণা তার মেয়ে ধমক খেয়েও যেতে চাইবে না। সে চোখ বড় বড় করে তার বাবা-মা'র বিয়ের গল্প শুনতে চাইবে। সেটাই স্বাভাবিক। মেয়েরা মায়ের বিয়ের গল্প খুব আগ্রহ করে শোনে।

নাইমুলের সঙ্গে বরযাত্রী মাত্র দু'জন। তার দূরসম্পর্কের চাচা হাফিজুদ্দিন এবং তার ফুপা হামিদুল ইসলাম। এরা দু'জনই থাকেন নারায়ণগঞ্জে। কাজি সাহেব বিয়ে পড়ানো শেষ করতেই দু'জনই অতি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন চলে যাবার জন্যে। লক্ষণ খারাপ। শেখ সাহেবের ভাষণ রেডিওতে প্রচার করে নাই। ভাষণের বদলে অন্য কোনো অনুষ্ঠানও নাই। রেডিও নীরব। মিলিটারিরা হয়তো রেডিও স্টেশনের দখল নিয়ে নিয়েছে। এখন হয়তো রাস্তাঘাটের দখল নিবে। যত তাড়াতাড়ি বাড়িতে পৌঁছানো যায় ততই ভালো।

মুসলেম উদ্দিনও চলে যেতে চাচ্ছেন। ঝামেলার সম্ভাবনা যেহেতু আছে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়াই তো ভালো। তিনি যাবেন যাত্রাবাড়ি। নারায়ণগঞ্জ যাবার পথেই যাত্রাবাড়ি পড়বে। এক সঙ্গে চলে যাওয়া যায়। এখন সময় এমন যে চলে যাওয়াই ভালো। মুসলেম উদ্দিন বললেন, ঘণ্টাখানিক অপেক্ষা করলে খানা দিয়ে দেয়া যাবে। মরিয়মের মা একা মানুষ, সব সামাল দিতে পারছে না। আমি খবর নিয়েছি পোলাও চুলায় বসানো হয়েছে। (কথা সত্যি নয়। পোলাও-এর চাল আনতে দোকানে লোক গেছে। আগে যে কালিজিরা চাল আনা হয়েছিল, সে চাল থেকে পচা গন্ধ বের হচ্ছে।)

হাফিজুদ্দিন বললেন, সম্পর্ক যখন হয়েছে অনেক খাওয়া ইনশাল্লাহ হবে। আজ বিদায় দিয়ে দেন। মেয়ের বাবাকে ডাকেন, উনার কাছ থেকে বিদায় নিই।

মুসলেম উদ্দিন বললেন, আমার ভাগ্নে তো কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে। অফিসের ডাক পড়েছে। বুঝেন না— ডাক পড়লে সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতে হয়। বড়ই কঠিন চাকরি।

হামিদুল ইসলাম গম্ভীর গলায় বললেন, বেয়াই সাহেব তো আমাদের কাছ থেকে বিদায়ও নিলেন না। অবশ্য আমরা তুচ্ছ মানুষ। আমরা কোনো কঠিন চাকরি করি না। দুই পয়সার ব্যবসায়ী।

মুসলেম উদ্দিনকে অবস্থা সামলাবার জন্যে হড়বড় করে অনেক কথা বলতে হলো। তাতে তেমন লাভ হলো না। দু'জনই এমন ভাব করতে থাকেন যেন তাদের বিরাট অপমান করা হয়েছে। অপমান যেহেতু করা হয়েছে সেহেতু না খেয়ে উঠে যাওয়ার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

মোবারক হোসেন ঘরেই আছেন। তিনি কিছুক্ষণ আগে মুসলেম উদ্দিনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেছেন— বিয়ে তো হয়েছে, এখন আর ঘটর ঘটর আমার ভালো লাগছে না। এদের বিদায় করেন। ছেলেকেও চলে যেতে বলেন। পরে একটা তারিখ করে তারা বউ উঠিয়ে নিবে।

মুসলেম উদ্দিন বললেন, না খাইয়ে তো বিদায় করতে পারি না।

খাওয়ান। আমাকে আর এর মধ্যে ডাকবেন না। আমি আর আসব না। আমার নিজের শরীর ভালো না। ইয়াহিয়ারও এসেছে জ্বর। অসুখ-বিসুখের মধ্যে বিয়ের যন্ত্রণা অসহ্য লাগছে।

বরযাত্রী দু'জনই চলে গেছেন, মুসলেম উদ্দিনও তাদের সঙ্গে গেছেন। কাজি সাহেব আগেই গেছেন। তাঁর না-কি আজ আরেকটা বিয়ে পড়াতে হবে। নাইমুল বসার ঘরে একা বসে আছে। কিছুক্ষণ মাফরুহা ছিল। এখন সেও চলে গেছে। তার দায়িত্ব পড়েছে বাবার মাথার চুল টেনে দেবার। কাজটা সে করছে খুব ভয়ে ভয়ে। একটু জোরে টান লাগলে সে ধমক খাবে, আবার আস্তে টানলেও ধমক খাবে।

মেজ বোন মাসুমা রান্নাঘরে। আজকের রান্নাবান্না সে-ই করছে। সাফিয়া ইয়াহিয়াকে কোলে নিয়ে রান্নাঘরের বারান্দায় আছেন। মাঝে-মাঝে রান্নাঘরে ঢুকে মাসুমাকে কী করতে হবে তা বলে দিচ্ছেন। প্রবল জ্বর আসার কারণে ইয়াহিয়া খুবই কান্নাকাটি করছে। মা'র কোল থেকে একেবারেই নামতে চাচ্ছে না।

মাসুমা বলল, মা, তোমার রান্নাঘরে আসার দরকার নাই। আমি পারব। তুমি বাবুর মাথায় পানি ঢালার ব্যবস্থা করো।

www.MurchOna.com

পানি ঢালব?

জ্বর এত বেশি, পানি ঢালবে না?

তোর বাবা যদি আবার রাগ করে! আরেকবার জ্বরের সময় পানি দিয়েছিলাম, তোর বাবা খুব রাগ করেছিল। এতে না-কি ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয়।

বাবা যাতে জানতে না পারে সেইভাবে পানি ঢাল।

তুই একটু সরে বোস না মা। কাপড়ে আগুন লেগে যাবে তো।

মাসুমা সরে বসল। তার হঠাৎ মনে হলো, তাদের এই সৎমা আসল মায়ের চেয়েও ভালো হয়েছেন। নিশ্চয়ই তারা তিনবোন খুব বড় ধরনের কোনো পুণ্য করেছে, যে কারণে আল্লাহ তাদের উপহার হিসেবে এমন একজন মা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মা।

হুঁ।

দুলাভাই কি একা বসে আছেন?

হুঁ। এতক্ষণ মাফরুহা ছিল। এখন সে একা।

আহা বেচারা, বিয়ে করতে এসে কেউ এতক্ষণ একা একা বসে থাকে না। মা, এক কাজ করো, বুবুকে পাঠিয়ে দাও। বুবু গল্প করুক।

তোর বাবা যদি রাগ করে?

বুবুর সঙ্গে বেচারার ভাব হবে না?

রান্না হোক, তখন খাবার দিয়ে মরিয়মকে পাঠাব। তাহলে তোর বাবা কিছু বলতে পারবে না।

দুলাভাই দেখতে রাজপুত্রের মতো, তাই না মা?

হুঁ। মরিয়মের খুব পছন্দ হবে।

বুবুর কথা বাদ দাও মা। রাস্তা থেকে কাল্লু গুণ্ডাকে ধরে এনে যদি বুবুর বিয়ে দাও, বুবু তাকেও অন্তর দিয়ে ভালোবাসবে। মুগ্ধ গলায় বলবে, আমি সারা জীবন এরকম একজন গুণ্ডাই চেয়েছিলাম। ঠিক বলেছি না মা?

মনে হয় ঠিকই বলেছিস।

আমি কিন্তু বুবুর মতো না। আমার পছন্দ অনেক কঠিন।

একেক বোন একেক রকম হবি— এটাই তো স্বাভাবিক।

আর এরকম আধাখেচড়া বিয়েও আমি করব না। আমার বেনারসি শাড়ি লাগবে। গা ভর্তি গয়না লাগবে। হুট হাটের বিয়ের মধ্যে আমি নাই।

www.MurchOna.com

চুলার আগুন কমিয়ে দে। আগুন বেশি।

মাসুমা চুলার আগুন কমাতে কমাতে বলল, আচ্ছা মা, বাবা আমাদের তিনবোনকে সহ্যই করতে পারে না। কেন বলো তো ?

সহ্য করতে পারবে না কেন! তোদের জন্যে উনার খুব দরদ। মানুষটা অন্যরকম তো, প্রকাশ পায় না।

খুব দরদ থাকলে কি আর...

মাসুমা কথা শেষ করতে পারল না। বাবু আবারো হাত-পা ছুড়ে কাঁদতে শুরু করেছে। সাফিয়া তাকে বাথরুমে নিয়ে গেলেন। চুপিচুপি তার মাথায় পানি ঢালবেন।

রাত দশটা বাজে।

নাইমুলকে খেতে দেয়া হয়েছে। খাবার নিয়ে ঢুকেছে মরিয়ম। তার হাত কাঁপছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি হাত ফসকে কোরমার বাটিটা মেঝেতে পড়ে যাবে।

নাইমুল তার দিকে তাকিয়ে বলল, মরিয়ম, কেমন আছ ?

মরিয়মের শরীরে ঝিম ধরে গেল। এত সুন্দর গলার স্বর! আর কী আদর করেই না মানুষটা জিজ্ঞেস করেছে— 'মরিয়ম কেমন আছ ?' মরিয়মের খুব ইচ্ছা করছে বলে, 'আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছ ?' প্রথম থেকেই তুমি করে বলা। একবার আপনি শুরু করলে তুমিতে আসতে কষ্ট হয়। তার এক বান্ধবী, নাম জসি, বিয়ের পরে প্রথম প্রথম স্বামীকে আপনি বলতে শুরু করেছিল। এখন আর তুমি বলতে পারছে না। এই ভুল মরিয়ম করতে রাজি না। সে শুরু থেকেই তুমি বলবে।

কিন্তু কথা বলবে কী, মরিয়মের গলা দিয়ে কোনো শব্দই বের হচ্ছে না। গলার কাছে কী যেন দলা পাকিয়ে আছে। নাইমুল বলল, তোমার নামটা এমন যে ছোট করে ডাকব সে উপায় নেই। ছোট করে ডাকলে তোমাকে ডাকতে হয় মরি। সেটা নিশ্চয় তোমার ভালো লাগবে না।

মরিয়ম মনে মনে বলল, যা ইচ্ছা তুমি আমাকে ডাক। তুমি যাই ডাকবে আমার ভালো লাগবে।

নাইমুল বলল, খাবার তুলে দিতে হবে না। আমি নিয়ে নিচ্ছি। তুমি চুপ করে বসো। তোমাকে খুব জরুরি কিছু কথা বলা দরকার। মেঝের দিকে তাকিয়ে আছ কেন ? আমার দিকে তাকিয়ে কথা শোনো। জরুরি কথা শুনতে হলে চোখের উপর চোখ রাখতে হয়।

www.MurchOna.com

মরিয়ম চোখের উপর চোখ কীভাবে রাখবে ? তার কেমন জানি লাগছে। মানুষটার কোনো কথাই এখন তার কানে ঢুকছে না।

মরিয়ম শোনো, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে একটা লোভী মানুষ ভাবছ। কারণ তোমার বাবার কাছ থেকে আমি এগারো হাজার টাকা নিয়েছি। আমার কিছু ঋণ আছে যে ঋণ শোধ না করলেই না। তিন হাজার টাকা ঋণ। আর বাকি টাকাটা আমি নিয়েছি আমেরিকার টিকিট কেনার জন্যে। আমি একটা টিচিং এসিস্ট্যান্টশিপ পেয়েছি। স্টেট ইউনিভার্সিটি অব মোরহেড। নর্থ ডেকোটা। ওরা আমাকে মাসে চারশ' ডলার করে দেবে। তবে আমেরিকা যাবার টিকিটের টাকা দেবে না। টাকাটা এইভাবেই আমার জোগাড় করতে হয়েছে।

কবে যাবেন ?

কথাটা বলেই মরিয়মের ইচ্ছা করল নিজের গালে সে একটা চড় মারে। সে তো জসির মতোই আপনি শুরু করেছে।

নাইমুল বলল, আমার স্টুডেন্ট ভিসা হয়ে গেছে। এখন আমি যে-কোনো দিন যেতে পারি। আমি ব্যাপারটা কাউকে বলি নি, কারণ আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে আমার ভালো লাগে না। মরিয়ম শোনো, আমি অবশ্যই আমেরিকায় পৌঁছেই তোমার বাবার টাকাটা ফেরত পাঠাব। তোমাকে কথাটা বললাম যাতে তোমার মন থেকে মুছে যায় যে আমি একটা খারাপ মানুষ।

মানুষটা কথা বলা বন্ধ করে এখন তার দিকে তাকিয়ে আছে। অন্য সময় যে-কোনো পুরুষমানুষ তার দিকে তাকালে গা ঘিনঘিন করত। এখন এত ভালো লাগছে! ইশ, তার গায়ের রঙটা যদি আরেকটু ফরসা হতো!

মরিয়ম!

জি।

রান্না খুব ভালো হয়েছে, আমি খুব আরাম করে খেয়েছি। কে রেঁধেছেন, তোমার মা ?

জি।

আমি এখন চলে যাব। রাত অনেক হয়ে গেছে।

মরিয়ম নাইমুলকে চমকে দিয়ে হঠাৎ ঘর থেকে বের হয়ে গেল। যেন ভয়ঙ্কর জরুরি কোনো কাজ তাকে এই মুহূর্তেই করতে হবে।

সাফিয়া বারান্দায় বসে ছিলেন। বাবুকে মাসুমার কোলে দিয়ে এসেছেন। সারাদিনে খুব ধকল গেছে। তার নিজের শরীর এখন প্রায় নেতিয়ে পড়েছে। সাফিয়াকে চমকে দিয়ে মরিয়ম ঝড়ের মতো বারান্দায় এসে উপস্থিত হয়ে চাপা

www.MurchOna.com

গলায় বলল, মা, আমি উনাকে এত রাতে একা ছেড়ে দেব না। কোনো মতেই না।

মরিয়ম এসেছে যেমন ঝড়ের মতো কথাবার্তাও বলছে ঝড়ের মতো। সাফিয়া বুঝতেই পারছেন না প্রসঙ্গটা কী ? মরিয়ম বলল, মা, বাবাকে বলে ব্যবস্থা করো যেন উনি এখানে থাকতে পারেন। আমি অবশ্যই উনাকে একা ছাড়ব না। উনি যদি চলে যান, আমিও উনার সঙ্গে যাব।

এতক্ষণে সাফিয়া বুঝলেন এবং হেসে ফেললেন।

মরিয়ম কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, তুমি হাসছ কেন মা ? আমি হাসির কোনো কথা বলি নি। তুমি ব্যবস্থা করো। কীভাবে ব্যবস্থা করবে আমি জানি না।

সাফিয়া কোনো ব্যবস্থা করতে পারলেন না। মোবারক হোসেন মেয়েজামাইকে বিদেয় দিয়ে বারান্দায় এসে দেখলেন, বড় মেয়ে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, কী হয়েছে ? কাঁদছিস কেন ? জামাই পছন্দ হয় নাই ? আমি যা পেরেছি ব্যবস্থা করেছি। চোখ মুছ।

মরিয়ম চোখ মুছল।

যা ঘুমাতে যা। খবরদার চোখে যেন আর পানি না দেখি।

মরিয়ম চোখ মুছে তার ঘরের দিকে রওনা হলো।

www.MurchOna.com

মোবারক হোসেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। জোহর সাহেব এখানে কেন? শেখ সাহেবের বাড়িতে এই সকালে তিনি কেন? এখনো ভালোমতো সকাল হয় নি। ঘড়িতে বাজছে ছ'টা পাঁচ। ফজরের নামাজ যারা পড়ে, তারা ছাড়া এত ভোরে কেউ উঠে না। না-কি তিনি ভুল দেখছেন? এই ব্যক্তি জোহর না। এ অন্য কেউ। চেহারায় মিল আছে। সমিল চেহারার মানুষ প্রায়ই পাওয়া যায়। মোবারক হোসেন যতবার জোহর সাহেবকে দেখেছেন ততবার তাঁর মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি দেখেছেন। এই লোকের মুখ ক্লিন শেভড। তাছাড়া জোহর সাহেবের হাতে অবশ্যই জ্বলন্ত সিগারেট থাকত। এই লোকের হাতে সিগারেট নেই। পাতলা ঘিয়া রঙের চাদরে তার শরীর ঢাকা। তার দু'টা হাতই চাদরের নিচে। উনি নিশ্চয়ই চাদরের নিচে সিগারেট ধরান নি। ঘটনা কী? এই গরমে চাদর গায়ে উনি কেন এসেছেন?

এই ভোরবেলাতে শেখ সাহেবের বাড়িতে অনেক লোকজন। টঙ্গি থেকে শ্রমিকদের একটা দল এসেছে মাথায় লাল ফেট্টি বেঁধে। তারা ফজরের ওয়াক্তের আগে এসে 'জয় বাংলা' 'জয় বাংলা' বলে প্রচণ্ড স্লোগান শুরু করেছিল। মনে হয় তারা তাদের গলার সমস্ত জোর সঞ্চয় করে রেখেছে শেখ সাহেবের বাড়িতে একটা হুলুস্থুল করার জন্যে। স্লোগান শুনে ভয় পেয়ে কাকের দল উড়াউড়ি শুরু করল। মোবারক হোসেন তাদের দলপতির কাছে গিয়ে বললেন, শেখ সাহেব নামাজ পড়ছেন। এখন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন।

দলপতি (তার অত্যন্ত বলশালী চেহারা। মুখভর্তি পান। গলায় সোনার চেইন) রাগী গলায় বললেন, আপনি কে?

মোবারক হোসেন বললেন, আমি কেউ না।

'আমি কেউ না' বলাতে একটা রহস্য আছে। বলার ভঙ্গি সামান্য পরিবর্তন করে 'আমি কেউ না' বলেও বুঝিয়ে দেয়া যায়— আমি অনেক কিছু। মোবারক হোসেন সেটা বুঝিয়ে দিলেন।

দলপতি পানের পিক ফেলতে ফেলতে বললেন, আমি টঙ্গি শ্রমিক লীগের সভাপতি। আমার নাম ইসমাইল মিয়া। শেখ সাহেব আমারে চিনেন। আমার বাড়িতে একবার খানা খেয়েছেন।

মোবারক হোসেন বললেন, শুনে খুশি হলাম।

ইসমাইল মিয়া গলা সামান্য নিচু করে বললেন, টিফিনের কোনো ব্যবস্থা আছে ? আমরা কেউ নাশতা করি নাই।

টিফিনের কোনো ব্যবস্থা নাই।

শেখ সাব নিচে নামবেন কখন ?

সেটা তো ভাই উনি জানেন।

আপনি এখানকার কে ? কোন দায়িত্বে আছেন ?

আমি কোনো দায়িত্বে নাই। আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি— আমি কেউ না।

জোহরকে দেখা যাচ্ছে এই দলটির আশেপাশে ঘুরঘুর করতে। সে দু'বার তাকাল মোবারক হোসেনের দিকে। কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে মোবারক হোসেনকে চিনতে পারছে। তাহলে এমন কি হতে পারে যে, এই লোক জোহর না ? তার মতো চেহারার অন্য কেউ ?

মোবারক হোসেন এগিয়ে গেলেন। যা সন্দেহ করা হয়েছিল তাই। এই লোক জোহর। মোবারক হোসেনকে দেখে হাসল। পরিচিতের হাসি এবং আনন্দের হাসি। যেন হঠাৎ দেখা হওয়ায় খুশি হয়েছে।

মোবারক হোসেন বললেন, কেমন আছেন ?

জোহর বলল, ভালো।

এখানে কী জন্যে এসেছেন ?

দেখতে আসছি। কোনো বিহারি শেখ সাহেবকে দেখতে আসতে পারবে না, এমন আইন কি শেখ সাহেব পাশ করেছেন ?

এতক্ষণ হয়ে গেছে আপনাকে তো সিগারেট ধরাতে দেখলাম না।

শেখ সাহেবের বাড়িতে সিগারেট খাব! এত বড় বেয়াদবি তো করতে পারি না। আমি আর যাই হই বেয়াদব না।

গরমের সময় চাদর গায়ে দিয়ে এসেছেন কেন ?

জোহর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, যখন বের হয়েছিলাম তখন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব ছিল। তবে আপনি যা ভাবছেন তা-না। চাদরের নিচে কিছু নাই। চাদর খুলে দেখাতে হবে ?

দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ চোখ নামিয়ে নিচ্ছে না। মোবারক হোসেন বললেন, গরম বেশি, চাদর খুলে ফেললে ভালো হয়।

www.MurchOna.com

জোহরের ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা গেল। হাসি ফুটল না। তার আগেই নিভে গেল। তাকে দেখে মনে হলো, সে মোবারক হোসেনের কথায় খুব মজা পাচ্ছে।

যদি চাদর না খুলি তাহলে কি আমাকে চলে যেতে হবে ?

জি।

তাহলে চলেই যাই। চা খেতে ইচ্ছা করছে। আশেপাশে চায়ের দোকান আছে ?

আছে।

আমাকে নিয়ে চলেন, দু'জনে মিলে চা খাই। কোনো নেশাই একা একা করা যায় না। চা তো একরকম নেশাই, তাই না ?

চলেন যাই।

বত্রিশ নম্বর থেকে বের হয়ে দু'জন মিরপুর রোড পার হলো। ওপাশেই একটা নাপিতের দোকান। দোকানটা সবার চোখে পড়ে, কারণ সেখানে মজার একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে—

'মুজিবের বাড়ি যেই পথে
আমার দোকান সেই পথে।'

নাপিতের দোকানটা এখনো খোলে নি। তবে চায়ের দোকান খুলেছে। দশ-বারো বছরের একটা ছেলে পরোটা বেলছে। দুখু মিয়া টাইপ চেহারা। বড় বড় চোখ।

জোহর চায়ের দোকানে ঢুকেই গায়ের চাদর খুলে ফেলল, ভাঁজ করে কাঁধে রেখে মোবারক হোসেনের দিকে তাকিয়ে হাসল। শান্ত গলায় বলল, চাদরের নিচে যে কিছু নাই কথাটা কি বিশ্বাস হয়েছে ?

মোবারক হোসেন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

জোহর বলল, তার পরেও যদি বিশ্বাস না হয় গায়ে হাত দিয়ে দেখতে পারেন।

দেখতে হবে না।

আসুন চা নিয়ে রাস্তার পাশে বসে খাই। আপত্তি আছে ?

না, আপত্তি নাই।

রাস্তার পাশে দু'জন দাঁড়িয়ে আছে। জোহর সিগারেট ধরিয়েছে। সিগারেট ধরানোর কারণেই হয়তো তার চেহারায় উৎফুল্ল ভাব।

www.MurchOna.com

ইন্সপেক্টর সাহেব।

জি।

আপনাকে আগে একবার যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তান কখনো স্বাধীন হবে না। মনে আছে ?

মনে আছে।

আমার যুক্তি কি আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছিল ?

জি, মনে হয়েছে।

এখন আমি বুঝতে পারছি আমার যুক্তি ঠিক না। শেখ মুজিব যদি চান দেশ স্বাধীন হবে। কীভাবে বুঝলাম জানেন ?

না।

আপনাকে দেখে বুঝলাম। কোনো বাঙালির পক্ষে শেখ মুজিবের কোনো অনিষ্ট করা সম্ভব না। অনিষ্ট অনেক দূরের ব্যাপার, তাঁর কোনো ক্ষতির চিন্তা করার ক্ষমতাও বাঙালির নেই। এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে স্বাধীনতা ছাড়া উপায় কী ? একজন মানুষ কত দ্রুত এই অবস্থায় চলে গেছেন ভাবতেই বিস্মিত হতে হয়।

মোবারক হোসেন কিছু বললেন না। তাঁর চায়ের নেশা নেই, কিন্তু সকালের এই চা-টা তাঁর খেতে ভালো লাগছে।

ইন্সপেক্টর সাহেব!

জি।

আমি এখনো পাকিস্তানি শাসকদের চিন্তিত হবার মতো কিছু ঘটেছে বলে মনে করি না। শেখ মুজিব মধ্যবিত্তের নেতা, বুর্জোয়া নেতা। এ ধরনের নেতারা সরাসরি যুদ্ধের কথা ভাবেন না। এরা ঝামেলামুক্ত সমাধান চান। যেমন ধরেন ভারতের জওহরলাল নেহরু কিংবা মহাত্মা গান্ধী। এরা দেশ স্বাধীন করেছেন জেল খেটে। অসহযোগ আন্দোলন করে। কারণ এই দু'জনও বুর্জোয়া নেতা। সরাসরি যুদ্ধ এরা সমর্থন করেন নি। আপনাদের শেখ মুজিবও করবেন না। বুঝতে পারছেন কী বলছি ?

বোঝার চেষ্টা করছি। আমার বুদ্ধি কম। সহজে কিছু বুঝি না।

আমার ধারণা আপনাদের শেখ মুজিবের মাথায়ও গান্ধী-টাইপ চিন্তা-ভাবনা আছে। অসহযোগ আন্দোলন করে জেল টেল খেটে দেশ স্বাধীন করে ফেলা। পুরোপুরি স্বাধীন করা যদি সম্ভব নাও হয়, তাতেও আপাতত চলবে। কনফেডারেশন, ইউনাইটেড স্টেটস। পাকিস্তানের যে এই অবস্থা হবে, সেটা

www.MurchOna.com

কিন্তু তখনকার নেতারা ঠিকই বুঝেছিলেন। মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্ তো দুই পাকিস্তান হচ্ছে জেনে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন— 'পোকায় কাটা পাকিস্তান দিয়ে আমি কী করব ?'*

মোবারক হোসেন বললেন, মানুষ তো বদলায়।

জোহর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, অবশ্যই বদলায়। পরিস্থিতি মানুষকে বদলায়। ভয়াবহ ডাকাত হয়ে যায় নিজাম আউলিয়া। বিরাট সাধু সন্ত হয়ে যায় ভয়াবহ খুনি। সমস্যাটা এইখানেই। আপনার চা খাওয়া দেখে মনে হয়েছে আপনি খুবই আরাম করে চা খেয়েছেন। আরেক কাপ খাবেন ?

জি খাব।

বক্তৃতা শুনতে যাবেন না ?

কী বক্তৃতা ?

পল্টনে আজ মাওলানা ভাসানীর বক্তৃতা আছে। আমার ধারণা এটা হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা। শোনা দরকার।

মোবারক হোসেন বললেন, আমি বক্তৃতা শুনি না। বক্তৃতা শুনতে ভালো লাগে না। তাছাড়া আমার ডিউটি শেখ সাহেবের বাড়িতে। ডিউটির জায়গা ছেড়ে যেতে পারব না।

জোহর দ্বিতীয় সিগারেট ফেলে দিয়ে তৃতীয়টি ধরাতে ধরাতে বলল, আপনি আসলে কার ডিউটি করছেন বলুন তো ?

মোবারক হোসেন জবাব দিতে পারলেন না।

জোহর হালকা গলায় বলল, আপনি এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন না। কারণ জবাব আপনার নিজেরই জানা নেই। আমার জানা আছে। পুরো বাঙালি জাতি এখন একজনের ডিউটি করছে। সেই একজনের নাম শেখ মুজিব। আমি বিহারি না হয়ে বাঙালি হলে বিষয়টা এনজয় করতাম।

মোবারক হোসেন বত্রিশ নম্বর বাড়ির গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। আজ এই বাড়িতে অন্যদিনের চেয়েও অনেক ভিড়। লোক আসছেই। বাড়ির সামনের রাস্তাটা যেন নদী হয়ে গেছে। নদীতে মানুষের স্রোত। নদীতে যেমন ঢেউ উঠে এখানেও উঠছে। কখনো মানুষ বাড়ছে কখনো কমছে। মোবারক হোসেনের মানুষের এই প্রবল বেগবান স্রোত দেখতে ভালো লাগছে। হঠাৎ তাঁর মনে হলো তার তিন মেয়েকে নিয়ে এলে ভালো হতো। এরা হয়তোবা মজা পেত। এরা

*অর্ধেক জীবন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

www.MurchOna.com

কখনো ঘর থেকে বের হয় না। এ ধরনের দৃশ্য কখনো দেখে না। এত কাছে বাড়ি। একবার নিয়ে এলে হয়।

এই তুই কী করছিস ? আছিস কেমন ?

মোবারক হোসেন চমকে উঠলেন। শেখ মুজিব দল বল নিয়ে বের হচ্ছেন। বাড়ির সামনের রাস্তায় কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িতে উঠবেন। মোবারক হোসেনকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ হাসি হাসি।

স্যার, ভালো আছি।

তোর মেয়ে তিনটা ভালো আছে ? কী যেন তাদের নাম— মরিয়ম, মাসুমা, মাফরুহা ? নাম ঠিক হয়েছে ?

জি স্যার, ঠিক হয়েছে।

আজ মাওলানা ভাসানী পল্টনে বক্তৃতা করবেন। শুনতে যাবি না ? শুধু আমার কথা শুনলে হবে ? অন্যদের কথাও শুনতে হবে।

শেখ মুজিব এগিয়ে গেলেন। মোবারক হোসেন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তাঁর তিন মেয়ের নাম এই মানুষটা একবার মাত্র শুনেছেন। এখনো নাম মনে আছে। এই ক্ষমতাকে শুধু বিস্ময়কর বললেও কম বলা হয়।

মাওলানা ভাসানীর বক্তৃতা শোনার কোনো আগ্রহ মোবারক হোসেন বোধ করছেন না। তারপরেও তিনি বক্তৃতা শুনতে গেলেন। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, তিনি তাঁর দুই মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। তিনজনকেই নেবার শখ ছিল। বড়টিকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। সে কাউকে কিছু না বলে কোথায় না-কি গেছে। মোবারক হোসেন ঠিক করে রেখেছেন, এ ধরনের কর্মকাণ্ডের উচিত শাস্তি সে পাবে। যথাসময়ে পাবে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, তাতে কী ? মেয়ে তো এখনো তাঁর সঙ্গে থাকে। যতদিন মেয়ে তাঁর বাড়িতে থাকবে, ততদিন তাকে বাড়ির নিয়মকানুন মানতে হবে।

মাসুমা এবং মাফরুহা দু'জনেই ভয়ে অস্থির। বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ায় কোনো আনন্দ নেই। 'আমরা কোথাও যাব না' বলাও সম্ভব না। দু'জনেই খুব মন খারাপ করে বাড়ি থেকে বের হলো। তারা খানিকটা ভয়ও পাচ্ছে। বাবা বলেন নি তাদের কোথায় নেয়া হচ্ছে। বাবাকে জিজ্ঞেস করে জানবে সেই সাহসও তাদের নেই।

মোবারক হোসেন রিকশা নিলেন। ছোট মেয়েটিকে বসালেন নিজের কোলে। মাফরুহাকে দেখে মনে হচ্ছে সে লজ্জায় মরে যাচ্ছে। কেঁদেই ফেলত, অনেক কষ্টে সে চোখের জল আটকে রাখছে।

www.MurchOna.com

মোবারক হোসেন বললেন, হাতে এখনো সময় আছে, তোরা আইসক্রিম খাবি ?

দু'জনই চাপা গলায় বলল, না।

খাবি না কেন ? আয় আইসক্রিম কিনে দেই।

মোবারক হোসেন বেবি আইসক্রিমের দোকানে গিয়ে দু'মেয়েকে আইসক্রিম কিনে দিলেন। দু'জনই খুবই আগ্রহের সঙ্গে আইসক্রিম খাচ্ছে। দেখতে ভালো লাগছে। মোবারক হোসেন সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, শেখ সাহেব তোদের তিন বোনেরই নাম জানেন। আজকেও তোদের কথা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। তোরা কেমন আছিস জানতে চাইলেন।

মাসুমা ভয়ে ভয়ে বলল, আমাদেরকে উনি কীভাবে চেনেন ?

মোবারক হোসেন বললেন, সে বিরাট ইতিহাস। জানার দরকার নাই। তাড়াতাড়ি আইসক্রিম শেষ কর। বক্তৃতা শুরু হয়ে গেছে।

মাসুমা অবাক হয়ে বলল, কিসের বক্তৃতা ?

মোবারক হোসেন জবাব দিলেন না। মেয়েদের সঙ্গে এত কথা বলতে তাঁর ভালো লাগে না।

পল্টনের মাঠের জনসমুদ্রে মাওলানা বললেন—

> তের বছর আগে কাগমারী সম্মেলনে আমি আসসালামু আলাইকুম বলেছিলাম। মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হয়েও সেদিন আমার কথা অনুধাবন করতে পারেন নাই। কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে দুই অংশ যদি একত্রে থাকে তাহলে কালব্যাধি যক্ষ্মার জীবাণু যেমন দেহের হৃৎপিণ্ডের দুই অংশকে নিঃশেষ করে দেয়, তেমনি পাকিস্তানের দুই অংশই বিনষ্ট হবে। তাই বলছিলাম যে তোমরা তোমাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করো এবং আমরা আমাদের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করি। 'লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন।' শেখ মুজিবর রহমান আজ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে। আমি সাত কোটি বাঙালিকে আজ মোবারকবাদ জানাই এ জন্যে যে তারা এই বৃদ্ধের তের বছর আগের কথা এতদিন পর অনুধাবন করতে পেরেছে।*

---

* *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড*
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়।

মাওলানা ভাসানী যখন বক্তৃতা দিচ্ছেন তখন মরিয়ম পুরনো ঢাকায়। সে আগামসি লেনের একটা ঠিকানা খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিছুতেই পাচ্ছে না। ভয়ে সে অস্থির। একা একা এর আগে সে কখনো কোথাও যায় নি। অচেনা একটা জায়গায় ঠিকানা খুঁজে বেড়ানোর তো প্রশ্নই আসে না। সে খুঁজছে নাইমুলের বাসা। বিয়ের পর এই যে সে চলে গেল আর তার কোনো খোঁজ নেই। বাসার মানুষগুলিও যেন কেমন! তারাও তো খোঁজখবর করবে। এখন সময় ভালো না, চারদিকে আন্দোলন হচ্ছে। তার কিছু হয়েছে কি-না কে জানে।

মরিয়ম ঠিক করে রেখেছে, আজ সে মানুষটাকে সাথে করে নিয়ে যাবে। বাসার মানুষজন যার যা ইচ্ছা বলুক কিছুই যায় আসে না। বাবা যদি পিস্তল বের করে তাকে গুলি করে দেন তাহলে দেবেন, কিন্তু মানুষটাকে সে এখানে ফেলে রেখে যাবে না।

বেচারা একা একা থাকে। হোটেলে খায়। কেন সে হোটেলে খাবে? দিনের পর দিন হোটেলের খাবার খেলে কি শরীর ঠিক থাকবে? শরীর যদি খারাপ হয় তাহলে তো মরিয়মকেই সেটা দেখতে হবে। আর কে দেখবে?

সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে গুণ্ডাটাইপ একটা গোঁফওয়ালা ছেলে সঙ্গে এসে বাসা দেখিয়ে দিল। ঢাকাইয়া ভাষায় বলল, নাইমুল ছাব এই চিপায় থাকে। ডাক দেন— আওয়াজ দিব।

মরিয়ম নিশ্চিত যে সে একটা ফাঁদে পড়েছে। এরকম একটা জঘন্য জায়গায় নাইমুল থাকতেই পারে না। এই গুণ্ডাটা ভুলিয়ে ভালিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। এক্ষুনি সে ধাক্কা দিয়ে মরিয়মকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেবে। মরিয়ম কাঁপতে কাঁপতে দরজার কড়া নাড়ল। তার এক চোখ গুণ্ডাটার দিকে। গুণ্ডাটা চলে যায় নি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

দু'বার কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে নাইমুলের গম্ভীর গলা শোনা গেল— মরিয়ম চলে এসো, দরজা খোলা।

শুধু কড়া নাড়ার শব্দ শুনে একটা লোক কী করে বুঝল কে এসেছে— এই রহস্য মরিয়ম কখনো ভেদ করতে পারে নি। নাইমুল কখনো বলে নি।

www.MurchOna.com

চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে আসমানী হাসিমুখে বলল, এই শোনো, তোমাকে একটু দোকানে যেতে হবে।

আসমানী তার স্বভাবমতো ভোরবেলা গোসল করেছে। ধোয়া একটা শাড়ি পরেছে। কপালে টিপ। খুব সম্ভব চোখে হালকা করে কাজলও দিয়েছে। সুন্দর লাগছে তাকে। আসমানী বলল, এই, কথা বলছ না কেন?

শাহেদ ভুরু কুঁচকে চায়ের কাপে চুমুক দিল। তার সামনে দুটা পত্রিকা—দৈনিক পাকিস্তান, ইত্তেফাক। দৈনিক পাকিস্তানের ভাঁজ এখনো খোলা হয় নি। পত্রিকার পাতায় পাতায় আগুনগরম সব খবর। এখন স্ত্রীর কথা শোনা তেমন জরুরি না। দোকানে যাওয়াটাও জরুরি না। কাগজ পড়া শেষ হোক, তারপর দেখা যাবে।

আসমানী শাহেদের পাশে বসতে বসতে বলল, চট করে চা-টা খেয়ে নাও।

আসমানীকে আজ অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি হাসিখুশি লাগছে। তার কারণ স্পষ্ট নয়।

শাহেদ চায়ের কাপে চুমুক দিল। মিষ্টি কম হয়েছে। আরেকটু চিনি দাও—এই কথাটা বলতেও আলসেমি লাগছে। মনে হচ্ছে চিনির কথাটা বললেও সময় নষ্ট হবে। *দৈনিক পাকিস্তান*-এর প্রথম পাতায় সুন্দর একটা ছবি ছাপা হয়েছে। কালো পতাকা উড়িয়ে শেখ মুজিবুর রহমান যাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ভবনে, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক। বৈঠকে কী হলো না হলো পত্রিকায় নিশ্চয়ই তার বিস্তারিত বিবরণ আছে।

তুমি এখন পত্রিকায় হাত দিও না। পড়তে শুরু করলে তুমি এক ঘণ্টার আগে উঠবে না। চা-টা শেষ করে তোমাকে একটু দোকানে যেতে হবে। শেখ মুজিব এবং ইয়াহিয়ার বৈঠকের চেয়েও এটা অনেক বেশি জরুরি।

তাই না-কি?

হ্যাঁ তাই। শেখ মুজিব ভাববেন তাঁর দেশ নিয়ে, আমি ভাবব আমার সংসারের তেল-চিনি নিয়ে।

দেশটা তোমার না ?

আমার কাছে আগে আমার সংসার। তারপর দেশ।

কঠিন কিছু কথা শাহেদের মুখে এসে গিয়েছিল। সে নিজেকে সামলালো। সকালবেলাটা তিক্ততার জন্যে ভালো না। সে পত্রিকায় মন দিল।

আসমানী হাত বাড়িয়ে পত্রিকা দুটা নিয়ে নিল। শাহেদের মাথায় চট করে রক্ত উঠে গেল। সে নিজেকে সামলে সিগারেট ধরাল। এখন সে একটা ঝগড়া শুরু করতে চায় না। ঝগড়া করার সময় অনেক পাওয়া যাবে। আপাতত যা করতে হবে তা হচ্ছে, কায়দা করে পত্রিকা দুটা নিয়ে নিতে হবে। এমনভাবে নিতে হবে যেন আসমানী টের না পায়। এই মুহূর্তে পত্রিকা পড়ার প্রতিই তার আগ্রহটা অনেক বেশি। স্ত্রীরা স্বামীর যে-কোনো বিষয়ের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহকেই সন্দেহের চোখে দেখে।

আসমানী শাহেদের পিঠে হাত রেখে বলল, দোকানে যাওয়া ছাড়াও তোমাকে কাঁচাবাজারেও যেতে হবে, ঘরে কোনো বাজার নেই। চাল-ডাল সব কিনতে হবে। সবাই খাবার কিনে ঘরে জমা করে রাখছে। শুধু আমাদের ঘরে কিছু নেই।

শাহেদ অনাগ্রহের মতো ভঙ্গি করে বলল, দেখি কাগজটা ?

আসমানী বলল, এখন কাগজ পাবে না। দোকানে যাবে, কাঁচাবাজারে যাবে; তারপর কাগজ। কাগজ পালিয়ে যাচ্ছে না।

শাহেদ রাগ চাপতে চাপতে বলল, দোকান এবং কাঁচাবাজারও পালিয়ে যাচ্ছে না।

আসমানী বলল, আচ্ছা, তোমার প্রতি সামান্য দয়া করলাম। কাঁচাবাজারে পরে যাবে। দোকান থেকে ঘুরে আসো। রুনির জন্য দুনম্বরি খাতা কিনতে হবে। সে ছবি আঁকবে, তারপর নাশতা খাবে। নাশতা না খেয়ে বসে আছে। তোমার মেয়ে যে কী পরিমাণ মেজাজি হয়েছে! আমার ধারণা, সে মেজাজ পেয়েছে তোমার কাছ থেকে। যা বলবে তাই করবে। তোমার চা খাওয়া শেষ হয়েছে না ? এখন ওঠো। মেয়ে ঘুম থেকে উঠেছে সাতটার সময়, এখন বাজছে দশটা। কিচ্ছু মুখে দেয় নি।

শাহেদ ঝামেলা করল না। উঠে দাঁড়াল, শার্ট গায়ে দিল। আসমানী বলল, তোমাকে কাগজ পড়তে না দেওয়ার জন্য আমার নিজেরই খারাপ লাগছে, তবে দোকান থেকে ফিরেই দেখবে গরম চা এবং চায়ের কাপের পাশে ভাঁজ করা পত্রিকা। ভালো কথা, খাতা যে আনবে খাতার কভারে হাতির ছবি থাকতে হবে। হাতির ছবি ছাড়া খাতা আনলে চলবে না। তোমার মেয়ে কী চিজ হয়েছে, তুমি তো জানো না। হাতির ছবির কথা মনে থাকে যেন।

মনে থাকবে।

মুখটা এমন প্যাঁচার মুখের মতো করে রেখেছ কেন ? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া। পাকিস্তানের সমস্যায় হতাশ, বিরক্ত ও ক্লান্ত। আমি লক্ষ করেছি ভোরবেলাতেই তোমার মেজাজ থাকে বেশি খারাপ। ইয়াহিয়া সাহেব! হিজ এক্সিলেন্সি! আজ কি অফিসে যাবে ?

না।

ভালো হয়েছে। আজ তাহলে তুমি রুনির মাথা কামিয়ে দেবে। ছোটবেলায় কয়েকবার মাথা না কামালে চুল ঘন হয় না। একটা রেজার ব্লেড এনো তো। এক বোতল ডেটল। মাথা কেটে গেলে দিতে হবে।

আর কী কী লাগবে একসঙ্গে বলো।

আর কিছু লাগবে না। দোকানে ভালোবাসা কিনতে পেলে তোমাকে সের খানেক ভালোবাসা কিনতে বলতাম। ইদানীং তোমার মধ্যে এই জিনিসের সাংঘাতিক অভাব দেখছি। ভালো কথা, চা পাতা নেই, চা পাতা আনতে হবে। প্লাস চিনি। এই দুটা যদি না আন তাহলে চা পাতা এবং চিনি ছাড়া চা খেতে হবে।

কিছু বাকি পড়ল কি-না আবার মনে করে দেখ। তাঁতের মাকুর মতো আমি দোকান-বাসা, দোকান-বাসা করতে পারব না।

আর কিছু লাগবে না। ভালো কথা, তুমি যখন খুব রেগে যাও তখন তোমার চেহারা কিন্তু খানিকটা ইয়াহিয়া খানের মতো হয়ে যায়। ঠাট্টা করছি না। অনেস্ট। যে জায়গায় তোমরা গোঁফ রাখ, তোমার সেই জায়গাটা ইয়াহিয়া খানের মতোই বড়। আচ্ছা গোঁফ রাখার জায়গাটার নাম যেন কী ?

জানি না।

কী আশ্চর্য, যেখানে তোমরা এত কায়দা করে গোঁফ রাখ তার নামও জানো না।

শাহেদ বিরক্ত গলায় বলল, অকারণে এত কথা বলছ কেন ? তুমি তো মাথা ধরিয়ে দিচ্ছ।

খাতা, চা, চিনি, রেজার ব্লেড নিয়ে শাহেদ মিনিট দশেকের মধ্যে ফিরে এলো। আসমানী বলল, তোমাকে না বললাম হাতির ছবি মার্কা খাতা কিনতে। এই খাতা দেখেই তো তোমার মেয়ে কাঁদতে শুরু করবে।

হাতিমার্কা খাতা ছিল না।

থাকবে না কেন ? ছিল তো বটেই। তুমি বলতে ভুলে গেছ। যা দিয়েছে তাই নিয়ে চলে এসেছ। প্লিজ, খাতাটা বদলে আন।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

শাহেদ সার্ট খুলতে খুলতে বলল, বদলাতে পারব না। যা এনেছি তাই তোমার মেয়েকে দাও। আদর দিয়ে দিয়ে তুমি মেয়েটাকে নষ্ট করছ। জগতের নিয়ম হচ্ছে, কোনো জিনিস চাইলেই পাওয়া যায় না। অথচ তোমার মেয়ের ধারণা হয়েছে, যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। হাতি মার্কা খাতা চেয়েছে, হাতি মার্কা খাতা দিতে হবে। বাঘ মার্কা চাইলে বাঘ মার্কা। এসব কী ?

তুমি এমন চোখ বড় বড় করে আমার সঙ্গে কথা বলছ কেন ?

জন্ম থেকেই আমার চোখ বড়। এই জন্য চোখ বড় বড় করে কথা বলছি। তুমিই বা সরু চোখে তাকিয়ে আছ কেন ? সরু চোখে তাকিয়ে থাকার মতো অপরাধ কি করেছি ?

মেয়ে যখন কেঁদে বাসা মাথায় তুলবে, তখন কী করবে ?

ওকে বুঝিয়ে বলো। বুঝিয়ে বললেই কেঁদে বাড়ি মাথায় তুলবে না। শিশুরা লজিক বুঝতে পারে। সমস্যা বড়দের নিয়ে। বড়রা লজিক বুঝতে চায় না।

তাহলে দয়া করে তোমার বিখ্যাত লজিক দিয়ে ওকে বোঝাও।

শাহেদ খবরের কাগজ নিয়ে বসল। আসমানী কিছুক্ষণ স্বামীর দিকে তাকিয়ে রুনির কাছে গেল। এবং তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রুনীর আকাশ ফাটানো চিৎকার শোনা যেতে লাগল। ভয়াবহ চিৎকার। মনে হচ্ছে বাড়িঘর ভেঙে পড়বে। চিৎকার অগ্রাহ্য করে কাগজে মন দেয়া যাচ্ছে না। শাহেদের মেজাজ দ্রুত খারাপ হচ্ছে। ইচ্ছা করছে উঠে গিয়ে মেয়েটার গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়। এটাও করা যাবে না। তাহলে সারাদিন আসমানী মুখ ভোঁতা করে রাখবে। সন্ধ্যাবেলা দেখা যাবে মেয়েকে নিয়ে মা'র বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে। শাহেদ ডাকল, রুনি মা, শুনে যাও তো। রুনি সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল।

কেন কাঁদছ গো মা ?

বাবা, ছবি আঁকব।

ছবি আঁকবে সেটা তো খুবই ভালো কথা। আঁকো। তোমার জন্য তো খাতা কিনে এনেছি। একটা কেনার কথা ছিল, দুটা কিনেছি।

হাতির ছবির খাতা লাগবে। এই খাতায় আঁকব না। এই খাতা পচা।

হাতির ছবির খাতা দোকানে ছিল না, তাই আনা হয় নি। আমি আবার যখন বের হবো তখন নিয়ে আসব।

না, আমার এখনি লাগবে।

চাইলেই সব কিছু পাওয়া যায় না মা।

পাওয়া যায়।

www.MurchOna.com

না, পাওয়া যায় না।

পাওয়া যায়।

এরকম করে কথা বলবে না রুনি। এরকম করে কথা বললে আমার মেজাজ খুব খারাপ হবে। হঠাৎ দেখা যাবে তোমার গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছি।

না তুমি চড় বসাবে না।

তুমি কিন্তু আমার মেজাজ খুব খারাপ করছ রুনি। এখন লক্ষ্মী মেয়ের মতো যাও, ছবি আঁকো, আমি কাগজ পড়ি।

না, তুমি কাগজ পড়বে না।

রুনি হাত বাড়িয়ে খবরের কাগজ টেনে নিল এবং শাহেদের কিছু বলার আগেই ছিঁড়তে শুরু করল। রুনির মুখ গম্ভীর। তাকে দেখে মনে হচ্ছে কাগজ ছেঁড়ার এই কাজটি সে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে করছে। শাহেদের অধিক শোকে পাথর হওয়ার মতো ব্যাপার হলো। সে মেয়ের কাগজ ছেঁড়া দেখল। শোকের প্রবল ধাক্কাটা কমে যাওয়ার পরপরই মেয়ের গালে চড় বসিয়ে দিল, রুনি সারা বাড়ি কাঁপিয়ে চিৎকার করতে লাগল। আসমানী ছুটে এসে মেয়েকে তুলে নিয়ে গেল। শাহেদের মনটা হলো খারাপ। ইচ্ছে করলে ছেঁড়া কাগজগুলো হাতে নিয়ে পড়া যায়। ইচ্ছা করছে না। মেয়েটার গালে আরেকটা চড় দিতে ইচ্ছা করছে। মনে হচ্ছে আগেরবারেরটা তেমন জোরালো হয় নি।

রুনির কান্না থেমে গেছে। জোরালো চড় হলে এত সহজে কান্না থামত না। বাসা থেকে কিছুক্ষণের জন্য দূরে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করছে। কাঁচাবাজারে যাওয়া যেতে পারে। চাল-ডাল-তেল-নুন আসলেই কিনে রাখা দরকার। সবাই কিনেছে। সে কেন কিনবে না? কয়েক কার্টুন সিগারেট। যুদ্ধের সময় সবচে' দুষ্প্রাপ্য হয় সিগারেট।

আসমানী রুনিকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকল। ভীত গলায় বলল, দেখ তো দেখ তো ওর মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। রুনি, হা করো তো মা। হা করো।

রুনি হা করল। আসলেই মুখভর্তি রক্ত। আসমানী হতভম্ব গলায় বলল, কী করেছ তুমি মেয়ের?

শাহেদ অপ্রস্তুত গলায় বলল, গালটাল কোথায়ও কেটে গেছে। এত অস্থির হওয়ার মতো কিছু হয় নি। দেখি, ওকে আমার কোলে দাও।

না, আমি আমার মেয়েকে তোমার কোলে দেব না। তুমি কোন সাহসে আমার মেয়েকে কোলে নিতে চাও?

আসমানী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। রুনি হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বাবার কোলে যাবার জন্য। শিশুরা অতি সহজে অন্যের অপরাধ ক্ষমা করতে পারে।

www.MurchOna.com

শাহেদ বলল, কোথায় কেটেছে একটু দেখি। দরকার হলে একজন ডাক্তার দেখিয়ে আনি।

তোমাকে কিছুই করতে হবে না। খবরদার, তুমি আমার মেয়েকে কোলে নেবে না। খবরদার তুমি আমার মেয়েকে ছোঁবে না।

তুমি এমন ভেউ ভেউ করে কাঁদছ কেন ? তোমার মেয়ে তো কাঁদছে না। এই দেখ, রক্ত পড়াও বন্ধ হয়েছে। আর রক্ত পড়ছে না।

আসমানী কাঁদতে কাঁদতেই মেয়ে কোলে নিয়ে পাশের কামরায় চলে গেল। শাহেদের মন এমনই খারাপ হলো যে তার নিজেরও কাঁদতে ইচ্ছা করল। দিনটা সুন্দরভাবে শুরু হয়ে হঠাৎ কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। তার আর ঘরে চুপচাপ বসে থাকার কোনো মানে হয় না। সবচেয়ে ভালো হয় কিছুক্ষণ বাইরে কাটিয়ে এলে। অফিসে যাওয়া যেতে পারে। অফিস থেকে ফেরার পথে বাজার করে আনলে আসমানীর রাগ হয়তো কিছু কমবে। মেয়েটার জন্য গাদাখানিক হাতির ছবি আঁকা খাতা আনতে হবে। আর একটা ঘুড়ি কিনতে হবে। কবে যেন ঘুড়ির কথা বলছিল।

অফিসে শাহেদের সময়টা খুব খারাপ কাটল। খাঁ-খাঁ করছে অফিস। বলতে গেলে কেউ আসে নি।

অফিসের পিওন রুস্তম টুলে বসে ঝিমুচ্ছে। চোখ মেলে একবার সে শাহেদকে দেখল। উঠে দাঁড়াচ্ছে— এমন ভঙ্গি করে আবারো চোখ বন্ধ করে ঝিমাতে লাগল।

ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্স কোম্পানি। একসময় লোকজন গমগম করত। আজ মাছি উড়ছে। যে-সব কোম্পানির মালিক অবাঙালি তার সবগুলোরই এই অবস্থা। মালিকরা অফিসে আসা বন্ধ করেছেন। অফিসে মাছি উড়া শুরু হয়েছে।

ক্যাশিয়ার নিবারণ বাবু বললেন, আজ অফিসে এসেছেন কেন ? আজ জোর গুজব শহরে আর্মি নামবে। শেখ সাহেব আর ইয়াহিয়ার বৈঠক বানচাল হয়ে গেছে। সবাই এখন ঘর সামলাতে ব্যস্ত, আপনি কেন অফিসে ?

শাহেদ বলল, আপনিও তো অফিসে।

আমার ঘরে কিছু করার নেই। ফ্যামিলি দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি। কাজেই চলে এসেছি। আপনাদের সঙ্গে গল্পগুজব করব।

বেশ তো করুন গল্পগুজব।

নিবারণ সাহেব অনেক ধরনের মজার মজার গল্প করলেন। এর মধ্যে ভৌতিক গল্পও আছে। তার কাকার শ্রাদ্ধের দিন না-কি সবাই দেখেছে অবিকল

www.MurchOna.com

তার কাকার মতো দেখতে এক লোক শোবার ঘরের খাটে বসে আছে। লোকটা সম্পূর্ণ নগ্ন। শুধু গলায় পৈতা। শাহেদের কোনো গল্পই তেমন মজা লাগল না। নিবারণ বাবু ঝুঁকে এসে বললেন, আপনাকে খুব চিন্তিত লাগছে। ভাবিকে দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। তাহলে দেখবেন আমার মতো হয়ে যাবেন। চিন্তাভাবনাহীন লাট্টু মিয়া। যখন ইচ্ছে বনবন করে ঘুরবো।

শাহেদ বলল, উঠি।

আরো কিছুক্ষণ বসুন, গল্প করি। চা খাবেন? চা আনিয়ে দেই।

না, চা খাব না।

কেন খাবেন না! চা খান। বি হ্যাপী।

শাহেদ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আপনি অফিসে কতক্ষণ থাকবেন?

নিবারণ বাবু আনন্দিত গলায় বললেন, আমি তো অফিসেই থাকি। বিছানা বালিশ নিয়ে চলে এসেছি। অফিস হলো এখন সবচে' নিরাপদ জায়গা।

একটার দিকে শাহেদ অফিস থেকে বের হলো।

মনে হচ্ছে শহর কোনো উৎসবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দেওয়া হচ্ছে। শাহেদের সামনেই হাজার হাজার মানুষ মহা-উৎসাহে পুরনো একটা বাস ঠেলতে ঠেলতে এনে রাস্তায় শুইয়ে দিল। এরা কার বাস নিয়ে এসেছে কে জানে! শেখ সাহেব কি রাস্তা ব্যারিকেড দেওয়ার কোনো নির্দেশ দিয়েছেন? তাঁর নির্দেশ ছাড়া তো এখন কিছুই হয় না। অফিস চলছে তাঁর নির্দেশে। ব্যাংক চলছে তাঁর নির্দেশে।

২৩ মার্চ, পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে কোথাও পাকিস্তানি পতাকা উড়ে নি। শুধু তিনটা জায়গায় পতাকা উড়েছে— প্রেসিডেন্ট ভবনে যেখানে ইয়াহিয়া থাকেন, গভর্নর ভবনে এবং এয়ারপোর্টে। ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশন এবং সোভিয়েত কনস্যুলেটে উড়েছে বাংলাদেশী পতাকা। চীন, ইরান, ইন্দোনেশিয়া এবং নেপাল পাকিস্তানি পতাকা তুললেও জনতার চাপে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছে। আমেরিকান দূতাবাস অবশ্যি কোনো ঝামেলায় যায় নি। তারা কোনো পতাকাই উড়ায় নি। ভয়াবহ কাণ্ডটা করেছে ইপিআর। তারা যশোহর সদর দপ্তরে উড়িয়েছে বাংলাদেশী পতাকা।*

সে-রাতে টিভি অনুষ্ঠান শেষ হবার পর পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত 'পাক সার যামিন শাদ বাদ' ঠিকই বাজানো হয়েছে, কিন্তু পাকিস্তানি পতাকা দেখানো হয় নি।

---

* *বাংলাদেশের তারিখ*, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।
৭১-এর দশমাস, রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী।

www.MurchOna.com

লক্ষণ ভালো না। লক্ষণ খুবই খারাপ। পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী এত কিছু দেখার পরেও চুপ করে থাকবে, কিছু বলবে না— তা হতেই পারে না। ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে যাচ্ছে তো বটেই। সেটা কবে ঘটবে ?

বাসায় ফিরতে ইচ্ছা করছে না। কী করা যায় ? কী করা যায় ? নাইমুলের কাছে গেলে কিছুটা সময় কাটে। সে বিয়ে করেছে— এই খবরটা পেয়েছে। বিয়ের পর তার সাথে দেখা হয় নি। নাইমুলকে যে মেয়ে বিয়ে করেছে, সে খুবই ভাগ্যবতী। এই খবরটা মেয়েকে দিতে ইচ্ছা করছে। শাহেদ ঠিক করল, নাইমুলকে পেলে তাকে নিয়ে সে তার শ্বশুরবাড়ি যাবে। নাইমুলের স্ত্রীকে বলবে, ভাবি, কী অসাধারণ একটি ছেলেকে আপনি স্বামী হিসেবে পেয়েছেন জানেন না। আমি জানি। নাইমুল অনেক তুচ্ছ জিনিস নিয়ে আপনার সঙ্গে রাগারাগি করবে। আপনাকে বিরক্ত করবে। সব আপনি সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করে দেবেন। কারণ এই ছেলে খাঁটি হীরা। তার মধ্যে কোনো ভেজাল নেই। আপনি যদি চান, আপনাকে লিখিতভাবে দিতে পারি।

নাইমুলকে পাওয়া গেল না। ঘর তালাবন্ধ। তবে তালার সঙ্গে সেঁটে দেয়া একটা ছোট্ট চিরকুটে লেখা—

যার জন্যে প্রযোজ্য

কিছুদিন ঘরজামাই জীবনযাপন করছি। আমার নতুন ঠিকানা— ১৮নং সোবাহানবাগ (দোতলা), মিরপুর রোড। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কেউ যেন আমার কাছে না আসে।

শাহেদ নোট পড়ে হাসল। মনে মনে ঠিক করল, আসমানীর রাগ ভাঙিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যার পর উপস্থিত হবে নাইমুলের শ্বশুরবাড়িতে।

শাহেদ বাসায় ফিরল দুটার দিকে। কাঁচাবাজার ছাড়াই ফিরল। কী কী লাগবে তার লিস্ট আসমানীর কাছ থেকে নেয়া হয় নি। তবে সে ছটা হাতিমার্কা খাতা কিনল। একবাক্স রঙ-পেনসিল কিনল। আসমানীর রাগ ভাঙানোর জন্যে সে কিনল একটা রাগভাঙানি-শাড়ি। শাড়ির রঙ অবশ্যই আসমানী। রাজশাহী সিল্কের শাড়ি। শাড়ি হাতে নিলেই আসমানীর রাগ অনেকখানি কমবে। শাড়ির সঙ্গে লেখা নোটটা পড়লে এতটুকু রাগও থাকবে না। নোটে লেখা— 'জান গো! কেন এমন করো ?'

বাসায় তালা দেওয়া। শাহেদ এতে তেমন বিস্মিত হলো না। তার মনে ক্ষীণ আশঙ্কা ছিল, বাসায় ফিরে এরকম কিছু সে দেখবে। ঘরে তালা দিয়ে আসমানী রাগ করে চলে যাবে কলাবাগানে তার মা'র কাছে।

আসমানী কলাবাগানে ছিল না। শাহেদের শাশুড়ি বিরক্ত গলায় বললেন, শহরের অবস্থা এত খারাপ, এর মধ্যে আসমানী বের হলো কেন ? রোজ রোজ কী নিয়ে তোমাদের এত ঝগড়া ? আমি আমার মেয়ের উপর যেমন রাগ করছি, তোমার উপরও রাগ করছি। এখন যাও তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করো ও কোথায়। তুমি তো বাবা আমাকে মহা-দুশ্চিন্তায় ফেললে। শহরের অবস্থা এত খারাপ, এর মধ্যে এই খবর...

শাহেদ নানান জায়গায় ওদের খুঁজল। কোনোরকম সন্ধান পাওয়া গেল না। শাড়িটা সে রেখে এসেছে তার শাশুড়ির কাছে। এটা নিয়েও সে দুশ্চিন্তা করছে। শাশুড়ি যদি নোটটা পড়ে ফেলেন, তাহলে খুব লজ্জার ব্যাপার হবে। রাত অনেক হয়েছে। ঘড়ি নেই বলে কত রাত তা বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তাঘাটে লোক-চলাচল একেবারেই বন্ধ। রিকশাও চলছে না। কিছুদূর পরপরই রাস্তায় এমন ব্যারিকেড দেওয়া, রিকশা চলার প্রশ্নও আসে না।

শাহেদ হেঁটে হেঁটে ফিরছে, এই সময় শহরে মিলিটারি নামল। রাতটা হলো ২৫ মার্চ, ১৯৭১।

www.MurchOna.com

আকাশে ট্রেসার উড়ছে। আকাশ আলো হয়ে উঠছে। তৈরি হচ্ছে আলোর নকশা। যেন বারবার কালো আকাশে ঝলমলিয়ে উঠছে উৎসবের হাউই বাতি। তারাবাতির মতো আগুনের ফুলকি বেরুচ্ছে মেশিনগানের মুখ থেকে। বাজির শব্দের মতো গুলি। উৎসব। অন্য ধরনের উৎসব। হত্যা ও ধ্বংসের উৎসব। এই উৎসবের জন্যে কেউ কি তৈরি ছিল ? ঢাকার ঘুমন্ত মানুষ ভয়াবহ আতঙ্ক নিয়ে জেগে উঠল। কী হচ্ছে ? কী হচ্ছে ?

সবাই জানে কী হচ্ছে। তারপরেও যেন কেউ কিছু জানে না। ভারী মিলিটারি ট্রাক, মিলিটারি জিপ অবলীলায় রাস্তায় চলাচল করছে। সবকটি রাস্তায় না বেরিকেড ছিল ? এরা এত দ্রুত বেরিকেড সরালো কীভাবে ? অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে রাস্তায়। ট্যাংক নেমেছে নাকি ? ট্যাংক চললে রাস্তায় এমন অদ্ভুত শব্দ হয় ? একটানা যে ট্যা ট্যা শব্দ হচ্ছে সেই শব্দ কিসের ? তার চেয়েও বিচিত্র আরেক ধরনের শব্দ হচ্ছে— শোঁ শোঁ হুস হুইইই।

ভয় এবং কৌতূহল বোধহয় পাশাপাশি চলে। প্রচণ্ড ভীত মানুষের কৌতূহলও হয় প্রচণ্ড। এরা জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়েছে। দেখতে চেষ্টা করছে কী হচ্ছে বাইরে। কেউ কেউ চলে এসেছে বারান্দায়। চোখের সামনে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ দেখার আলাদা মাদকতা আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক ধরনের ঘোর তৈরি হয়। মাথার ভেতরে জগাখিচুড়ির মতো কিছু হয়। তখন মানুষ যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না এমনসব কাণ্ড করে।

এই জাতীয় কাণ্ড কিছু শুরু হলো। কিছু কিছু নিতান্তই নিরীহ ছাপোষা ধরনের মানুষ 'জয় বাংলা, জয় বাংলা' বলে গলা ফাটিয়ে চেঁচাল। দীর্ঘ আন্দোলনে এদের কেউ হয়তো কোনোদিন রাজপথে নামে নি। কোনো শ্লোগান দেয় নি। অফিসে গিয়েছে, অফিস থেকে ফেরার পথে বাজার করে নিয়ে এসেছে। চটের ব্যাগের ভেতর থেকে উঁকি দিয়েছে একটা লাউ, ইলিশ মাছের লেজ। আজ হঠাৎ তাদের কী হয়ে গেল ?

ভীত মানুষের কান্না ও চিৎকার শোনা যেতে শুরু করল তারও কিছু পরে। আকাশে তখন ট্রেসারের সংখ্যা কমে এসেছে। কারণ তার প্রয়োজন নেই। সারা

www.MurchOna.com

ঢাকা শহর আলোকিত। অসংখ্য জায়গায় আগুন জ্বলছে, কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে কালো ধোঁয়া। আগে সারা শহরে একসঙ্গে গুলি হচ্ছিল, এখন তা হচ্ছে না। গুলি হচ্ছে অঞ্চল বিশেষে। টেলিফোন কাজ করছে না। রাস্তা শুধু যে জনশূন্য তাই নয়, প্রথমবারের মতো কুকুরশূন্য। কোথায় কী হচ্ছে কেউ জানতে পারছে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কী হলো ? তাঁর আঙুলের ইশারায় দেশ চলছিল। এখন তিনি কিছু বলছেন না কেন ? ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেষ বৈঠকের আগে, সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ভালো কিছু আশা করছি। খারাপ কিছুর জন্যেও প্রস্তুত আছি। কোথায় তাঁর প্রস্তুতি ? নাকি যুদ্ধ শুরু হয়েছে, কেউ কিছু জানে না।

একদল মিলিটারি ঢুকে পড়ল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। তাদের হাতে শিক্ষকদের তালিকা। তারা মানুষ না, তারা সাক্ষাৎ আজরাইল। মানুষের বেশে জান কবজ করতে এসেছে।

এটা কার বাড়ি ? জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ? হিন্দু মালাউন ? বদমাশটার নাম কী ? জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ?[১]

মিলিটারি লেফটেনেন্ট বাড়িতে ঢুকে পড়ল। জোয়ানরা বাড়ি ঘিরে আছে। হতভম্ব জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন।

আপ প্রফেসর সাব হ্যায় ?

Yes.

আপকো লে যায়গা।

Why ?

হোয়াই প্রশ্নের জবাব দেবার সময় নেই। তাঁকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাঁর স্ত্রী বাসন্তী গুহঠাকুরতা, তাঁর অতি আদরের কন্যা দোলা তখনো বুঝতে পারছে না কী হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে। এর বেশি কী হবে ? খালি পায়ে স্বামীকে নিয়ে যাবে ? বাসন্তী গুহঠাকুরতা দৌড়ে ঘরে ঢুকলেন স্যান্ডেল আনতে। এর মধ্যেই জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে বাইরে নিয়ে গুলি করা হয়েছে।

তাদের বসার ঘরের সঙ্গেই চিৎ হয়ে পড়ে আছে ড. মনিরুজ্জামানের মৃতদেহ। একটু দূরে আরো তিনজন। একজন ক্ষীণস্বরে বলছে, পানি পানি।

মারা গেলেন দার্শনিক আত্মভোলা অধ্যাপক ড. জি. সি. দেব। জি. সি. দেব মৃত্যুর আগে প্রায় হাসিমুখে বললেন, আমি হিন্দু। আমার বাড়িতে যারা আছে সবাই হিন্দু।[২]

---

[১] *একাত্তরের স্মৃতি*। বাসন্তী গুহঠাকুরতা

[২] *অন্তরাগে স্মৃতিসমুজ্জ্বল, বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার ও আমি*। মমিনুল হক খোকা।

তিনি হয়তো ভাবলেন, সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতি কোনো অত্যাচার করা হবে না। কিংবা অন্য কিছু তখন তাঁর মাথায় খেলা করছিল।

মারা গেলেন মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ফজলুর রহমান, ফলিত পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান ড. মনিরুজ্জামান, ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল মুকতাদির, অংক বিভাগের অধ্যাপক শরাফত আলী, পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক এম. আর. খান খাদিম, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সিটিউটের শিক্ষক মুহম্মদ সাদিক ও ড. মুহম্মদ সাদত আলী।

মিলিটারিরা ঢুকে পড়ল ইকবাল হল এবং জগন্নাথ হলে। তাদের পরিকল্পনা একটি ছাত্রও যেন জীবিত বের হয়ে যেতে না পারে। তোমাদের 'জয় বাংলা' অনেক সহ্য করেছি। আর না।

রোকেয়া হল এবং শামসুন্নাহার হল। মেয়েদের দু'টি হল। হলের মেয়েরা আতঙ্কে অস্থির হয়ে দেখল, গেট ভেঙে মিলিটারিরা ঢুকছে। 'আমাদের বাঁচাও' বলে চিৎকার করার মতো মানসিক শক্তিও তাদের রইল না। তারা দেখল, পাকিস্তানি জোয়ানরা মার্চ করে হলের দিকে এগুচ্ছে।

সেনাবাহিনী আগুন জ্বালিয়ে দেয় *ইত্তেফাক* অফিসে। দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে *দি পিপলস, গণবাংলা* এবং *সংবাদ* অফিসে। আত্মনিমগ্ন কবি শহীদ সাবের *সংবাদ* অফিসেই ঘুমাতেন। *সংবাদ* অফিসই ছিল তাঁর ঘর-বাড়ি। তিনি জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা গেলেন *সংবাদ* অফিসেই।

পাকিস্তান মিলিটারি রাত একটায় যে অপারেশন শুরু করে তার নাম 'অপারেশন সার্চ লাইট'।* ব্রিগেডিয়ার আবরারের ৫৭ ব্রিগেড ছিল অপারেশনের দায়িত্বে। অধিনায়ক মেজর জেনারেল ফরমান আলি। তিনি শায়েস্তা করবেন ঢাকা নগরী। মেজর জেনারেল খাদেমের উপর দায়িত্ব পড়ল ঢাকা ছাড়া বাকি দেশ শায়েস্তা করার।

ব্রিগেডিয়ার আরবার ১৮ পাঞ্জাব, ২২ বেলুচ এবং ৩২ পাঞ্জাবের যৌথ দলকে লেলিয়ে দিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়।

৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে পাঠাল রাজারবাগের এক হাজার পুলিশকে জন্মের শিক্ষা দেবার জন্যে।

পুরনো ঢাকার গাদ্দারদের শায়েস্তা করবে ১৮ পাঞ্জাব ফোর্স।

বালুচ রেজিমেন্টের দায়িত্ব পড়ল পিলখানা ইপিআর'দের ঠাণ্ডা করা।

---

* *উইটনেস টু সারেন্ডার* / সিদ্দিক সালেক।

www.MurchOna.com

১৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সকে কোনো কাজে লাগানো হলো না। রিজার্ভ বাহিনী হিসেবে তাদের ক্যান্টনমেন্ট এলাকাতে রেখে দেয়া হলো।

৪৩ হালকা বিমান বিধ্বংসী রেজিমেন্টকে পাঠানো হলো তেজগাঁও বিমানবন্দরের দায়িত্ব দিয়ে।

এক প্লাটুন কমান্ডো পাঠানো হলো ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর থেকে শেখ মুজিবকে ধরে আনতে।

রাত একটায় ওয়্যারলেসে ৫৭ ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার মেজর জাফরের উৎফুল্ল কণ্ঠ ভেসে এলো— Big Bird in the cage... others not in the nests. ... over.

সামরিক বাহিনীর জিপে করে তাঁকে নিয়ে আসা হলো ক্যান্টনমেন্টে। মেজর জাফর জানতে চাইল জেনারেল টিক্কা কি তাঁকে চোখের দেখা দেখতে চান ? টিক্কা উত্তর দিল— I don't want to see his face.*

জেনারেল টিক্কা ২৫ মার্চ রাত ন'টায় ঢাকা অঞ্চল কমান্ডার মেজর জেনারেল ফরমান আলীর স্টাফ অফিসে ঢাকা অপারেশনের দায়িত্বে নিযুক্ত অফিসারদের হাসতে হাসতে বলেছিলেন— ঢাকা শহরে এমন তাণ্ডব তৈরি করতে হবে যেন আতঙ্কে দুগ্ধবতী মাতার বুকের দুধ জমে দই হয়ে যায়। বাংলাদেশ ছোট্ট একটি দুষ্ট প্রাণী। ঢাকা হলো সেই প্রাণীর মাথা। আমরা শুধু মাথাটা ভেঙে গুঁড়ো করে দেব। আমাদের আর কিছু করতে হবে না। ২৭ মার্চ ভোরবেলা আমি কারফিউ তুলে দেব। দেখা যাবে ২৭ মার্চেই ইনশাল্লাহ দেশ ঠিক হয়ে গেছে।

জেনারেল টিক্কা পরম সৌজন্যে টিপট থেকে নিজেই সবার জন্য চা ঢেলে দিলেন। হাসিমুখে বললেন, শেকসপিয়র তার হ্যামলেটে বলেছিলেন, I have to be cruel only to be kind. আমার ক্রুয়েলটি হবে এক ধরনের দয়াপ্রদর্শন। বাঙালিদের প্রতি দয়া। গ্যাংগ্রীনে আক্রান্ত অংশ শল্যচিকিৎসক কেটে বাদ দেন। তিনি তা করেন রোগীর মঙ্গলের জন্য, রোগী তা বুঝতে পারে না। রোগগ্রস্ত বাঙালিকে আমরা বাঁচাব না তো কে বাঁচাবে ? মিটিং-এর শেষ পর্যায়ে তিনি পাঞ্জাবি সৈন্যদের বুদ্ধি-সুদ্ধি নিয়ে একটা রসিকতা করলেন। সেই রসিকতায় এক একজন হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ল। সেনাপ্রধানের সামনে এভাবে হাসা বড় ধরনের বেয়াদবি, কিন্তু না হেসে পারা যাচ্ছিল না। রসিকতাটা ছিল বড়ই মজার।

জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে ভুট্টোর সাক্ষাৎ হলো গভর্নর হাউসে। ততক্ষণে অপারেশন সার্চ লাইট শুরু হয়ে গেছে। ভুট্টো খানিকটা উত্তেজিত। অস্থির। তার

* *উইটনেস টু সারেন্ডার*। সিদ্দিক সালেক।

জানার আগ্রহ, কী হচ্ছে ? অপারেশন কোন পর্যায়ে ? জেনারেল টিক্কা খান তাকে তেমন পাত্তা দিচ্ছে না। মিলিটারি অপারেশন কী হচ্ছে কীভাবে হচ্ছে তা সিভিলিয়ানদের জানানোর কিছু নেই। উত্তেজিত ভুট্টো রাতেই মিলিটারি কনভয়ের সঙ্গে বের হয়ে শহরের অবস্থা দেখতে আগ্রহী। জেনারেল টিক্কা হাসি হাসি মুখে বলল, No. ভুট্টো মেঝেতে জুতা ঠুকে বলল, Why no ? জেনারেল টিক্কা বলল, Because I said no.

ভুট্টো বলল, আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

টিক্কা বলল, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেছেন। তিনি এখন পাকিস্তানের পথে।

ভুট্টো আবারো মেঝেতে জুতা ঠুকে বলল, এই তথ্যটা আমি কেন জানলাম না ? আমিও তো তাঁর সঙ্গে চলে যেতে পারতাম।

আপনাকে রেখে যাওয়া হয়েছে বিদ্রোহী পূর্ব পাকিস্তানের শান্ত রূপ দেখে যাবার জন্যে। অখণ্ড পাকিস্তানের সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী, কফি খাবেন ?

'সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী' সম্বোধনে ভুট্টোকে খানিকটা তুষ্ট মনে হলো।

লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফের রিপোর্টার সিমন ড্রিং-এর পাঠানো প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য ঢাকা থেকে পাঠানো প্রথম বিদেশী প্রতিবেদন। তিনি তার দীর্ঘ প্রতিবেদনের এক অংশে লিখলেন—

City lies silent

Shortly before dawn most firing had stopped, and as the sun came up an eerie silence settled over the city, deserted and completely dead except for the noise of the crows and occasional convoy of troops or two or three tanks rumbling by mopping up.

At noon again without warning, columns of troops poured into the old section of the city where more than one million lived in a sprawling maze of narrow, winding streets. For the next 11 hours they devasted the 'old town' as it is called.

The lead unit was followed by soldiers carrying cans of gasoline. Those who tried to escape was shot. Those who stayed were burnt alive.

www.MurchOna.com

নগরী নীরব

সকাল হবার কিছুক্ষণ আগে গোলাবর্ষণ থেমে গেল, সূর্য উঠল, এক ভৌতিক নীরবতা নগরীকে গ্রাস করল, পরিত্যক্ত ও মৃত এই নগরীতে শুধু শোনা যাচ্ছে কাকের ডাক, মিলিটারি কনভয় ও চলমান ট্যাংকের ঘর্ঘর শব্দ।

দুপুরে আচমকা সৈন্যদলের গাড়ি পুরনো ঢাকায় ঢুকে পড়ল, যার গোলকধাঁধার মতো গলিঘুঁজিতে দশ লাখ মানুষ বাস করেন। পরের এগারোটা ঘণ্টা ধরে চলল ধ্বংসযজ্ঞ।

অগ্রবর্তী দলের পেছনে পেছনে সৈন্যরা পেট্রোলের টিন হাতে করে যাচ্ছিল। যারা পালাতে চেষ্টা করছিল তাদের গুলি করা হলো। যারা পালালো না তাদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হলো।

শাহেদ নিতান্ত অজানা অচেনা এক বাড়িতে আটকা পড়ে আছে। ২৫ মার্চের মধ্যরাতে সে উপায় না দেখে বিজয়নগরের এই গলিতে ঢুকে পড়েছিল। একতলা একটা বাড়ির বন্ধ গেট টপকে সে প্রাণপণ শক্তিতে বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিল। জানালার পর্দা সরিয়ে বাচ্চা একটা মেয়ে উঁকি দিল। ভীত গলায় বলল, কে, কে ?

শাহেদ বলল, খুকি, তুমি আমাকে চিনবে না। দরজা খোলো।

দরজা খুলছে না। রাস্তায় গাড়ির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। শাহেদ বলল, খুকি দরজা খোলো।

খুকির মা দরজা খুললেন। তিনি তার মেয়ের মতোই ভয় পেয়েছেন। তার চোখ-মুখ সাদা। তিনি ভয়ে কাঁপছিলেন। খুকির মা বললেন, বাইরে কী হচ্ছে ?

শাহেদ বলল, শহরে মিলিটারি নেমে গেছে। সব জানালা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে দিন। বাতি জ্বেলে রেখেছেন কেন ? বাড়ির ভেতর থেকে এক বৃদ্ধর শ্লেষ্মাজড়ানো গলা ভেসে এলো, বউমা, দরজা কেন খুললা ? তুমি কার সাথে কথা বলো ?

শাহেদ বৃদ্ধের কথার জবাব দিতে পারে নি। তার আগেই খুব কাছে কোথাও মর্টারের গোলা পড়ল। প্রথম গোলার পর দ্বিতীয় গোলা পড়ল। এবারেরটা যেন আরো কাছে। পুরো বাড়ি কেঁপে উঠল। বসার ঘরের দেয়ালে ঝুলানো বাঁধানো সবক'টা ছবি খুলে পড়ে গেল। ঝনঝন শব্দ হতেই থাকল। কারেন্ট চলে গিয়ে বাড়ি অন্ধকার হয়ে গেল। বৃদ্ধ ভয় পেয়ে শিশুর মতো চেঁচাতে লাগলেন, ও বউমা। বউমা। ও বউমা। তুমি কার সঙ্গে কথা বলো ?

www.MurchOna.com

বাচ্চামেয়েটা চিৎকার করে কাঁদছে। গুলির চেয়েও সে অন্ধকারকে ভয় পাচ্ছে। শাহেদ বলল, খুকি, তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাক। নড়বে না। ঘরভর্তি কাচের টুকরা।

দুঃসময় মানুষকে অতিদ্রুত দলবদ্ধ করে। অরণ্যচারী মানুষ হিংস্র শ্বাপদের ইশারা পেলেই যূথবদ্ধ হতো। সভ্য মানুষের ভেতরেও হয়তো সেই স্মৃতি রয়ে গেছে। আজ এই ভয়াবহ সময়ে তারা চলে এসেছে কাছাকাছি।

মাত্র তিন ঘণ্টা পার হয়েছে— শাহেদ এই পরিবারটির সঙ্গে আছে। এই তিন ঘণ্টায় নিজেকে সে এই পরিবারের একজন সদস্য বলেই মনে করছে। ঢাকা কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক সানাউল্লাহ সাহেবের স্ত্রীকে তার নিজের ছোটবোনের মতোই মনে হচ্ছে। সানাউল্লাহ সাহেবের বাবাকে সে ডাকছে চাচাজান। সানাউল্লাহ সাহেবের মেয়েটি সারাক্ষণ তার আঙুল ধরে আছে। মেয়েটির নাম কংকন। সে 'কংকন' বলতে পারে না, নাম জিজ্ঞেস করলে বলে 'ককন'। মেয়েটির বয়স পাঁচের কাছাকাছি। এই বয়সে অনুস্বারের উচ্চারণ আয়ত্তে এসে যাওয়া উচিত। মেয়েটি মনে হয় কথা বলায় পিছিয়ে আছে। শাহেদ নিতান্তই অপরিচিত একজন, তারপরেও সে সানাউল্লাহ সাহেবের শোবার ঘরের খাটে অন্য সবার সঙ্গে বসে আছে।

কংকনের মায়ের নাম এখনো জানা যায় নি। তার শ্বশুর তাকে 'মানু' ডাকছেন। মানু নিশ্চয়ই তার নাম না। বড় নাম ভেঙে আদর করে তিনি হয়তো পুত্রবধূকে ছোট নামে ডাকেন। বৃদ্ধ যে তার পুত্রবধূকে অত্যন্ত পছন্দ করেন তা তার কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছে। তবে তিনি কথার ফাঁকে ফাঁকে ধমক দিচ্ছেন। কংকনের মা তাতে বিচলিত হচ্ছেন না। কথায় কথায় শ্বশুরের ধমক খেয়ে তার হয়তো অভ্যাস আছে।

ঘরে হারিকেন জ্বালানো হয়েছে। কংকন ঘুমিয়ে পড়েছে। বাকি তিনজন তাকিয়ে আছে হারিকেনের দিকে। অন্ধকারে মানুষ সবসময় আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে পছন্দ করে। শুধু ইলেকট্রিক বাতির দিকে তাকায় না। ইলেকট্রিকের আলো চোখে লাগে।

কংকনের মা শাহেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাই, আপনি কি রাতে খেয়েছেন ?

শাহেদ বলল, জি না। তবে আমি কিছু খাব না। এই সময় খাওয়ার প্রশ্নই আসে না।

ঘরে খাবার কিছু নেই। গরম ভাত দেই আর একটা ডিম ভেজে দেই ?

আমার ক্ষিধে নেই।

বৃদ্ধ খুবই বিরক্ত গলায় বললেন, বৌমা, আমি তোমার কথাবার্তা, কার্যকলাপে যারপরনাই বিরক্ত। ভাত দেই, ডিম ভেজে দেই— এইসব কী ধরনের কথা ? শুনেছ একটা লোক খায় নাই। তুমি ভাত রেঁধে, ডিম ভেজে তাকে খেতে ডাকবে। বাড়ির বৌ যদি সভ্যতা-ভব্যতা না জানে কে জানবে ? বস্তির মাতারি জানবে ?

শাহেদ লজ্জিত গলায় বলল, চাচাজান, আমার একেবারেই ক্ষিধে নেই।

তুমি চুপ কর। গোলাগুলির মধ্যে ক্ষিধা আছে কি নাই বোঝা যায় না। হঠাৎ দেখবে ক্ষিধায় নাড়িভুঁড়ি জ্বলছে। বৌমা, তুমি হারিকেন নিয়ে যাও, ভাত চড়াও। একমুঠ চাল বেশি দিও, আমিও চারটা খাব।

কংকনের মা হারিকেন হাতে রান্নাঘরে চলে গেল। শাহেদ বলল, কংকনের বাবা কোথায় ?

বৃদ্ধ বিরক্ত গলায় বলল, ঐ গাধাটার কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবে না। গাধাটার কথা জিজ্ঞেস করলেই চড়াৎ করে রক্ত মাথায় উঠে যাবে। গাধা গেছে বরিশাল। আমি তাকে বললাম, দেশের অবস্থা ভালো না। এই সময় কোথাও যাবার দরকার নেই। তবু সে গেল।

কোনো জরুরি কাজে গেছেন ?

অত্যন্ত জরুরি কাজে গেছে। বন্ধুর বিয়েতে গেছে। আরে গাধা, তোর নিজের পরিবারের নিরাপত্তার চেয়ে বন্ধুর বিয়ে বড় হয়ে গেল ? তোর বউ, মেয়ে, বৃদ্ধ বাবা এইগুলা কিছু না ? বউমা বলতে গেলে বাচ্চা একটা মেয়ে। আমি প্রায় পঙ্গু। তুই বসে বসে কোর্মা-কালিয়া খাচ্ছিস আর আমরা খাচ্ছি গুলি। কাণ্ডজ্ঞানহীন শাখামৃগ। তাকে বললাম ট্রানজিস্টারের ব্যাটারি শেষ। ব্যাটারি কিনে দিয়ে যা। সে বলল, জি আচ্ছা বাবা। কিনে দিয়ে গেছে ব্যাটারি ? না। উনি ভুলে গেছেন। উনি সবকিছু ভুলে যান, শুধু বন্ধুর বিয়ে মনে থাকে। খা ব্যাটা বিয়ে খা।

বৃদ্ধ হঠাৎ চুপ করে গেলেন। খুব কাছেই গুলির শব্দ হচ্ছে। মানুষের চিৎকার হৈচৈও শোনা যাচ্ছে। বৃদ্ধ আতঙ্কিত গলায় বললেন, বৌমা, হারিকেন নিভিয়ে দাও। হারিকেন নিভিয়ে দাও।

কংকনের ঘুম ভেঙে গেছে। সে ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। বৃদ্ধ বললেন, শাহেদ, মেয়েটার কান্না থামাও। কান্নার শব্দ শুনে মিলিটারি এদিকে চলে আসতে পারে। ওর মুখটা চেপে ধরো।

www.MurchOna.com

রাত বাজছে তিনটা পঁচিশ।

কিছুক্ষণের জন্যে গোলাগুলি বন্ধ ছিল। আবারো শুরু হয়েছে। প্রবলভাবেই শুরু হয়েছে। মরিয়মের ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। টেবিলে মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলোয় খেতে বসেছে নাইমুল। সে খুব আগ্রহ করে খাচ্ছে। তারচে' অনেক আগ্রহ করে তার খাওয়া দেখছে মরিয়ম। তার শুধু একটাই কষ্ট, নাইমুল খেতে বসে কাঁচামরিচ চেয়েছিল। মরিয়ম কাঁচামরিচ দিতে পারে নি। ঘরে ছিল না। সে ঠিক করে রেখেছে এরপর থেকে সে নিজের দায়িত্বে কাঁচামরিচ কিনে রাখবে। নাইমুল খেতে বসে কাঁচামরিচ চায়।

মরিয়ম বলল, খেতে ভালো হয়েছে ?

নাইমুল জবাব দিল না। হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। এই মাথা নাড়া দেখতে মরিয়মের ভালো লাগে। সবাই মাথা নাড়ে দু'বার। মরিয়মের সম্পূর্ণ নিজের এই মানুষটা তিনবার নাড়ে। মরিয়ম ঠিক করেছে এখন থেকে সে নিজেও মাথা নাড়লে তিনবার নাড়বে। তার সব কিছুই হবে তার নিজের মানুষটার মতো। নাইমুল হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, মরি, বলো তো ঢাকায় সবচে' ভালো মোরগপোলাও কোথায় পাওয়া যায় ?

মরিয়ম বলল, জানি না।

নাইম বলল, পুরনো ঢাকায় সাইনি পালোয়ানের মোরগপোলাও। তোমাকে একদিন খাওয়াব।

মরিয়ম আদুরে গলায় বলল, কবে ?

নাইমুল স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসল। সেই হাসি এত সুন্দর! হাসার সময় তার নিজের মানুষটার ঠোঁট কী সুন্দর বাঁকে। তখন ইচ্ছা করে ঠোঁটে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে। এই কাজটা মরিয়ম কোনোদিন করে নি। তবে কোনো একদিন করবে। যদি সে দেখে এতে নাইমুল রাগ করছে না, তা হলে সব সময় করবে। নাইমুল হাসলেই সে ঠোঁট ছুঁয়ে দেবে।

বাইরে গুলির শব্দ হচ্ছে। মরিয়মদের বাড়ি বড় রাস্তার পাশে। রাস্তায় ঘড়ঘড় শব্দে ট্যাংক চলছে। আর তারা কী সুন্দর টুকটাক গল্প করছে! হাসছে। যেন এই পৃথিবীতে তারা দুইজন এবং দু'জনের সামনে জ্বলন্ত মোমবাতি ছাড়া আর কিছু নেই।

মরি!

উঁ।

মোরগপোলাওটা যে খাচ্ছি এটা কে রেঁধেছে ?

মা।

www.MurchOna.com

খুব ভালো হয়েছে। তুমি মোরগপোলাও রাঁধা শিখে নিও।

আমি কালই শিখব।

নাইমুলের খাওয়া শেষ হয়েছে। সে প্লেটের উপর হাত ধুচ্ছে। মরিয়মের ইচ্ছা করছে হাত ধুইয়ে দিতে। তার লজ্জা এখনো কাটে নি বলে যা যা করতে ইচ্ছা করে তার কোনোটাই করতে পারে না। লজ্জাটা কাটা উচিত।

মরি!

উঁ।

তোমাদের এখানে একটা পাগলা কোকিল আছে। দিনে রাতে সবসময় ডাকে। এখনো ডাকছে।

মনে হয় ভয় পেয়ে ডাকছে, বাইরে গুলি হচ্ছে তো।

ভয় পেয়ে ডাকলে তো কাকদেরও ডাকার কথা। কোনো কাক কিন্তু ডাকছে না।

তাই তো!

পাখিদের মধ্যে সবচে' সুন্দর কোন পাখি ডাকে বলো তো?

জানি না। কোন পাখি?

'চোখ গেল' পাখি। তুমি চোখ গেল পাখির ডাক শুনেছ?

শুনেছি।

'চোখ গেল' পাখির হিন্দি নাম কী বলো তো?

জানি না।

পিঁউ কাহা।

পিঁউ কাহা তো শুনেছি। এটা যে 'চোখ গেল' পাখি তা জানতাম না।

ইংরেজিতে এই পাখিকে কী বলে জানো?

না।

ইংরেজিতে বলে 'ব্রেইন ফিভার'।

এত কুৎসিত নাম?

কুৎসিত তো বটেই। মরি, তোমার গরম লাগছে না?

লাগছে।

একটা কাজ করলে কিন্তু গরমটা কম লাগবে।

কী কাজ?

শাড়ি খুলে ফেলো।

মরিয়ম লজ্জায় বেগুনি হয়ে গেল। নাইমুল বলল, আমার সামনে লজ্জা কিসের ?

মরিয়ম অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, আগে মোমবাতি নেভাও।

নাইমুল বলল, তা হবে না। মোমবাতি জ্বালানো থাকবে। একেক আলোয় মানুষের শরীর একেক রকম দেখায়। ইলেকট্রিকের আলোয় এক রকম, মোমবাতির আলোয় আরেক রকম, আবার মশালের আলোয় সম্পূর্ণ অন্যরকম। আমি দেখতে চাচ্ছি মোমবাতির আলোয় নগ্ন মরিয়মকে কেমন দেখায়।

আমি পারব না। আগে মোমবাতি নেভাও।

নাইমুল মোমবাতি নেভাল না। মরিয়মের শরীর ঝনঝন করছে। শরীরের প্রতিটি কোষে সাড়া পড়ে গেছে। তারা জেনে গেছে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভয়ঙ্কর আনন্দের ঘটনা ঘটবে। মরিয়ম কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, বাতি নেভাও, তোমার দোহাই লাগে। নাইমুল বলল, না। বলেই হাসল। মরিয়মের মনে হলো বাতি না নিভিয়ে ভালোই হয়েছে। বাতি নিভিয়ে ফেললে এত সুন্দর হাসি দেখা যেত না। মরিয়ম হাত বাড়িয়ে নাইমুলের ঠোঁট স্পর্শ করল।

www.MurchOna.com

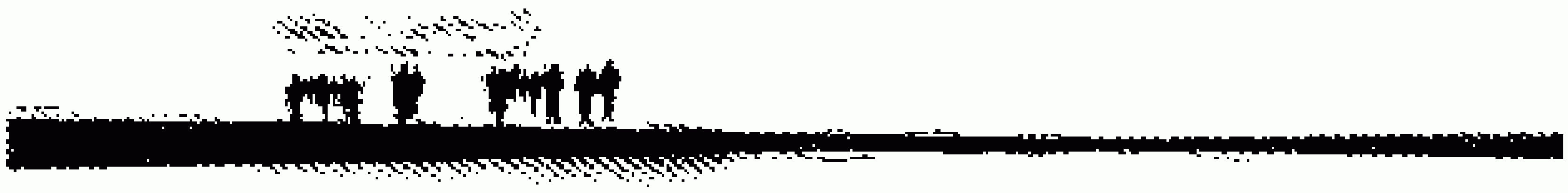

২৬ মার্চ ভোর আটটায় আগুপিছু জিপ ও ট্রাকে মোতায়েন সশস্ত্র প্রহরায় একটি ১৯৬১ মডেলের শেভ্রলেট গাড়ি হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালের সামনে এসে থামে। এই গাড়িবহর জুলফিকার আলি ভুট্টো এবং তার সঙ্গীদের এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবে।

তাঁকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল। সাংবাদিকদের সব প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, আমার মন্তব্য করার কিছু নেই।

পশ্চিম পাকিস্তানে পা দিয়ে তিনি আনন্দিত গলায় বললেন, আল্লাহর রহমতে পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে।*

*রিপোর্ট : শিডনি শনবার্গ।

রোনাল্ড জোফে পরিচালিত 'দা কিলিং ফিল্ডস' ছবিটি অস্কার বিজয় করে। এই সত্য কাহিনীর নায়ক যে সাংবাদিক তিনিই শিডনি শনবার্গ। —*লেখক*

www.MurchOna.com

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
দলিলপত্র : অষ্টম খণ্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্যমন্ত্রণালয়
পৃষ্ঠা : ৫০

পরদেশী
পিতা : ছোটন ডোম
সুইপার, সরকারী পশু হাসপাতাল
ঢাকা।

১৯৭১ সনের ২৭শে মার্চ সকালে রাজধানী ঢাকায় পাকসেনাদের বীভৎস হত্যাকাণ্ডের পর ঢাকা পৌরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান মেজর সালামত আলি খান শূরের প্রশাসনিক অফিসার মি. ইদ্রিস পৌরসভার আরও কয়েকজন অফিসার সঙ্গে নিয়ে একটি মিউনিসিপ্যাল ট্রাকে পশু হাসপাতালের গেটে এসে বাঘের মতো 'পরদেশী পরদেশী' বলে গর্জন করতে থাকলে আমি ভীত-সন্ত্রস্তভাবে আমার কোয়ার্টার থেকে বের হয়ে আসি। ইদ্রিস সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে কর্কশ স্বরে বলতে থাকেন, 'তোমরা সব সুইপার ডোম বের হও, যদি বাঁচতে চাও অবিলম্বে সবাই মিলে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় স্তূপীকৃত লাশ উঠিয়ে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলে দাও। নইলে কাউকে বাঁচানো হবে না, কেউ বাঁচতে পারবে না।' পৌরসভার সেই ট্রাকে নিম্নবর্ণিত সুইপাররা বসা ছিল— ১. ভারত, ২. লাড্ডু, ৩. কিষন।

আমি তার নির্দেশ অমান্য করার কোনো উপায় না দেখে ট্রাকে উঠে বসলাম। সেই ট্রাকে করে ঢাকা পৌরসভা অফিসে আমাদের প্রায় আঠারজন সুইপার ও ডোমকে একত্রিত করে প্রতি ছয়জনের সাথে দুইজন করে সুইপার ইন্সপেক্টর আমাদের সুপারভাইজার নিয়োজিত করে তিন ট্রাকে তিনদলকে বাংলাবাজার, মিটফোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রেরণ করা

www.MurchOna.com

হয়। আমি মিটফোর্ডের ট্রাকে ছিলাম। সকাল নয়টার সময় আমাদের ট্রাক মিটফোর্ড হাসপাতালের লাশঘরের সম্মুখে উপস্থিত হলে আমরা ট্রাক থেকে নেমে লাশঘরের ভিতরে প্রবেশ করে বুকে এবং পিঠে মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁজড়া করা প্রায় একশত যুবক বাঙালির বীভৎস লাশ দেখলাম। আমি আমার সুপারভাইজারের নির্দেশে লাশঘরের ভিতরে প্রবেশ করে প্রতিটি লাশের পায়ে ধরে টেনে বের করে বাইরে দাঁড়ানো অন্যান্য সুইপারের হাতে তুলে দিয়েছি ট্রাকে উঠাবার জন্য। আমি দেখেছি প্রতিটি লাশের বুক ও পিঠ মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁজড়া। সব লাশ তুলে দিয়ে একপাশে একটা লম্বা টেবিলের উপর চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া একটি লাশের উপর থেকে চাদর টেনে উঠিয়ে দেখলাম একটি রূপসী ষোড়শী যুবতীর উলঙ্গ লাশ— লাশের বক্ষ যোনিপথ ক্ষতবিক্ষত, কোমরের পিছনের মাংস কেটে তুলে নেওয়া হয়েছে, বুকের স্তন থেতলে গেছে, কোমর পর্যন্ত লম্বা কালো চুল, হরিণের মতো মায়াময় চোখ দেখে আমার চোখ বেয়ে পানি পড়তে থাকল, আমি কিছুতেই চোখের পানি রাখতে পারলাম না। আমি আমার সুপারভাইজারের ভয়াল এবং ভয়ঙ্কর কর্কশ গর্জনের মুখে সেই সুন্দরীর পবিত্র দেহ অত্যন্ত যত্ন সম্ভ্রমের সাথে ট্রাকে উঠিয়ে দিলাম। মিটফোর্ডের লাশঘরের সকল লাশ ট্রাকে উঠিয়ে আমরা ধলপুরের ময়লা ডিপোতে নিয়ে গিয়ে বিরাট গর্তের মধ্যে ঢেলে দিলাম। দেখলাম বিরাট বিরাট গর্তের মধ্যে সুইপার ও ডোমেরা রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্থান থেকে নিয়ে আসা লাশ ট্রাক থেকে গর্তের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। আমি অধিকাংশ লাশের দেহে কোনো কাপড় দেখি নাই, যে সমস্ত যুবতী মেয়ে ও রমণীদের লাশ গর্তের মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো তার কোনো লাশের দেহেই আমি কোনো আবরণ দেখি নাই। তাদের পবিত্র দেহ দেখেছি ক্ষতবিক্ষত, তাদের যোনিপথ পিছন দিকসহ আঘাতে বীভৎস হয়ে আছে। দুপুর প্রায় দু'টার সময় আমরা রমনা কালিবাড়ীতে চলে আসি পৌরসভার ট্রাক নিয়ে। লাশ উঠাবার জন্য ট্রাক রমনা কালিবাড়ীর দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখে, দুজন ট্রাকে দাঁড় করিয়ে রেখে আমরা চারজন কালিবাড়ীর ভিতরে গিয়ে দেখি সবকিছু পুড়ে ভস্ম হয়ে আছে। কালিবাড়ীর ভিতরে বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো ছিটানো ৪১টি পোড়া লাশ আমি ট্রাকে তুলেছি। কালিবাড়ীর এ সকল লাশ আমরা ধলপুরের ময়লার ডিপোতে গর্তের মধ্যে ফেলেছি। লাশ তুলে তুলে মানুষের পচা চর্বির গন্ধে আমার পাকস্থলি বের হতে চাচ্ছিল। পরের দিন আমি আর লাশ তুলতে যাই নাই, যেতে পারি নাই,

www.MurchOna.com

সারাদিন ভাত খেতে পারি নাই, ঘৃণায় কোনো কিছু স্পর্শ করতে পারি নাই। পরের দিন ২৯শে মার্চ সকালে আমি আবার ঢাকা পৌরসভা অফিসে হাজির হলে আমাকে ট্রাক দিয়ে লাশ তোলার জন্য আরও কয়েকজন সুইপারের সাথে ঢাকা শাখারীবাজারে যেতে বলা হয়। জজ কোর্টের সম্মুখে আগুনের লেলিহান শিখা তখনও জ্বলছিল, আর পাকসেনারা টহলে মোতায়েন ছিল বলে আমরা ট্রাক নিয়ে সে পথ দিয়ে শাখারীবাজারে প্রবেশ করতে পারি নাই। পাটুয়াটুলি ঘুরে আমরা শাখারীবাজারের পশ্চিম দিকে প্রবেশ করে পাটুয়াটুলি ফাঁড়ি পার হয়ে আমাদের ট্রাক শাখারীবাজারের মধ্যে প্রবেশ করল। ট্রাক থেকে নেমে আমরা শাখারীবাজারের প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রবেশ করলাম— দেখলাম মানুষের লাশ, নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক-বালিকা, কিশোর-শিশুর বীভৎস পচা লাশ, চারদিকে ইমরাতসমূহ ভেঙ্গে পড়ে আছে, মেয়েদের অধিকাংশ লাশ আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেখলাম, দেখলাম তাদের বুক থেকে স্তন তুলে নেওয়া হয়েছে। কারও কারও যোনিপথে লাঠি ঢুকানো আছে। বহু পোড়া, ভস্ম লাশ দেখেছি। পাঞ্জাবী সেনারা পাষণ্ডের মতো লাফাতে লাফাতে গুলি বর্ষণ করছিল, বিহারী জনতা শাখারীবাজারের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করে মূল্যবান আসবাবপত্র, সোনাদানা লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছিল, আমরা অবিরাম গুলিবর্ষণের মুখে প্রাণের ভয়ে দুই ট্রাক লাশ তুলে লাশ তোলার জন্য সেদিন আর শাখারীবাজারে প্রবেশ করার সাহস পাই নাই। ৩০শে মার্চ সকালে আমার দলকে মিলব্যারাক থেকে লাশ তুলতে বলা হয়। আমি মিলব্যারাক ঘাটে পৌরসভার ট্রাক নিয়ে গিয়ে দেখলাম নদীর ঘাটে অসংখ্য মানুষের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, বহু লাশ রশি দিয়ে বাঁধা দেখলাম, প্রতিটি রশির বন্ধন খুলে প্রতি দলে দশজন পনের জনের লাশ বের করলাম, সব যুবক ছেলে ও স্বাস্থ্যবান বালকদের লাশ দেখলাম। প্রতিটি লাশের চোখ বাঁধা, হাত বাঁধা, শক্ত করে পিছন দিক থেকে। প্রতিটি লাশের মুখমণ্ডল কালো দেখলাম, এসিডে জ্বলে বিকৃত ও বিকট হয়ে আছে। লাশের সামনে গিয়ে ঔষধের অসহ্য গন্ধ পেলাম। লাশের কোন দলকে দেখলাম মেশিনগানের গুলিতে বুক ও পিঠ ঝাঁজড়া হয়ে আছে, অনেক লাশ দেখলাম বেটন ও বেয়নেটের আঘাতে বীভৎস হয়ে আছে, কারো মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মগজ বের হয়ে আছে, কারো কাটা হৃদপিণ্ড বের হয়ে আছে। নদীর পাড়ে ছয়জন রূপসী যুবতীর বীভৎস ক্ষতবিক্ষত, উলঙ্গ লাশ দেখলাম। চোখ বাঁধা, হাত-পা শক্ত করে বাঁধা প্রতিটি লাশ গুলির আঘাতে ঝাঁজড়া, মুখমণ্ডল,

www.MurchOna.com
==

বক্ষ ও যোনিপথ রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত ও বীভৎস দেখলাম। দুইবারে দুই ট্রাকে আমি সত্তরটি লাশ উঠিয়ে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। এরপর আমাকে সদরঘাট, শ্যামবাজার, বাদামতলী ঘাট থেকে লাশ তুলতে বলা হয়। আমি উপরোক্ত এলাকার নদীর ঘাট থেকে পচা লাশ তুলে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। আমি যেদিন কালিবাড়ী লাশ তুলেছি সেদিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের পিছনে স্টাফ কোয়ার্টার, রোকেয়া হলের পশ্চিম দিকে জনৈক অধ্যাপকের বাসা থেকে আমি লাশ তুলেছি। রোকেয়া হলের পিছনের স্টাফ কোয়ার্টারের ভিতর থেকে আমি মেয়ে পুরুষ ও শিশু সমেত নয়টি লাশ তুলেছি। আর অধ্যাপকের বাসা থেকে সিঁড়ির সামনে লেপের ভিতর পেঁচানো জনৈক অধ্যাপকের লাশ আমি তুলে নিয়ে গেছি।

স্বাক্ষর
পরদেশী
২১।৩।৭৪

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
দলিলপত্র : অষ্টম খণ্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্যমন্ত্রণালয়
পৃষ্ঠা : ৪৪

চুন্নু ডোম
ঢাকা পৌরসভা
রেলওয়ে সুইপার কলোনী
২২৩ নং ব্লক, ৩ নং রেলগেট
ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।

১৯৭১ সনের ২৮শে মার্চ সকালে আমাদের পৌরসভার সুইপার ইন্সপেক্টর ইদ্রিস সাহেব আমাকে লাশ উঠাবার জন্য ডেকে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে নিয়ে যান। সেখান থেকে আমাকে, বদলু ডোম, রঞ্জিত লাল বাহাদুর, গণেশ ডোম ও কানাইকে একটি ট্রাকে করে প্রথম শাখারীবাজারের কোর্টের প্রবেশপথের সম্মুখে নামিয়ে দেয়। আমরা উক্ত পাঁচজন দেখলাম ঢাকা জজ কোর্টের দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথের যে রাজপথ শাখারীবাজারের দিকে চলে গেছে সেই রাস্তার দু'ধারে ড্রেনের পাশে যুবক-যুবতীর, নারী-পুরুষের, কিশোর-শিশুর বহু পচা লাশ। দেখতে পেলাম, বহু লাশ পচে ফুলে বীভৎস হয়ে আছে, দেখলাম শাখারীবাজারের

www.MurchOna.com

দুদিকের ঘরবাড়িতে আগুন জ্বলছে, অনেক লোকের অর্দ্ধপোড়া লাশ পড়ে থাকতে দেখলাম, দুই পার্শ্বে অদূরে সশস্ত্র পাঞ্জাবী সৈন্যদের প্রহরায় মোতায়েন দেখলাম। প্রতিটি ঘরে দেখলাম মানুষ, আসবাবপত্র জ্বলছে। একটি ঘরে প্রবেশ করে একজন মেয়ে, একজন শিশুসহ বারজন যুবকের দগ্ধ লাশ উঠিয়েছি। শাখারীবাজারের প্রতিটি ঘর থেকে যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, কিশোর-শিশু ও বৃদ্ধের লাশ তুলেছি। পাঞ্জাবীরা প্রহরায় থাকাকালে সেই মানুষের অসংখ্য লাশের উপর বিহারীদের উশৃংখল উল্লাসে ফেটে পড়ে লুট করতে দেখলাম। প্রতিটি ঘর থেকে বিহারী জনতাকে মূল্যবান সামগ্রী, দরজা, জানালা, সোনাদানা সবকিছু লুটে নিয়ে যেতে দেখলাম। লাশ উঠাতে উঠাতে এক ঘরে প্রবেশ করে এক অসহায়া বৃদ্ধাকে দেখলাম—বৃদ্ধা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পানি পানি বলে চীৎকার করছিল, তাকে আমি পানি দিতে পারি নাই ভয়ে, বৃদ্ধাকে দেখে আমি আরও ভীত হয়ে পালিয়ে এসেছি। আমি পানি দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমাদের পিছনে সশস্ত্র পাঞ্জাবী সেনা প্রহরায় থাকায় আমি সেই বৃদ্ধাকে পানি দিয়ে সাহায্য করতে পারি নাই। আমরা ১৯৭১ সনের ২৮শে মার্চ শাখারীবাজার থেকে প্রতিবারে একশত লাশ উঠিয়ে তৃতীয়বার ট্রাক বোঝাই করে তিনশত লাশ ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। ১৯৭১ সনের ২৯শে মার্চ সকাল থেকে আমরা মিটফোর্ড হাসপাতালের লাশঘর ও প্রবেশপথের দুপার্শ্ব থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিববাড়ী, রমনা কালিবাড়ী, রোকেয়া হল, মুসলিম হল, ঢাকা হল থেকে লাশ উঠিয়েছি। ২৯শে মার্চ আমাদের ট্রাক প্রথম ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের প্রবেশপথে যায়। আমরা উক্ত পাঁচজন ডোম হাসপাতালের প্রবেশপথে নেমে একটি বাঙ্গালী যুবকের পচা, ফুলা, বিকৃত লাশ দেখতে পেলাম। লাশ গলে যাওয়ায় লোহার কাটার সাথে গেঁথে লাশ ট্রাকে তুলেছি। আমাদের ইন্সপেক্টর পঞ্চম আমাদের সাথে ছিলেন। এরপর আমরা লাশঘরে প্রবেশ করে বহু যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-কিশোর ও শিশুর স্তূপীকৃত লাশ দেখলাম। আমি এবং বদলু ডোম লাশঘর থেকে লাশের পা ধরে টেনে ট্রাকের সামনে জমা করেছি, আর গণেশ, রঞ্জিত (লাল বাহাদুর) এবং কানাই লোহার কাঁটা দিয়ে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে পচা, গলিত লাশ ট্রাকে তুলেছে। প্রতিটি লাশ গুলিতে ঝাঁজড়া দেখেছি, মেয়েদের লাশের কারো স্তন পাই নাই, যোনিপথ ক্ষত-বিক্ষত এবং পিছনের মাংস কাটা দেখেছি। মেয়েদের লাশ দেখে মনে হয়েছে, তাদের হত্যা করার পূর্বে

www.MurchOna.com

তাদের স্তন সজোরে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, যোনিপথে লোহার রড কিংবা বন্দুকের নল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যুবতী মেয়েদের যোনিপথের এবং পিছনের মাংস যেন ধারাল চাকু দিয়ে কেটে এসিড দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি যুবতী মেয়ের মাথায় খোঁপা খোঁপা চুল দেখলাম। মিটফোর্ড থেকে আমরা প্রতিবারে একশত লাশ নিয়ে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি।

১৯৭১ সনের ৩০শে মার্চ আমাদের উক্ত পাঁচজনের সাথে দক্ষিণা ডোমকে সাহায্য করতে দেওয়া হয়। আমাদের ট্রাক সেদিন সাত মসজিদে যায়। আমি সাত মসজিদের সম্মুখ থেকে যখন বাঙ্গালী লাশ উঠাচ্ছিলাম তখন অসংখ্য বিহারী জনতা আমাদের চারদিকে দাঁড়িয়ে হাসছিল, বাঙ্গালীদের পরিণতি দেখে উপহাস করছিল। আমরা সাত মসজিদের সম্মুখ থেকে আটটি বাঙ্গালী যুবকের লাশ তুলেছি, কতিপয় লাশ দেখলাম উপুড় হয়ে আছে, সবার পিঠ গুলির অসংখ্য আঘাতে ঝাঁজড়া হয়ে আছে। পচা, ফুলা লাশ তুলতে যেয়ে দেখলাম কারও লুঙ্গি পরা, কারও পাজামা পরা। আবার কারও দেহে হাওয়াই শার্ট এবং টেট্রনের দামি প্যান্ট। পানি থেকে বারটি লাশ তুলেছি; প্রতিটি লাশের চোখ এবং হাত পিছন দিকে বাঁধা ছিল। নদীর পাড় থেকে বারটি লাশ গুলির আঘাতে ঝাঁজড়া দেখেছি। লাশ দেখে মনে হলো, ভদ্রঘরের অভিজাত বাঙ্গালী যুবকদের লাশ। সাত মসজিদের সকল লাশ তুলে আমরা ধলপুরের ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। ফিরে এসে ট্রাক নিয়ে আমরা মিন্টু রোডে লাশ তুলতে গিয়েছি। মিন্টু রোডের রাস্তার পাশ থেকে প্যান্ট পরা দু'টি পচা ফুলা লাশ তুলেছি। ধলপুর যাওয়ার পথে ঢাকা স্টেডিয়ামের মসজিদের সম্মুখ থেকে এক বৃদ্ধ ফকিরের সদ্য গুলিবিদ্ধ লাশ তুলেছি, দেখলাম লাশের পাশেই ভিক্ষার ঝুলি, টিনের ডিবা ও লাঠি পড়ে আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিববাড়ীর সম্মুখ থেকে দুজন রূপসী যুবতী মেয়ে এবং তিনজন যুবকের ক্ষত-বিক্ষত লাশ তুলেছি। রোকেয়া হলে একটি অর্দ্ধ দগ্ধ যুবতীর লাশ তুলেছি, মুসলিম হলে প্রবেশ করে একটি পচা লাশ পেয়েছি, ঢাকা হলের ভিতর থেকে চারজন ছাত্রের লাশ তুলেছি। পরের দিন ৩১শে মার্চ বাসাবো খাল থেকে তিনটি পচা লাশ তুলেছি। সেদিন অসুস্থ থাকায় আমি আর লাশ তুলতে যেতে পারি নাই।

টিপসহি

চুন্নু ডোম

৭।৪।৭৪

www.MurchOna.com

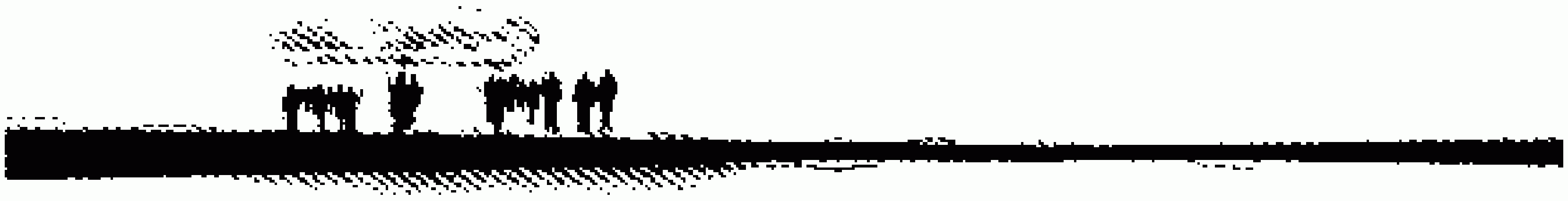

ভয়ঙ্কর রাতের পরের যে ভোর, সেখানে কিছু আশা থাকে, কিছু আনন্দ থাকে। দিনের আলো মানুষকে আর কিছু দিক না-দিক ভরসা দেয়। মঙ্গল-সঙ্গীতের মতো পাখি ডাকতে শুরু করে। এমনকি ভোরবেলার কাকের কা-কা ধ্বনিকেও শুভ মনে হয়। তারাও আলোর বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে।

পঁচিশে মার্চের ভয়ঙ্কর রাত কেটে গেছে। ভোর হয়েছে। পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে, অথচ কোনোরকম ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে একটা দীর্ঘ রজনী পার করার পর শুরু হয়েছে আরেকটি দীর্ঘ রজনী। রাতের পর দিন আসে নি। রাতের পর এসেছে রাত।

শাহেদ বসে আছে সম্পূর্ণ অপরিচিত এই পরিবারের প্রধান বৃদ্ধ সোবাহান সাহেবের শোবার ঘরের একটা চেয়ারে। সারারাত এক পলকের জন্যেও সে চোখ বন্ধ করে নি। এখন তার চোখ জ্বালা করছে। মাঝে মাঝে চোখকে আরাম দেয়ার জন্যে সে কিছুক্ষণের জন্যে চোখ বন্ধ করছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চোখ খুলে ফেলছে। মনে হচ্ছে এখন চোখ বন্ধ করে থাকার সময় না।

সোবাহান সাহেব তাঁর বিছানায় জায়নামাজ পেতে নামাজে বসেছেন। তিনি শেষরাতে কিছু সময়ের জন্যে ঘুমিয়েছিলেন। ঘুমের মধ্যে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্নটা এরকম— তার ছেলে বরিশাল থেকে লঞ্চে করে ফিরছে। ছেলের বন্ধু সঙ্গে আছে। বন্ধুর নব-পরিণীতা স্ত্রী আছে। তাদের আত্মীয়স্বজনও আছে। তারা লঞ্চের একটা কেবিনের দরজা-জানালা বন্ধ করে গানবাজনা করছে। জমিয়ে গল্প করছে। এই সময় লঞ্চের তলা খুলে গেল। লঞ্চে হুড়মুড় করে পানি ঢুকতে লাগল। লঞ্চ ধীরে ধীরে পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে। অন্য যাত্রীরা প্রাণে বাঁচার জন্যে ছোটাছুটি করছে। কেউ কেউ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সাঁতরাবার চেষ্টা করছে। দূরে উদ্ধারকারী কিছু পাল তোলা নৌকাও দেখা যাচ্ছে। অথচ সোবাহান সাহেবের ছেলে সালুর (সালাউদ্দিন) এই দিকে কোনো নজরই নেই। সে এখন তাস খেলছে। নববধূও তাস নিয়ে বসেছে। সবাই খুব মজা পাচ্ছে। লঞ্চ যে তলিয়ে যাচ্ছে সেদিকে কারো হুঁশ নেই। সবাই এত মত্ত।

সোবাহান সাহেব ঘুমের মধ্যেই চিৎকার করতে লাগলেন, এই গাধা, এই বেকুব, তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখ কী হচ্ছে। গাধারবাচ্চা গাধা, তাস পরে খেলবি দরজা খোল। দরজা খোল। দরজা খোল।

চিৎকারের এই পর্যায়ে শাহেদ তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙায়। ঘুম ভাঙার পর ঘোরলাগা গলায় তিনি শাহেদকে যে প্রশ্নটা করেন তা হলো— দরজা খুলেছে ? খুলেছে দরজা ?

দুঃস্বপ্ন দেখার পর থেকে সোবাহান সাহেব ছেলের জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছেন। একটা মুরগি সদগা মানত করেছেন। সেই সঙ্গে একশ রাকাত নফল নামাজ। ফজরের নামাজের পর থেকে তার নফল নামাজ চলছে। আটটা বাজে। মাত্র চল্লিশ রাকাত পড়া হয়েছে। শুরুর দিকে দাঁড়িয়েই পড়ছিলেন। হাঁটুতে আর্থরাইটিসে তীব্র ব্যথা শুরু হওয়ায় এখন আর দাঁড়িয়ে পড়তে পারছেন না। মাথাও বেশি নিচু করতে পারছেন না, কোমরে ব্যথা করছে। জায়নামাজের সামনে দু'টা বালিশ রেখে সেজদার সময় কোনোমতে বালিশে মাথা ছোঁয়াচ্ছেন।

কংকন দাদুভাইয়ের এই অদ্ভুত ভঙ্গির নামাজ পড়া দেখে খুব মজা পাচ্ছে। সোবাহান সাহেব যতবার বালিশে মাথা ছোঁয়াচ্ছেন ততবারই সে ফিক করে হেসে ফেলছে। আঙুল উঁচিয়ে শাহেদকেও এই মজার দৃশ্য দেখাচ্ছে। শাহেদের সঙ্গে এক রাতেই তার খুব ভাব হয়েছে। শাহেদকে সে ডাকছে 'বাবু'। কেন 'বাবু' ডাকছে সে-ই জানে। শিশুদের সব কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করা কঠিন।

রাতে গোলাগুলির ভয়ে ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে থাকার জন্যে কংকনের গলা ব্যথা করছে। টনসিল ফুলে গেছে। তার মা মনোয়ারা গরম পানি দিয়ে মেয়েকে গার্গল করানোর চেষ্টা করেছেন। সে গার্গল করতে পারছে না। মুখে পানি দিতেই সে পানি গিলে ফেলছে।

শাহেদ এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারছে না। তার সময় কাটছে হাঁটাহাঁটি করে। হাঁটাহাঁটি করার মতো বেশি জায়গা এ বাড়িতে নেই। সোবাহান সাহেবের ঘর থেকে বসার ঘর, সেখান থেকে বারান্দা। বারান্দা থেকে বসার ঘর, বসার ঘর থেকে আবার সোবাহান সাহেবের ঘর। তাঁতের মাকু চলছেই। বারান্দায় যেতে ভয় ভয় লাগে, কারণ বারান্দা থেকে রাস্তা দেখা যায়। রাস্তা দিয়ে কোনো মিলিটারি যদি যায় তারা বারান্দায় একজন কেউ হাঁটছে দেখতে পাবে। কিছুই বলা যায় না— গুলিও করে বসতে পারে।

কংকন বলল, তুমি শুধু হাঁট কেন ?

শাহেদ জবাব দিল না। কী জবাব দেবে ? সে কেন হাঁটছে সে নিজেই জানে না।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

কংকন বলল, বাবু তোমার হাঁটতে ভালো লাগে, এই জন্যে তুমি হাঁট ?

হ্যাঁ।

হাঁটতে ভালো লাগে কেন ?

জানি না।

কেন জানো না ?

মনোয়ারা রান্নাঘর থেকে বললেন, কংকন, বিরক্ত করবে না।

কংকন বলল, কেন বিরক্ত করব না ?

তার প্রশ্ন করা খেলা শুরু হয়েছে। অবিকল রুনির স্বভাব। একবার প্রশ্ন করা শুরু করলে করতেই থাকবে। বিরক্ত করে মারবে। একবার তো চড় দিয়ে প্রশ্ন প্রশ্ন খেলা বন্ধ করতে হলো। টনসিলে গলাব্যথা রোগও রুনির আছে। একটু ঠাণ্ডা লাগল তো গলায় ব্যথা। কিছুই গিলতে পারবে না। কাঁদো কাঁদো গলায় মাকে বলবে, ব্যথা কমিয়ে দাও।

শাহেদ রুনির কথা বা রুনির মা'র কথা ভাবতে চাচ্ছে না। কিন্তু বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে। এই দুঃসময়ে তারা কোথায় আছে ? কীভাবে আছে ? আসমানী সারারাত জেগেছিল তা অনুমান করা যায়। রুনি কি ঘুমিয়েছিল ? গোলাগুলির শব্দে নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়েছে। ভয় পেলে রুনির জ্বর এসে যায়। জ্বর হলে সমস্যা— সে বাবার কোল ছাড়া কারো কোলেই যাবে না। মেয়ে জ্বরে পড়লে আসমানী খুবই বিপদে পড়বে।

শাহেদ হাঁটাহাঁটি বন্ধ করে এখন বসার ঘরের বেতের চেয়ারে বসে আছে। ব্যাটারি না থাকার কারণে ট্রানজিস্টার চলছে না। বাইরে কী হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই বোঝার উপায় নেই। একতলা এই বাড়িটা অন্য বাড়ি থেকে আলাদা। প্রতিবেশীর কাছ থেকে খবর নেবার উপায় নেই। এই বাড়িটার উত্তর দিকে আরেকটা একতলা বাড়ি আছে যেটা কাছাকাছি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাক দিলে ঐ বাড়ির লোকজন শুনতে পাবে। কিন্তু ঐ বাড়িতে কেউ নেই। তালা বন্ধ। শাহেদের আবারো চোখ জ্বালা করছে। বাঁ চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। সে চোখ বন্ধ করল। মনোয়ারা এসে পাশে দাঁড়াল। তার হাতে চায়ের কাপ।

ভাই, একটু চা খান।

শাহেদ হাত বাড়িয়ে চা নিল। মনোয়ারা বলল, খিচুড়ি বসিয়েছি। আজকের নাশতা খিচুড়ি। ঘরে আটা-ময়দা কিছুই নাই।

শাহেদ বলল, বাজার আছে ? চাল, ডাল, কেরোসিন ?

মনোয়ারা বলল, এক দুই দিন চলবে। ও এসে বাজার করে দিবে বলেছিল। এখন তো তারই খোঁজ নেই।

www.MurchOna.com

শাহেদ বলল, কারফিউ তুললেই আমি বাজার করে দিয়ে যাব। নিশ্চয়ই কিছুক্ষণের জন্যে হলেও কারফিউ তুলবে। সমস্যা হচ্ছে, কারফিউ কখন তুলবে কতক্ষণের জন্যে তুলবে এটা বুঝব কী করে? একটা রেডিওর খুব দরকার ছিল।

মনোয়ারা বলল, ভাই, আপনার কি সিগারেট খাবার অভ্যাস আছে? কংকনের বাবা তার সিগারেটের প্যাকেট ফেলে গেছে। সিগারেট খাবার অভ্যাস থাকলে প্যাকেটটা আপনাকে দিতে পারি।

দিন সিগারেট।

মনোয়ারা আঁচলের ভেতর থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। সে সিগারেট-দেয়াশলাই সঙ্গে নিয়েই এসেছিল। শাহেদ বলল, ভাবি, থ্যাংক য়্যু। সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে পেয়ে কী যে ভালো লাগছে, আপনি বুঝতেও পারবেন না।

মনোয়ারা বলল, আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনার মেয়ে আপনার স্ত্রী ভালো আছে। কারফিউ তুলে নিলেই ওদের সঙ্গে আপনার দেখা হবে।

শাহেদ বলল, কীভাবে জানেন?

আমার মন বলছে। কাল রাতে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে কংকনের বাবার জন্যে যেমন দোয়া করেছি, আপনার স্ত্রী এবং মেয়ের জন্যেও দোয়া করেছি। দোয়া শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে একটা শান্তি শান্তি ভাব হলো। তখনই বুঝলাম, আল্লাহপাক আমার দোয়া কবুল করেছেন। আমার কোনো দোয়া যখন কবুল হয় আমি বুঝতে পারি।

শাহেদের চোখে সঙ্গে সঙ্গে পানি এসে গেল। নিতান্তই অপরিচিতা এই মেয়েটির সামনে চোখ মুছতে তার মোটেও লজ্জা লাগল না।

রুনি সকালবেলা হড়হড় করে বমি করল। রাতে গুলির শব্দে ভয় পেয়ে দু'বার বমি করেছে। এখন বেলা প্রায় এগারটা। সকালে কিছু খায় নি। বমি হওয়ার জন্যে পেটে তো কিছু থাকতে হবে। বমি হচ্ছে কেন? আসমানী দু'হাতে মেয়ের মাথা ধরে আছে। ভয়ে তার হাত-পা কাঁপছে। মেয়ের গা অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা। এর মানে কী? জ্বর এসে গা গরম হতে পারে, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে কেন? ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে যাচ্ছে না তো! বাচ্চাদের ভয়ঙ্কর কোনো অসুখ করলে আগেভাগে কিছু বোঝা যায় না। এরা হেসে-খেলে বেড়ায়, তারপর হঠাৎ এক সময় নেতিয়ে পড়ে। ডাক্তারের কাছে নেওয়ার সময়ও পাওয়া যায় না। এরকম কিছু হচ্ছে না তো? এরকম কিছু যদি হয়, সে ডাক্তারের কাছে কীভাবে নেবে?

www.MurchOna.com

বাইরে কারফিউ। কখন কারফিউ তুলবে কিছুই বলছে না। রেডিওতে সারাক্ষণ হামদ আর নাত হচ্ছে। ফাঁকে ফাঁকে জরুরি নির্দেশ। ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলছে— রাস্তায় কাউকে দেখা মাত্র গুলি করা হইবে।

আসমানী বলল, কেমন লাগছে রে মা?

রুনি বলল, ভালো।

আর বমি হবে?

না।

তাহলে আয়, মুখ ধুইয়ে দি।

না।

মুখ ধুবি না? মুখ ধুয়ে কুলি কর।

কুলি করব না।

মুখে না বললেও রুনি কুলি করল। আসমানী মেয়ের মুখ ধুইয়ে দিল।

শরীরটা এখন ভালো লাগছে মা?

লাগছে। বাবা কোথায় মা?

তোর বাবা আছে, ভালোই আছে।

কোথায় আছে?

বাসায় আছে। আর কোথায় থাকবে?

রুনি চোখ-মুখ শক্ত করে বলল, আমি বাবার কাছে যাব।

যাবে বললেই তো যেতে পারবে না। বাইরে কারফিউ, মিলিটারি রাস্তায় কাউকে দেখলে গুলি করে দেবে।

আমি বাবার কাছে যাব।

কারফিউ তুললেই আমরা তোমার বাবার কাছে যাব।

আমি এখন যাব।

মা গো, অবুঝ হইও না। এখন অবুঝ হবার সময় না।

আমি বাবার কাছে যাব। অবশ্যই যাব। যাবই যাব।

আসমানী মেয়ের গায়ে চড় বসিয়ে দিল। রুনি কাঁদল না। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যতই দিন যাচ্ছে মেয়েটা ততই অবাধ্য হচ্ছে। এতটুকু একটা মেয়ের গায়ে হাত তুলতে হচ্ছে। অসুস্থ মেয়ে, শরীরে কিছু নেই— হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আছে। আসমানীর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। কী করবে সে? মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করবে? এখন তাও করা যাবে না। রুনি শক্ত হয়ে

দাঁড়িয়ে থাকবে। অনেক সময় লাগবে তার রাগ কমতে। আসমানী বলল, রুনি, মা, কথা শোন...।

রুনি বলল, আমি কথা শুনব না। আমি বাবার কাছে যাব। যাবই যাব।

আসমানী মেয়েকে বাথরুমে রেখেই বসার ঘরে চলে এলো। দুঃখ-কষ্টে তার প্রায় কান্না এসে যাচ্ছে। কী ভয়াবহ সমস্যায় যে পড়েছে! রাগ করে চলে এসেছিল কুমকুমদের বাড়িতে। তার স্কুল এবং কলেজ জীবনের সবচে' প্রিয় বান্ধবী কুমকুম। রাগ করে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করলে সে এ-বাড়িতে এসে উঠে। কুমকুমের মা তাকে নিজের মেয়ের মতোই দেখেন। গত দু'দিন ধরে সে এ-বাড়িতে আছে। তার আদর-যত্নের কোনো অভাব হচ্ছে না। মেয়েকে নিয়ে থাকার জন্য তাকে আলাদা একটা ঘর দেওয়া হয়েছে। কুমকুমের মা তাকে দিনের মধ্যে প্রায় একশ'বার বলছেন, মা, তুমি কোনোরকম ভয় করবে না। শুধু আল্লাহ্ আল্লাহ্ করো। কারফিউ তোলা মাত্র শাহেদকে খুঁজে এনে সবাই একসঙ্গে গ্রামে চলে যাব।

কুমকুমদের বাড়ির সবাই স্যুটকেশ ট্র্যাংকেস গুছিয়ে অপেক্ষা করছে। কারফিউ শেষ হবার জন্যে অপেক্ষা করছে। আসমানীর খুব অস্বস্তি লাগছে। তাছাড়া বড় কথা, কুমকুম এ-বাড়িতে নেই। সে কুমিল্লায় তার শ্বশুরবড়িতে। আসমানী যে কারো সঙ্গে গল্প করবে, কথা বলবে, সে উপায় নেই। কুমকুমের বাবা মোতালেব সাহেব আছেন। তিনি অবশ্যি সারাক্ষণই কথা বলেন। সেইসব কথা শুনতে আসমানীর ভালো লাগে না। কথা বলার সময় ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে থুথু ছিটে বের হয়। দেখতে এত খারাপ লাগে— গা ঘিনঘিন করে।

বসার ঘরে মোতালেব সাহেব বসেছিলেন। তাঁর মুখ হাসি হাসি। দেখে মনে হয় তিনি বেশ আনন্দে আছেন। কিছু কিছু মানুষ দুঃসময়ে ভালো থাকে। দুঃসময়ের গল্পে আনন্দ পায়। ইনি বোধহয় সে-রকম একজন। আসমানীকে দেখে মোতালেব সাহেব আনন্দিত গলায় বললেন, লেটেস্ট খবর কি জানো নাকি মা?

আসমানী শুকনো গলায় বলল, জানি না চাচা।

বাঙালি জাতির হাগা বের করে দিয়েছে। এখন তো যাকে বলে বেড়াছেড়া অবস্থা।

আসমানী বলল, জি।

এখন ধরে নিতে পার বাঙালি জাতি খতম। আর পাঁচ বছর পরে দেখবে সবাই উর্দুতে বাতচিৎ করছে। চারদিকে হাম করেঙ্গা, তুম করেঙ্গা।

আসমানী আবারও বলল, জি। তার এখন কোনো কিছুতেই কিছু যায় আসে না। শেখ সাহেব ধরা পড়লে ধরা পড়ুক, বাঙালি জাতি উর্দুতে কথা বললে বলুক— তার এখন দরকার তার স্বামীকে। আর কিছু দরকার নেই। সে প্রতিজ্ঞা করল, বাকি জীবনে সে আর কখনোই রাগ করে শাহেদকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। ভয়ঙ্কর রাগারাগি হোক, শাহেদ তার গায়ে থুথু দিক— তারপরেও না।

আসমানী!

জি।

একটা স্ট্রং রিউমার হচ্ছে, মিলিটারি সেকেন্ড অফেনসিভে যাবে। আরো ম্যাসিভ স্কেলে। গতরাতে যেটা হয়েছে সেটা হলো তবলার ঠুকঠাক। আসল বাজনা এখনো শুরু হয় নাই। তবে ওদের মূল টার্গেট শহর। আপাতত গ্রামে তারা হাত দেবে না। শহর পুরোপুরি শেষ করার পর ধরবে গ্রাম। কাজেই আমাদের গ্রামে চলে যেতে হবে।

আসমানী আবারও কিছু না বুঝেই বলল, জি। সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না ভয়ঙ্কর কথাগুলি বলে এই বুড়ো মানুষটা অত আনন্দিত হচ্ছে কেন?

শাহেদের আমরা যদি ট্রেস করতে না পারি, তাহলে ওকে ছাড়াই যেতে হবে। এখন অবস্থাটা হচ্ছে 'ইয়া নফসি' অবস্থা। বুঝতে পারছ? শুধু নিজে বেঁচে থাক।

জি।

কাজেই তৈরি হয়ে নাও। বুড়িগঙ্গা দিয়ে নৌকা করে যাব। নদীপথ এখনো সেফ। ওরা পানি ভয় পায়।

বাথরুম থেকে হড়হড় শব্দ আসছে। রুনি আবারও বমি করছে। আসমানী ছুটে গেল বাথরুমের দিকে। তার মনেই ছিল না মেয়েকে সে রাগ করে বাথরুমে রেখে এসেছে।

কারফিউ উঠল পরদিন ২৭ মার্চ শনিবার ভোর ন'টায়। তিন ঘণ্টার জন্য কারফিউ তোলা হয়েছে।

রাস্তায় প্রচুর লোকজন। ভূমিকম্প হলে বাড়িঘরের ভেতর থেকে সব মানুষ বের হয়ে আসে কিন্তু তাদের মনটা থাকে বাড়ির ভেতরে। শহরের মানুষের অবস্থাটা সে-রকম। তারা রাস্তায় এসেছে ঠিকই কিন্তু মনেপ্রাণে চাইছে আবার ঘরে ঢুকে যেতে। সবার চোখেমুখে অনিদ্রাজনিত গভীর ক্লান্তি। এরা কেউ গত দু'রাত ঘুমোয় নি। মানুষের তৈরি দুর্যোগে একটা শহরের সব মানুষ দু'রাত জেগে কাটিয়েছে এমন নজির বোধহয় নেই।

শাহেদ রিকশা নিল। মাত্র তিনঘণ্টার জন্যে কারফিউ তোলা হয়েছে, তার হাতে একেবারেই সময় নেই। কংকনদের বাসা থেকে বের হতে অনেক সময় লেগেছে। সোবাহান সাহেব কিছুতেই তাকে যেতে দেবেন না। কংকনও তার হাত ধরে রেখেছে। সেও তাকে যেতে দেবে না। কাঁদো কাঁদো গলায় বলছে, বাবু তুমি থাক। বাবু তুমি থাক।

রিকশাওয়ালা বুড়ো ধরনের। সে রিকশা টানতে পারছে না। বুড়োদের কৌতূহল থাকে কম। তার কৌতূহলও বেশি। জায়গায় জায়গায় থামছে। অবাক হয়ে দেখছে— যেখানে বস্তি ছিল এখন নেই, কিছু কালো অঙ্গার পড়ে আছে। শাহেদের ইচ্ছা করছে রিকশাওয়ালাকে বলে, অবাক হয়ে দেখার সময় এটা না। এখন মাথা নিচু করে প্রিয়জনদের সন্ধানে যাবার সময়। সে কিছু বলল না। রিকশাওয়ালা নিজের মনে বলল, ইকবাল হলের বেবাক ছাত্র মাইরা ফেলছে।

বিশ্বাসযোগ্য কথা না। তবে সময়টা এমন যে কোনটা বিশ্বাসযোগ্য আর কোনটা না বোঝা যায় না। মেরে ফেলতেও পারে। ঢাকা শহরের সব মানুষ মেরে ফেললেও বা কী আর করা যাবে!

শাহেদ বলল, ইকবাল হলের সব ছাত্র মেরে ফেলেছে?

হ।

তুমি দেখেছ?

হ। দেখছি।

আর কী দেখেছ?

গজব দেখছি। গজব। রোজ-হাসরের কিয়ামত দেখছি।

গজব তো বটেই। এই গজবের শেষ কোথায় কে বলবে। ঢাকা কলেজের সামনে একটা মিলিটারি জিপ থেমে আছে। একজন অফিসার এবং দুজন জোয়ান জিপের কাছেই দাঁড়িয়ে। অফিসারটি হাসিমুখে গল্প করছে। জোয়ান দুজন এটেনশান ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলেও আগ্রহ নিয়ে গল্প শুনছে। শাহেদ মাথা নিচু করে ফেলল যেন এদের সঙ্গে চোখাচোখি না হয়। শাহেদের হাতে সিগারেট, তার জন্যই কেমন ভয় ভয় লাগছে। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট দেখলে এরা রাগ করবে না তো? সিগারেটটা কি ফেলে দেওয়া উচিত? মুখে কী কারণে যেন থুথু জমছে। থুথু ফেলা নিশ্চয়ই ঠিক হবে না। এরা অন্য কিছু ভেবে বসতে পারে। এরা গল্প করুক এদের মতো। আমরা তাদের সামনে দিয়ে মাথা নিচু করে চলে যাব।

www.MurchOna.com

শাহেদ আসমানীর খোঁজে প্রথম গেল তার শ্বশুরবাড়িতে। সেই বাড়ি তালাবদ্ধ। পাশের বাড়ির ভদ্রলোক বললেন, আধঘণ্টা আগে একটা গাড়িতে করে সবাই চলে গেছে। গাড়িতে কে কে ছিল তা তিনি বলতে পারলেন না। বাড়ি ছেড়ে কেন গেল তাও তিনি জানেন না। শাহেদের সঙ্গে কথা বলতে তার বোধহয় বিরক্তি লাগছিল। তিনি একটু পরপর ভুরু কোঁচকাচ্ছিলেন। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করা অর্থহীন, তবু শাহেদের নড়তে ইচ্ছা করছে না। মনে হচ্ছে তার হাত-পা শক্ত হয়ে গেছে। আবার যে হেঁটে গিয়ে রিকশায় উঠবে সেই শক্তি নেই। এখন সে যাবে কোথায়? তার নিজের বাসায়? আগে সেখানেই যাওয়া উচিত ছিল। আসমানী নিশ্চয়ই সেই বাসাতেই তার খোঁজে লোক পাঠিয়েছে। শাশুড়িও গাড়ি নিয়ে নিশ্চয়ই সেখানে গেছেন। শাহেদ ঘড়ি দেখল। তিন ঘণ্টার জন্য কারফিউ তোলা হয়েছে— এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে, আর মাত্র দুই ঘণ্টা বাকি। এর মধ্যেই নিজের আস্তানায় ফিরে যেতে হবে, দেরি করা যাবে না। সময় এত দ্রুত যাচ্ছে কেন?

দোকানপাট কিছু কিছু খুলছে। লোকজন ব্যস্ত হয়ে কেনাকাটা করছে। কাঁচাবাজারে খুব ভিড়। চাল, ডাল কিনে জমিয়ে রাখতে হবে। আবার কতদিনের জন্য কারফিউ দিয়ে দেয় কে জানে। লোকজনের কেনাকাটা, ব্যস্ততা দেখে মনে হয় শহরের অবস্থা স্বাভাবিক।

রিকশাওয়ালা আবারো নিজের মনে বলল, শেখ সাবরে মাইরা ফেলছে।

শাহেদ হতভম্ব হয়ে বলল, বলো কী? সত্যি?

হ সত্যি। শেখ সাব নাই বইল্যা আইজ এই অবস্থা। থাকলে ঘটনা হইত ভিন্ন।

শাহেদ সিগারেট ধরালো। প্যাকেটের শেষ সিগারেট। সিগারেট কিনতে হবে। রিকশা থামিয়ে রাস্তার কোনো দোকান থেকে কয়েক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে নেবে। খুব কড়া রোদ উঠেছে, চিড়চিড় করে মাথা ঘুরছে। রিকশার হুড কি সে তুলে দেবে? না থাক, হুড তুলে দেওয়া মানে কিছু গোপন করার চেষ্টা। শাহেদ আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ ঘন নীল। এমন নীল আকাশ বোধহয় অনেক দিন দেখা যায় নি। আকাশের দিকে তাকিয়ে শাহেদের মনে হলো, আসমানী ফিরে এসেছে। ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছে। রুনি মনের আনন্দে খেলছে। বাবাকে দেখে সে দৌড়ে এসে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। গালের সঙ্গে মাথা ঘষবে। একেকটা শিশু একেকরকম বিচিত্র অভ্যাস নিয়ে পৃথিবীতে জন্মায়। রুনি পেয়েছে গালে মাথা ঘষার অভ্যাস। কী জন্য এই জাতীয় অভ্যাস তৈরি হয়েছে কে জানে। সাইকিয়াট্রিস্টরা নিশ্চয়ই জানেন।

রিকশায় এক ভদ্রলোক যাচ্ছেন। পাশে খুব সম্ভব তার স্ত্রী। তিনি স্ত্রীকে জড়িয়ে আছেন। ভদ্রমহিলা শব্দ করে কাঁদছেন। ভদ্রলোক তাতে খুব বিরক্ত বোধ করছেন। তিনি হতাশ বোধে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। সে সময়মতো ফিরতে না পারলে আসমানীও নিশ্চয়ই এভাবে কাঁদবে।

শাহেদের বাড়ির দরজা তালাবদ্ধ। আসমানী ফেরে নি।

সে এখন কী করবে ? এখানেই থাকবে না-কি ফিরে যাবে কংকনদের বাড়িতে ? সে কথা দিয়ে এসেছিল ফিরে যাবে। তার যাওয়া উচিত। ওদের বাড়িতে চাল-ডাল নেই। চাল-ডাল কিনে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। বাচ্চাটার জন্যে এন্টিবায়োটিক কিনতে হবে। তার গলা ফুলে গেছে। অবিকল রুনির মতো অবস্থা। গার্গল ফার্গলে কোনো কাজ করে না। এন্টিবায়োটিক নিতে হয়। এন্টিবায়োটিকের নামটা মনে আছে— 'ওরাসিন কে।' কোনো ফার্মেসি কি খুলেছে ?

শাহেদ রাস্তায় নামল। হাতে সময় কতটা আছে সে বুঝতে পারছে না। ঘড়ি দেখলেই মনে হবে হাতে সময় নেই। লোকজন যেহেতু চলছে— কারফিউ শুরু হয় নি। একটা খোলা ফার্মেসি দেখা যাচ্ছে। সেখানেও ভিড়। শাহেদ ওরাসিন কে সিরাপ কিনল। দোকানদার এমনভাবে ওষুধ দিচ্ছে টাকা নিচ্ছে যেন সব আগের মতোই চলছে। সব ঠিক আছে।

কোনো রিকশা চোখে পড়ছে না। সে রিকশার খোঁজে হেঁটে হেঁটে রেলগেট পর্যন্ত আসার পর চোখে পড়ল তিনজন মিলিটারির একটা দল। এদের মধ্যে একজনের পোশাক আবার অন্যরকম। কালো পোশাক। কালো পোশাকের মিলিটারি সে আগে দেখে নি। তাদের একজন হাত ইশারায় তাকে ডাকছে। কেন তাকে ডাকছে ? সে চোখে ভুল দেখছে না তো ?

না, তাকে ডাকছে না। তার কী করা উচিত ? সে কি মিলিটারিটার দিকে তাকিয়ে ভদ্রতার হাসি হাসবে ? সেটাও মনে হয় ঠিক হবে না। হাসির অন্য অর্থ করে ফেলতে পারে। তার উচিত এই জায়গা থেকে অতি দ্রুত সরে পড়া। অতি দ্রুত সরাটাও ঠিক হবে না। মিলিটারিরা ভাবতে পারে লোকটা এত দ্রুত যাচ্ছে কেন ? নিশ্চয়ই খারাপ লোক।

সোবাহান সাহেব শাহেদকে দেখে আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন। রান্নাঘরের দিকে মুখ করে পুত্রবধূকে ডাকলেন। বৌমা, তাড়াতাড়ি আসো। শাহেদ চলে এসেছে।

কংকন মা'র ঘরে শুয়েছিল। সোবাহান সাহেব তার কাছেও গেলেন, হড়বড় করে বললেন, শুয়ে আছিস কেন ? উঠে আয়, শাহেদ এসেছে। তোর বাবু এসেছে।

সোবাহান সাহেবকে দেখে মনে হচ্ছে, এখন আর তাঁর মনে কোনো ভয়-ভীতি নেই। তিনি নিশ্চিন্ত একজন কেউ এসেছে। মহাসঙ্কটের দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনীর দায়-দায়িত্ব এখন তার।

শাহেদের আনা জিনিসপত্র দেখে মনোয়ারা বিস্মিত হলো। সবই এনেছে। চাল-ডাল-তেল, কেরোসিন, ময়দা, ব্যাটারি। সবচে' আশ্চর্যের ব্যাপার, কংকনের জন্যে ওষুধও এসেছে। মনোয়ারা বললেন, ভাই, আপনি খুব গোছানো মানুষ।

শাহেদ বলল, বিপদের সময় সব মানুষ বদলায়। আমি কোনোকালেই গোছানো ছিলাম না।

মনোয়ারা বললেন, পৃথিবীর সবচে' অগোছালো মানুষ কংকনের বাবা। একবার কী হলো শুনুন। আমার প্রচণ্ড মাথা ধরা। মাথা ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে এরকম অবস্থা। কংকনের বাবাকে ফার্মেসিতে পাঠালাম মাথা ধরার ট্যাবলেট আনতে। সে দু'ঘন্টা পরে ফিরল। রাজ্যের বাজার করে এনেছে। কাঁচাবাজার থেকে মাছ-মাংস কিনেছে, শাক-সবজি কিনেছে, পেয়ারা কিনেছে, কলা কিনেছে— মাথাব্যথার ট্যাবলেট শুধু কিনে নি। ভুলে গেছে। ভুলো মন মানুষের সঙ্গে সংসার করা খুবই কষ্ট।

শাহেদ বলল, ভুলো মন মানুষের সঙ্গে সংসার করার অন্য ধরনের আনন্দও আছে।

মনোয়ারা বললেন, ঠিক বলেছেন। আনন্দও আছে। একবার কী হয়েছে শুনুন। কংকনের তখনো জন্ম হয় নি— রাতে আমাদের এক বিয়ের দাওয়াতে যাবার কথা। ও করল কী...।

মনোয়ারা হঠাৎ গল্পটা থামিয়ে দিল। তার সামনে যে মানুষটা বসে আছে সে অপরিচিত একজন মানুষ। এই মানুষটির সঙ্গে নিতান্তই ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলা যায় না।

শাহেদ বলল, ভাবি, গল্পটা শেষ করবেন না?

মনোয়ারা বললেন, আরেকদিন শেষ করব। আপনাকে আসল কথাই জিজ্ঞেস করা হয় নি। আপনার স্ত্রীর খোঁজ পেয়েছেন?

শাহেদ বলল, না। ওর মা'র বাসায় গিয়েছিলাম। বাসা তালাবন্ধ। আশেপাশে কেউ কিছু জানে না।

মনোয়ারা বললেন, ভাই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন। তারা নিরাপদে আছে এবং ভালো আছে।

www.MurchOna.com

কীভাবে বলছেন ?

আমার মন বলছে। আমার মন যা বলে তা ঠিক হয়।

সোবাহান সাহেব ব্যাটারি লাগিয়ে ট্রানজিস্টার চালু করেছেন। নিচু ভলিউমে ক্রমাগত রেডিও শুনে যাচ্ছেন। সামরিক নির্দেশাবলি প্রচারিত হচ্ছে। তিনি প্রতিটি নির্দেশ মন দিয়ে শুনছেন। অবাঙালি একজন কেউ বাংলায় বলছে। অদ্ভুত বাংলা— সময়কে বলছে 'সুময়'। গুজবকে বলছে 'গজব'। 'গজবে কান ডিবেন না।' সোবাহান সাহেবের মনে হলো— এরা কি রেডিওর সব বাঙালিদের মেরে ফেলেছে ? নির্দেশগুলি পড়ার মতো বাঙালি নেই।

সামরিক নির্দেশাবলির পর প্রচারিত হলো যন্ত্রসঙ্গীত। যন্ত্রসঙ্গীতের পর স্বাস্থ্যবিষয়ক কথিকা। বিষয় জলবসন্ত। সোবাহান সাহেব জলবসন্ত বিষয়ক কথিকাও অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন। জলবসন্তে এন্টিবায়োটিক কোনো কাজে আসে না— এই তথ্য তাঁর কাছে হঠাৎ করেই খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো। এখন তাঁকে দেখে গত রাতের সোবাহান সাহেব বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে মোটামুটিভাবে আনন্দে আছেন এমন একজন মানুষ। যে মানুষটি কানের কাছে ট্রানজিস্টার রেডিও ধরে রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ পেয়েছেন। রেডিওতে পাওয়া খবর অন্যদের জানানোর বিষয়েও তাঁকে উৎসাহী মনে হচ্ছে। শাহেদকে বললেন, ভালো খবর আছে, আগামীকালও দু'ঘণ্টার জন্যে কার্ফু তোলা হবে। এমনিতে দু'ঘন্টা কম সময় মনে হয়, আসলে কিন্তু অনেক সময়। দুই ঘণ্টায় দুনিয়ার কাজ করে ফেলা যায়। কাল মনে করে আরো ব্যাটারি কিনবে।

মনোয়ারাকে রাতে কী রান্না হবে সেই বিষয়ে বললেন, বৌমা খিচুড়ি রান্না করো। বর্ষা বাদলায় আনন্দের দিনে খিচুড়ি খেতে হয়, আবার বিপদে-আপদেও খিচুড়ি খেতে হয়। পাতলা খিচুড়ি সঙ্গে ডিমভুনা।

খিচুড়ি ডিমভুনা খেতে খেতে রাত দশটা বেজে গেল। তার পরপরই উত্তর দিক থেকে প্রবল গোলাগুলির শব্দ আসতে লাগল। গতকালের মতোই অবস্থা। রাস্তায় ভারী মিলিটারি গাড়ির চলার শব্দ কিছুক্ষণ পরপরই শোনা যাচ্ছে। গোলাগুলির সঙ্গে বুম বুম শব্দের বিকট আওয়াজও কানে আসছে। এই শব্দ কিসের তা সোবাহান সাহেব বুঝতে পারছেন না। তিনি চিন্তিত গলায় শাহেদকে বললেন, বুম বুম শব্দটা কিসের ?

শাহেদ বলল, জানি না চাচা।

কামান দাগছে না-কি ? কামান দাগছে কী জন্যে ?

www.MurchOna.com

রাত বারটার দিকে শব্দ আসতে শুরু করল পশ্চিম দিক থেকে। এই শব্দ অনেক কাছ থেকে আসছে। গুলি মনে হচ্ছে শাঁ শাঁ শব্দ করে এই বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। সোবাহান সাহেব ভীত গলায় বললেন, সবাই মেঝেতে শুয়ে থাকো। সবাই একঘরে শোও। মহাআজাবের সময় আত্মীয়-অনাত্মীয় নারী-পুরুষে কোনো ভেদাভেদ নাই। শাহেদ, তুমিও আমাদের সঙ্গে শুয়ে থাকো।

বসার ঘরের মেঝেতে সবাই শুয়ে আছে। কংকন শুয়েছে শাহেদের পাশে। সে একটা পা শাহেদের গায়ে তুলে দিয়েছে। রুনি এইভাবে ঘুমায় না। সে হাত-পা গুটিয়ে পুটলির মতো শুয়ে থাকে। একটা আঙুল থাকে তার মুখে। ঘুমের মধ্যে সে আঙুল চুষতে থাকে। খুবই খারাপ অভ্যাস।

সোবাহান সাহেব অত্যন্ত ভয় পেয়েছেন। ভয়ের কারণে হঠাৎ তাঁর কথা জড়িয়ে যেতে শুরু করেছে। তিনি বললেন, সবাই একমনে আল্লাহপাকের নাম নাও— আমাদের বড়পীর সাহেব আবদুল কাদের জিলানি সব সময় যে জপ করতেন। ঐটা করো। এক মনে বলো— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।

কংকন বলল, বাতি জ্বালাও, আমার ভয় লাগে। সোবাহান সাহেব বললেন, বাতি জ্বালানো যাবে না।

গুলির শব্দ আরো কাছে এগিয়ে এসেছে। মানুষজনের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। সোবাহান সাহেব শব্দ করেই জিগির করছেন— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।

www.MurchOna.com

মাত্র দু'ঘণ্টার জন্যে কারফিউ-বিরতি।

এই দু'ঘণ্টায় শাহেদকে অনেক কাজ করতে হবে। যেভাবেই হোক আসমানীর খোঁজ বের করতে হবে। সে নিশ্চিত আজ খোঁজ পাওয়া যাবে। সে যেমন আসমানীর খোঁজ বের করার চেষ্টা করছে, আসমানীও নিশ্চয়ই করছে। প্রথমবার কারফিউ তোলা ছিল আকস্মিক। হঠাৎ করে আসমানীরা খবর পেয়েছে দু'ঘণ্টার জন্যে কারফিউ নেই। তৎক্ষণাৎ কোনো ব্যবস্থা করতে পারে নি। আজকেরটা আগেভাগেই জানা। কাজেই আসমানী নিশ্চয়ই প্ল্যান করে রেখেছে। শাহেদ ঠিক করেছে সে প্রথমে যাবে শ্বশুরবাড়িতে। সেখানে কোনো খোঁজ না বের করতে পারলে নিজের বাসায় এসে বসে থাকবে। তবে আজ খবর পাওয়া যাবেই। গতরাতে সে একটা ভালো স্বপ্ন দেখেছে। সেই স্বপ্নের একটাই অর্থ। আসমানীর সঙ্গে দেখা হবে। স্বপ্নে সে নিজের ঘরের বারান্দায় বসে হাউমাউ করে কাঁদছে, এমন সময় তার বড় ভাই ইরতাজউদ্দিন বারান্দায় এসে বিরক্ত গলায় বললেন, কাঁদছিস কেনরে গাধা? সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আসমানীর খোঁজ পাচ্ছি না। ইরতাজউদ্দিন বললেন, ঘরে বসে ভেউ ভেউ করে কাঁদলে খোঁজ পাবি কী করে? আয় আমার সঙ্গে। দু'জন রাস্তায় নামল। রাস্তায় প্রচুর লোকজন। তাদের মধ্যেই দেখা গেল, একটা ঠেলাগাড়িতে আসমানী বসে আছে। সে খুব সুন্দর করে সেজেছে। তার গা ভর্তি গয়না। মুখে চন্দনের ফোঁটা দেয়া। পরনের শাড়িটাও মনে হচ্ছে বিয়ের শাড়ি। শাহেদ ঠেলাগাড়ির দিকে অতি দ্রুত যাবার চেষ্টা করছে। এত লোকজন যে যাওয়া যাচ্ছে না। তবে আসমানী তাকে দেখতে পেয়েছে। সে হাসছে।

ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়। এই স্বপ্ন অবশ্যই সত্যি হবে। শাহেদ অতি দ্রুত হাঁটছে। স্বপ্নে যেমন দেখেছিল রাস্তায় প্রচুর মানুষ, বাস্তবেও তাই দেখা যাচ্ছে। প্রচুর লোক। মনে হয় শহরের সমস্ত লোকজন এক সঙ্গে পথে নেমেছে। রিকশাও নেমেছে, তবে সংখ্যায় কম। খালি রিকশা দেখা মাত্র শাহেদ ছুটে যাচ্ছে। রিকশা কি কলাবাগান যাবে? প্রতিটি রিকশাওয়ালাই এই প্রশ্নের জবাব

দিতে অনেক সময় নিচ্ছে। চট করে বলে দিলেই হয় যাবে না। তা না করে একেকজন আকাশ-পাতাল ভাবছে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। রাস্তায় থুথু ফেলছে। কপালের ঘাম মুছছে। তারপর বিড়বিড় করে বলছে— ঐ দিকে যামু না। রিকশা ঠিক করতে যাওয়া মানে সময় নষ্ট। এখন প্রতিটি সেকেন্ড মূল্যবান। মূল্যবান সেকেন্ডের একটিও নষ্ট করা ঠিক না।

সায়েন্স ল্যাবরেটরির মোড়ে এসে শাহেদ রিকশা পেল। এই রিকশা পাওয়া না-পাওয়া একই। জোয়ান রিকশাওয়ালা অথচ সে রিকশা টানতেই পারছে না। পায়ে হেঁটে এরচে' দ্রুত যাওয়া যায়। শাহেদ বলল, ভাই একটু তাড়াতাড়ি যান। রিকশাওয়ালা ঘাড় ঘুরিয়ে শাহেদের কথা শুনল। তার রিকশার গতি আরো শ্লথ হয়ে গেল। শাহেদের ইচ্ছা করছে, লাফ দিয়ে রিকশা থেকে নেমে হাঁটা শুরু করে।

কলাবাগানের কাছাকাছি এসে সে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো একটা ঘোড়ার গাড়ি। গাড়িতে পাকিস্তানি পতাকা উড়ছে। গাড়ির ভেতর বার-তের বছর বয়েসী একটা কিশোরী। তার পরনে ঘাঘড়া। চুল লাল। কিশোরীকে ঘিরে চারজন যুবক। সবাই পান খাচ্ছে। তাদের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। তারা কি কোনো উৎসবে যাচ্ছে ? বিয়ের উৎসব নিশ্চয়ই না। অন্য কোনো উৎসব। এরা বিহারি। বিহারিরা উৎসব করতে পছন্দ করে। আজকের এই দুঃসময় তাদের জন্যে না। এরা দুঃসময়ের বাইরে।

শাহেদ শ্বশুরবাড়িতে কাউকে পেল না। বাড়ির সামনের চায়ের দোকানটা খুলেছে। দোকানদার কিছু বলতে পারল না। আশেপাশে চার-পাঁচটা বাড়িতে সে গেল। তারাও কিছু জানে না। একজন শুধু বলল, কালো রঙের একটা প্রাইভেট গাড়িতে করে সবাই চলে গেছে। কখন গেছে, কবে গেছে সেটা আবার বলতে পারছে না।

শাহেদ নিজের বাড়িতে ফিরল কারফিউর মেয়াদ শেষ হবার আধঘণ্টা আগে। গেট খুলে ভেতরে ঢোকার সময় হঠাৎ মনে হলো, তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে— এক্ষুনি বোধহয় সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। বাসার সদর দরজায় তালা নেই। বাড়িতে লোক আছে। অবশ্যই আসমানী ফিরেছে। চাবি দিয়ে সদর দরজা খুলেছে। বাড়ির অন্য দরজা-জানালা সবই বন্ধ। এটাই স্বাভাবিক। এই সময়ে কেউ দরজা-জানালা খোলে না। শাহেদ দ্রুত চিন্তা করছে— চাল-ডাল কি আছে ? আসমানী খুব গোছানো মেয়ে। সবকিছুই থাকার কথা। কেরোসিন আছে কি-না কে জানে। যদি না থাকে এক্ষুণি নিয়ে আসতে হবে। আধঘণ্টা

www.MurchOna.com

সময় এখনো হাতে আছে। সে দেখে এসেছে রাস্তার মোড়ের বড় দোকানটা খোলা। কেরোসিন চা-পাতা চিনি। আসমানী একটু পর পর চা খায়। কড়া মিষ্টির ঘন চা। শাহেদ ঠিক করতে পারছে না— সে কি বাসায় না ঢুকে আগে বাজারটা করে নিয়ে আসবে? না-কি আগে আসমানীর সঙ্গে দেখা করে বলবে— ভয় নাই আমি আছি। তাকে না দেখে আসমানী নিশ্চয়ই ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। তবে আসমানীর সঙ্গে দেখা হলে একটা বিপদ হবে। রুনি তাকে দেখা মাত্র ঝাঁপ দিয়ে কোলে উঠে পড়বে। তাকে তখন কোল থেকে নামানো যাবে না। দোকানে যেতে হলে তাকে কোলে নিয়েই যেতে হবে।

সদর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। শাহেদ অনেকক্ষণ দরজা ধাক্কাবার পর ভেতর থেকে ভীত পুরুষগলা শোনা গেল— কে?

শাহেদ বলল, আমি শাহেদ। দরজা খুলেন।

দরজা খুলল। শাহেদ অবাক হয়ে দেখে, দরজার ওপাশে গৌরাঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখ হলুদ। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে বিরাট কোনো অসুখ থেকে উঠেছে।

শাহেদ বলল, তুমি কোত্থেকে?

গৌরাঙ্গ জবাব দিল না। শাহেদ আবার বলল, তুমি কোত্থেকে? গৌরাঙ্গ এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন সে শাহেদের কথা বুঝতেই পারছে না। শাহেদ বলল, বাসায় আর কেউ আছে?

গৌরাঙ্গ বলল, না।

শাহেদ বলল, তুমি বাসায় ঢুকলে কীভাবে?

গৌরাঙ্গ বিড়বিড় করে বলল, তালা ভেঙে ঢুকেছি। মিতা, আমার কোনোখানে যাবার জায়গা নাই। তুমি যদি বের করে দাও, মিলিটারিরা আমাকে মেরে ফেলবে।

শাহেদ বলল, আমি বের করে দেব কেন?

গৌরাঙ্গ জবাব দিচ্ছে না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শাহেদের দিকে। শাহেদ বলল, তোমার বৌ-মেয়ে ওরা কোথায়?

শাহেদ বিড়বিড় করে বলল, ওরা ভালো আছে।

তারা কোথায়?

আমার শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে। আমি তোমার সঙ্গে থাকব।

শাহেদ বলল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে কেন?

গৌরাঙ্গ আগের মতোই অস্পষ্ট গলায় বলল, মিতা, আমি তোমার সঙ্গে থাকব। আমার সঙ্গে টাকা আছে। শ্বশুরমশাই যে টাকাটা দিয়েছেন, সবটা আমার সঙ্গে আছে। তুমি টাকাটা নাও। খরচ করো। শুধু আমাকে থাকতে দাও।

শাহেদ হতভম্ব গলায় বলল, ঠিক করে বলো তো— ভাবি, বাচ্চা ওরা কোথায় ?

গৌরাঙ্গ বলল, বলেছি তো ওরা ভালো আছে। দু'জনই ভালো আছে। মেয়েটার জ্বর এসেছিল, এখন মনে হয় জ্বর কমেছে। আমার নিজের শরীরও ভালো না। আমি তোমার এখানে বিশ্রাম নিতে এসেছি। সারাক্ষণ আমার মাথা ঘোরে। মিতা, আমার ক্ষিধাও লেগেছে। তুমি আমাকে কিছু খাওয়াও। টাকা নিয়ে চিন্তা করবে না। আমার কাছে টাকা আছে। মিতা, আমি এখন শুয়ে থাকব। খাবার জোগাড় হলে আমাকে ডেকে তুলবে।

গৌরাঙ্গ সন্ধ্যা পর্যন্ত মরার মতো ঘুমাল। কয়েকবার চেষ্টা করেও শাহেদ তাকে তুলতে পারল না। সন্ধ্যার পর পর সে নিজেই জেগে উঠল। শাহেদ বলল, এখন শরীর কেমন ? মাথা ঘোরা কমেছে ?

গৌরাঙ্গ বলল, শরীর ভালো আছে। আমার বাচ্চাটাকে মিলিটারিরা মেরে ফেলেছে— এই জন্যে মনটা সামান্য খারাপ।

ভাবি ? ভাবি কোথায় ?

ওরা তাকে তুলে নিয়ে গেছে। বাঁচিয়ে রেখেছে কি-না আমি জানি না। মেরে ফেললে তার জন্যেও ভালো, সবার জন্যেই ভালো। আমার শ্বশুরসাহেবও মারা গেছেন। মিতা, তোমাকে যা বলেছি সব গোপন রাখবে। মিলিটারি যদি শুনে তাদের নামে আজেবাজে কথা বলছি, তাহলে তারা রাগ করবে। আমাকেও ধরে নিয়ে যাবে। মিলিটারিদের দোষ কী! ওরা হুকুমের চাকর। ওদের যেভাবে হুকুম দিয়েছে, ওরা সেইভাবে কাজ করেছে। তাই না ?

শাহেদ বলল, ভাবিকে যখন ওরা নিয়ে যাচ্ছিল তুমি কোথায় ছিলে ?

আমি দরজার আড়ালে বসে ছিলাম। ওরা সব ওলট পালট করে দেখেছে, শুধু দরজার আড়ালটা দেখে নাই। সবই ভগবানের লীলা। মিতা, তোমাকে যা বললাম সব গোপন রাখবে। কোনো কিছুই যেন প্রকাশ না হয়। মিলিটারির কানে গেলে তোমার বিপদ। আমারও বিপদ।

শাহেদ বলল, ভাত-ডাল রান্না করেছি, খেতে আসো।

গৌরাঙ্গ বলল, ঠিক আছে। খুবই ক্ষুধা লেগেছে। ইলিশ মাছের পাতুরি খেতে ইচ্ছা করছে। গরম ধোঁয়া উঠা ভাত, ইলিশ মাছের পাতুরি।

www.MurchOna.com

কথা শেষ করেই গৌরাঙ্গ বিছানায় শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম। শাহেদ তার পাশেই বসে আছে। মানুষটা ঘুমের মধ্যে কাঁদছে। ঘুমের মধ্যে কাঁদার দৃশ্যটা যে দেখতে এত ভয়ঙ্কর তা শাহেদ আগে কখনো বুঝতে পারে নি।

রাত বাড়ছে। ইলেকট্রিসিটি সন্ধ্যা থেকেই নেই। ঘর অন্ধকার না। শাহেদ টেবিলের উপর পাশাপাশি দু'টা মোমবাতি জ্বালিয়েছে। মোমবাতি পাওয়া গেছে রান্নাঘরের তাকে। আসমানী রান্নাঘরের দরজায় লিস্ট টানিয়ে রেখেছে। কোন জিনিসটি কোথায় তার তালিকা। প্রায়ই সে বাবার বাড়ি চলে যায়, তালিকাটা সে জন্যেই। আজ এই তালিকা পড়তে গিয়ে শাহেদের চোখে পানি এসে গেছে।

চাল, ডাল, মুড়ি— টিনে ভরা। রুনির ঘরে। চৌকির নিচে।

কাপড় ধোবার সাবান, মোমবাতি, দেয়াশলাই— রান্নাঘরের তাকে। সর্ববামে।

মশলা, লবণ— রান্নাঘরের তাকে। সর্ব ডানে। কৌটার গায়ে কী মসলা নাম লেখা আছে।

চা, চিনি— মিটসেফের উপরে।

পেঁয়াজ, রসুন, আদা— মিটসেফের পাশের খলুইয়ে।

সরিষার তেল— চুলার পাশে।

ভালোবাসা— আমার কাছে। আমি যেখানে থাকি সেখানে।

আসমানীর পক্ষেই সম্ভব কাজের কথা লিখতে লিখতে হঠাৎ মজার কিছু লিখে ফেলা। তেল, মসলার কথা লিখতে লিখতে লেখা 'ভালোবাসা— আমার কাছে। আমি যেখানে থাকি সেখানে।'

বিয়ের রাতেও সে এরকম মজা করল। বাসর হচ্ছে আসমানীদের কলাবাগানের বাড়িতে। দোতলার বড় একটা ঘর। ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। ঘরে পা দিয়েই শাহেদের মনে হলো— আসমানী কি এত সুন্দর! সে আগেও তো কয়েকবার দেখেছে। এত সুন্দর তো তাকে কখনো মনে হয় নি? শাহেদ খাটে বসতে বসতে বলল, আজ কী রকম গরম পড়েছে দেখেছ? (সে ঠিক করে রেখেছিল প্রথম যে বাক্যটি বলবে তা হচ্ছে— আসমানী কেমন আছ? বলার সময় সম্পূর্ণ অন্য কথা বের হয়ে এলো। বলার সময় বলে বসল— আজ কী গরম পড়েছে দেখেছ? যেন সে দেশের আবহাওয়া নিয়ে খুবই চিন্তিত।)

শাহেদের কথার উত্তরে আসমানী মুখ তুলে তাকাল। শান্তগলায় স্পষ্টভাবে বলল, গরমের সময় গরম তো পড়বেই। গরমকালে গরম পড়বে, ঠাণ্ডাকালে ঠাণ্ডা। আপনার জন্যে তো আল্লাহ্ আবহাওয়া বদলে দেবেন না।

www.MurchOna.com

শাহেদ হতভম্ব। হড়বড় করে এইসব কী বলছে ? বিয়ের টেনশনে, অত্যধিক গরমে কি তার মাথা আউলায়ে যাচ্ছে ?

আসমানী বলল, চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন ? কোনো পুরুষমানুষ এইভাবে তাকিয়ে থাকলে আমার রাগ লাগে। আমি কিন্তু চোখ গেলে দেব।

আতঙ্কে অস্থির হয়ে শাহেদ খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই আসমানী হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, সরি। কিছু মনে করো না। আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছি। আমি আমার দুই খালাতো বোনের সঙ্গে বাজি ধরেছি। বাসর রাতে আমি যদি তোমাকে ভয় দেখাতে পারি, তাহলে তারা আমাকে একশ' টাকা দেবে। ওরা দু'জনেই জানালার ফাঁক দিয়ে আমাদের দেখছে। তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন ? বসো।

শাহেদ বসল। সে তখনো পুরোপুরি স্বস্তি পাচ্ছে না। তার মনে হচ্ছে অদ্ভুত সুন্দর এই মেয়েটি আবারও উদ্ভট কিছু করবে। আসমানী বলল, তুমি কি রাগ করেছ ?

শাহেদ ভীত গলায় বলল, না।

আসমানী বলল, প্রথম রাতেই তোমাকে ভয় দেখিয়ে দিলাম। কাজটা খুব খারাপ করেছি। এতে কী হবে জানো— সারাজীবন তুমি আমাকে ভয় করে চলবে।

শাহেদ এসে বারান্দায় বসেছে। বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। গুমোট গরম কমতে শুরু করেছে। ভেতর থেকে মাঝে মাঝে গৌরাঙ্গ গোঙানির মতো শব্দ করছে। যেন কেউ তার গলায় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে চিৎকার করতে গিয়েও করতে পারছে না। একটা ব্যাপার দেখে শাহেদ খুবই অবাক হচ্ছে— গৌরাঙ্গের ভয়াবহ দুঃসময় তাকে তেমন স্পর্শ করছে না। যেন গৌরাঙ্গের এই সমস্যায় তার কিছু যায় আসে না। ভয়াবহ দুর্যোগের সময় মানুষ কি বদলে যায় ? তখন নিজের সুখ নিজের দুঃখই প্রধান হয়ে দাঁড়ায় ? দেশের সব মানুষই কি বদলাতে শুরু করেছে ? আসমানী বদলে যাচ্ছে ? রুনি বদলে যাচ্ছে ?

শাহেদ আসমানীর কথা ভাবতে চাচ্ছে না। আসমানীর কথা মনে করলেই বুকের ভেতর কেমন জানি করছে। কী একটা দলা পাকিয়ে যাচ্ছে। আসমানী এখন আছে কোথায় ? কী করছে ? সেও কি তার মতো জেগে আছে। গল্পের বই পড়ছে না-কি ? নিশিরাতে গল্পের বই পড়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠা তার

www.MurchOna.com

পুরনো রোগ। একবার তো আসমানীর কান্নার শব্দে সে ঘুম ভেঙে উঠে বসে ভীত গলায় বলল, কী হয়েছে ? আসমানী কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, কিছু হয় নাই। ঘুমাও। গল্পের বই পড়ে কাঁদছি।

কী বই ?

তারাশংকর লেখা একটা বই, নাম— বিপাশা।

বই পড়ে কাঁদার কী আছে ?

আমার স্বভাবই এরকম। নিজের দুঃখে আমি কাঁদি না। গল্প-উপন্যাসের চরিত্রদের দুঃখে আমি কাঁদি।

তোমার মাথা কিন্তু সামান্য খারাপ আছে।

তা তো আছেই। পুরোপুরি সুস্থ মাথার একটা মেয়েকে বিয়ে করো। তোমরা সুখে সংসার করো। আমি দূর থেকে দেখে খুব মজা পাব।

শাহেদ বিরক্ত হয়ে বলল, এইসব কী ধরনের কথা ?

আসমানী বলল, খুবই ভালো কথা। আমি নিজে এসে তোমাদের সংসার সাজিয়ে দিয়ে যাব। বিয়ে করবে ? প্লিজ প্লিজ।

বাতি নেভাও। বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে আসো।

না, ঘুমাব না। বইটা আমি আবার পড়ব।

এখন ?

হ্যাঁ এখন। গল্পের শেষ না জেনে পড়ার এক ধরনের আনন্দ। আবার শেষ জেনে পড়ার অন্য ধরনের আনন্দ। বাতি জ্বালিয়ে রাখলে তোমার যদি অসুবিধা হয়, তাহলে আমি বরং অন্য ঘরে যাই।

যা ইচ্ছা করো।

বৃষ্টি বাড়ছে। সঙ্গে সামান্য বাতাসও আছে। বাতাসে ছাতিম গাছের পাতা নড়ছে। বারান্দা থেকে গাছটাকে এখন জানি কেমন ভৌতিক লাগছে। এই গাছ দেখে একবার আসমানী খুব ভয় পেয়েছিল। রাতেরবেলা তার ঘুম ভেঙেছে, সে এক গ্লাস পানি হাতে নিয়ে বারান্দায় এসে বসেছে। কিছুক্ষণ পরই বিকট চিৎকার। ঘুম ভেঙে শাহেদ ছুটে এসে দেখে, আসমানী থরথর করে কাঁপছে। তার হাত থেকে পানির গ্লাস পড়ে ভেঙে টুকরা টুকরা হয়েছে। শাহেদ বলল, কী হয়েছে ? আসমানী বিড়বিড় করে বলল, গাছটা মানুষের মতো হাত নেড়ে ডেকেছে।

শাহেদ বলল, বাতাসে পাতা নড়েছে, তোমার কাছে মনে হয়েছে অন্য কিছু।

www.MurchOna.com

আসমানী কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি ছোট বাচ্চা না, আমি জানি কী হয়েছে।

ভয়ে সেই রাতেই আসমানীর জ্বর উঠে গেল।

না, সে এখন আসমানীর কথা ভাববে না। সে নিশ্চয়ই ভালো আছে। সে আছে তার বাবা-মা'র সঙ্গে। একজন সন্তান সবচে' নিরাপদে থাকে যখন সে বাবা-মা'র সঙ্গে থাকে। তার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না— কাল অবশ্যই দেখা হবে। আগামীকাল কারফিউ ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সে যাবে মিরপুর দশ নম্বরে। সেখানে আসমানীর এক খালা থাকেন। তিনি নিশ্চয়ই কোনো খবর দিতে পারবেন। আসমানীর সরাসরি কোনো খবর না পেলেও তার অন্য আত্মীয়দের ঠিকানা তার কাছ থেকে নেবে।

মিরপুর যাবার পথে সোবাহান সাহেবদের খোঁজ নিয়ে যেতে হবে। তারা নিশ্চয়ই আজও অপেক্ষা করে বসেছিলেন। সোবাহান সাহেবদের নিরাপদ কোনো জায়গায় পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

গৌরাঙ্গ! তার ব্যাপারটা কী ? গৌরাঙ্গ কি তার কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যাবে ? না-কি এখানে থাকবে ? এখানে থাকতে কোনো সমস্যা নেই। যতদিন ইচ্ছা থাকতে পারবে। আসমানী যদি এর মধ্যে চলে আসে, তাহলে কোনো অসুবিধাই হবে না। আসমানীর মেজাজ যখন ঠিক থাকে, তখন সে অসাধারণ একটি মেয়ে। গৌরাঙ্গের ভয়াবহ কষ্ট অনেকখানি কমিয়ে দেয়া কোনো ব্যাপারই না।

মিতা! মিতা!

ভারী গলায় গৌরাঙ্গ ডাকছে। শাহেদ ভেতরে গেল। গৌরাঙ্গ খাটে বসে আছে। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। তার মুখও হা হয়ে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। শাহেদ বলল, ভাত-ডাল রান্না করেছি। কিছু খাবে ?

গৌরাঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে বলল, হুঁ।

নামো বিছানা থেকে। দাঁড়াও আমি ধরছি।

শাহেদ ধরাধরি করে গৌরাঙ্গকে নামাল। গৌরাঙ্গ বলল, মিতা, আমার স্নান করতে হবে। আমি তিনদিন স্নান করি নাই।

শাহেদ বলল, বাথরুমে পানি আছে, সাবান আছে। গরম পানি করে দেব ?

দাও। মিতা শোন, আমি কিন্তু তোমার এখানে থাকব। আমি অন্য কোনোখানে যাব না।

কোনো অসুবিধা নেই। থাকবে।

www.MurchOna.com

আগারগাঁও-এ আমার এক মামা থাকেন। ওয়্যারলেস অফিসার না-কি কী যেন। আমি উনার কাছেও যাব না।

তোমার যত দিন ইচ্ছা তুমি থাকবে।

মিতা আমার বুকে ব্যথা করছে। আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।

গরম পানি দিয়ে গোসল করো। গোসল করলে আরাম পাবে।

গৌরাঙ্গ ক্ষীণ গলায় বলল, আচ্ছা। মিতা আমার হাত-পা কেমন শক্ত হয়ে গেছে। হাত-পা নাড়তে পারছি না। এই দেখ, আঙুল বাঁকা করতে পারছি না।

গৌরাঙ্গ হাত উঁচু করে দেখাল। তার আঙুল ঠিকই বাঁকা হচ্ছে।

মিতা দেখেছ আঙুল বাঁকছে না।

শাহেদ বলল, ঠিক হয়ে যাবে।

গৌরাঙ্গ বলল, কখন ঠিক হবে?

শাহেদ বলল, ভোর হোক।

গৌরাঙ্গ বলল, আচ্ছা।

আরেকটি ভোর হয়েছে। আগে একটি ভোরের সঙ্গে আরেকটি ভোর আলাদা করা যেত না। এখন আলাদা করা যায়। এখন মনে হয় প্রতিটি ভোর আলাদা।

কারফিউ উঠেছে। লোকজন রাস্তায় নেমেছে। শাহেদ বের হয়েছে গৌরাঙ্গকে নিয়ে। গৌরাঙ্গের শরীরের অবস্থা ভালো না। তার গায়ে জ্বর। কিন্তু সে একা কিছুতেই বাসায় থাকবে না। একা বাসায় বসে থাকলে সে না-কি ভয়েই মরে যাবে। রাস্তায় নেমেও আরেক বিপদ, সে একটু পর পর বলছে— মিতা ফিরে চল। মিতা ভয় লাগছে, ফিরে চল। শাহেদের খুবই বিরক্ত লাগছে। ফিরে যাবার প্রশ্নই উঠে না। যে করেই হোক আসমানীদের খোঁজ বের করতে হবে। প্রথমে যেতে হবে মিরপুর দশ নম্বর, তার খালার বাড়িতে। বাড়ির নাম্বার সে জানে না। আগে দু'বার এসেছে, কাজেই তার ধারণা সে বাড়ি চিনবে। তবে মিরপুর যাবার আগে তাকে সোবাহান সাহেবের খোঁজে যেতে হবে। এরা নিশ্চয়ই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে অপেক্ষা করছে। গতকাল শাহেদ যায় নি। বৃদ্ধ ভদ্রলোক নিশ্চয়ই তাকে নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তা করছেন।

সোবাহান সাহেবদের বাড়ির সদর দরজায় তালা ঝুলছে। বেশ বড় তালা। মনে হচ্ছে তারা গতকাল বাসা ছেড়ে নিরাপদ কোনো জায়গায় চলে গেছে। ঢাকা শহরের মানুষ কোনোখানেই এখন নিশ্চিন্ত বোধ করছে না। তারা শুধুই জায়গা বদল করছে। দরজায় তালাবদ্ধ, তারপরেও শাহেদ অনেকক্ষণ কড়া

নাড়ল। ঢাকা শহরে আরেকটি নিয়ম এখন চালু হয়েছে। সদর দরজায় তালা লাগিয়ে বাড়ির ভেতরে বসে থাকা। মিলিটারি যদি আসে তাহলে যেন তালা দেখে মনে করে এই বাড়িতে লোকজন নেই।

গৌরাঙ্গ বলল, মিতা চল, বাসায় ফিরে যাই। কেউ তো নাই।

শাহেদ বলল, আমাকে মিরপুর যেতেই হবে।

গৌরাঙ্গ বলল, মিতা, আমার খুব ভয় লাগছে।

ভয় লাগলে তুমি বাসায় চলে যাও। আমাকে যেতেই হবে। যে করেই হোক আমাকে আসমানীর খোঁজ বের করতে হবে।

মিতা, আমি একা বাসায় থাকব না। আমি ভয়েই মরে যাব। আমি খুবই ভীতু।

শাহেদ জবাব দিল না। কথা বলে নষ্ট করার মতো সময় তার হাতে নেই। তাকে এখন কোনো বেবিট্যাক্সি খুঁজে বের করতে হবে। বেবিট্যাক্সি না পাওয়া গেলে শক্ত-সমর্থ শরীরের কোনো রিকশাওয়ালা, যে তাকে অতি দ্রুত মিরপুর পৌঁছে দেবে। হাতে সময় অল্প। বারোটা থেকে আবার কারফিউ শুরু হবে।

মিরপুর দশ নম্বরের মাথায় তারা রিকশা ছেড়ে দিল। বাড়ি খুঁজতে শুরু করতে হবে এখান থেকেই। শাহেদের অস্পষ্টভাবে মনে আছে, বাড়ির সামনের গেটের কাছে একটা জবা গাছ আছে। বাড়ির একটা ইংরেজি নামও আছে। নামটা মনে পড়ছে না। তবে শুরুটা 'S' দিয়ে।

গৌরাঙ্গ চাপা গলায় বলল, মিতা মিলিটারি। ডানদিকে চায়ের দোকানের সামনে মিলিটারি। মিতা, আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

শাহেদ থমকে দাঁড়াল। চায়ের দোকানের নাম 'রহমানিয়া টি স্টল'। পাঁচজন মিলিটারির একটা দল দোকানের সামনে। একজন পিরিচে চা ঢেলে খাচ্ছে। বাকিরা শক্ত মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। এদের আশেপাশে কোনো লোকজন নেই। শুধু শাদা গেঞ্জি পরা চায়ের দোকানদার মাথা নিচু করে বসে আছে। দোকানদারকে দেখে মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। দূর থেকে মনে হচ্ছে হার্ডবোর্ডে দোকানদারের ছবি এঁকে বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

গৌরাঙ্গ চাপা গলায় বলল, মিতা, আমাদেরকে ডাকে। এখন কী করব ?

পিরিচে ঢেলে যে চা খাচ্ছিল সে-ই ডাকছে। তার মুখ হাসি হাসি। গৌরাঙ্গ বিড়বিড় করে বলল, মিতা, এখন কী করব ? দৌড় দিব ?

শাহেদ বলল, যেভাবে দাঁড়িয়ে আছ সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকো। খবরদার দৌড় দেবে না। আমি শুনে আসি।

মিতা, ওদের কাছে যাবার দরকার নাই।

শাহেদ এগুচ্ছে। মিলিটারি দলটির দু'জন বন্দুক উঁচিয়ে ধরল তার দিকে। কেন ধরল শাহেদ বুঝতে পারছে না। হয়তো এটাই তাদের নিয়ম। কোনো বাঙালি তাদের দিকে আসতে থাকলে বন্দুক উঁচিয়ে নিশানা করতে হয়। তাকে ডাকছেই বা কেন ? যে চা খাচ্ছিল, সে চা খাওয়া বন্ধ করে তাকিয়ে আছে। তার মুখ এখনো হাসি হাসি। এটা একটা ভরসার কথা। কিংবা তার মুখ হয়তো হাসি হাসি না। অনেকে এরকম থাকে। খুব রাগ করে তাকালেও মনে হয় হাসছে। আচমকা খুব কাছেই কোথাও গুলি হলো। শাহেদ অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। গুলি কি তাকে করা হলো ? মনে হয় না। তাকে গুলি করা হলে ব্যথা বোধ হতো। রক্তে সার্ট ভিজে যেত। সে-রকম কিছু তো হয় নি।

গৌরাঙ্গ তাকিয়ে আছে। শাহেদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সে মিলিটারিদের দিকে তাকাল। যে মিলিটারি চা খাচ্ছিল, তার চা খাওয়া শেষ হয়েছে। সে হাতের ইশারায় গৌরাঙ্গকে চলে যেতে বলল। গৌরাঙ্গ চলে যাচ্ছে।

শাহেদ মিলিটারিদের দিকে এগুচ্ছে। সে হাঁটতে পারছে, এর অর্থ তাকে গুলি করা হয় নি। শরীরে বুলেট নিয়ে কেউ হাঁটতে পারে না। মিলিট্যারিদের ছয়-সাত হাত কাছাকাছি গিয়ে শাহেদ থমকে দাঁড়াল।

নাম কেয়া ? তেরা নাম কিয়া ?

মিলিটারিরা তার নাম জানতে চাচ্ছে। নাম দিয়ে তারা কী করবে। তার নাম শাহেদ হলেও যা ফখরুদ্দিন হলেও তা। শাহেদ নাম বলল। যে মিলিটারি চা খাচ্ছিল, সে চায়ের কাপের কিছু চা মাটিতে ফেলে দিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলল। শাহেদ একদৃষ্টিতে মিলিটারিটার দিকে তাকিয়ে আছে।

কান পাকাড়ো।

এর মানে কী ? মিলিটারিটা তাকে কানে ধরতে বলছে ? অপরাধটা কী ? শাহেদ কানে ধরল। মিলিটারি ইশারা করল উঠবোস করতে। শাহেদ উঠবোস করছে। মিলিটারিরা মনে হয় ব্যাপারটায় মজা পাচ্ছে। সবার মুখ হাসি হাসি।

www.MurchOna.com

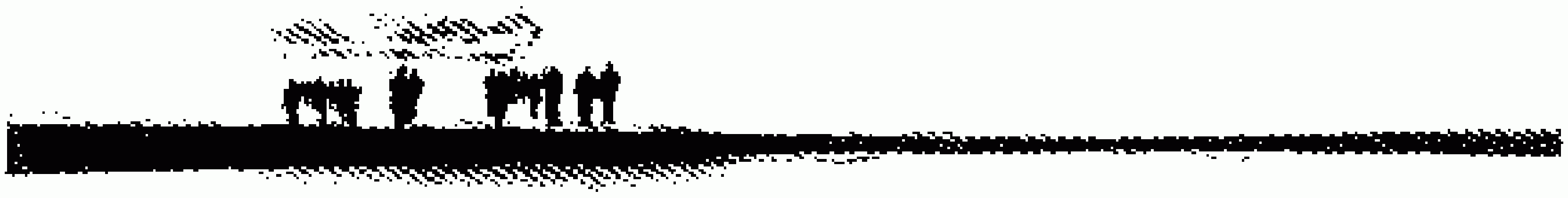

মরিয়ম খুব ভালো করেই জানে ভয়ঙ্কর দিন যাচ্ছে। যে-কোনো সময় যে-কোনো কিছু ঘটে যেতে পারে। তারপরেও তার মনে চাপা আনন্দ। এই আনন্দের জন্যে নিজেকে তার খুবই ছোট লাগছে, মনে হচ্ছে সে বাথরুমের তেলাপোকার চেয়ে জঘন্য কোনো প্রাণী। কিন্তু সে কী করবে ? জোর করে তার আনন্দ চেপে রেখে দুঃখ দুঃখ মুখ করে ঘুরবে ?

তার আনন্দের প্রধান কারণ হলো, কারফিউ ভাঙার পরপর নাইমুল বলেছে, 'আমি একটু বাইরে যাব, শহরের অবস্থা দেখব।' মরিয়ম সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, 'আমি তোমাকে ছাড়ব না। তুমি যেতে পারবে না।'

নাইমুল বলল, আচ্ছা। তুমি অনুমতি না দিলে যাব না।

কী সুন্দর কথা! তুমি অনুমতি না দিলে যাব না। চোখে পানি চলে আসার মতো কথা। মরিয়ম বলল, দুপুরে কী খাবে বলো। আজ দুপুরে আমি রান্না করব। মা'র শরীর খারাপ।

নাইমুল বলল, তুমি যা রান্না করবে আমি তাই খাব। তবে...

তবে কী ?

সবচে' ভালো হয় রান্নাবান্নার ঝামেলায় না গিয়ে তুমি যদি আমার সামনে বসে থাকো। দুঃসময়ে প্রিয়জনদের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। এখন আমাদের দুঃসময়।

নাইমুলের কথা শুনে আনন্দে মরিয়মের চোখে পানি চলে এলো। তার কাছে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশের সব মানুষের জন্যে দুঃসময় হলেও আজ তার জন্যে দুঃসময় নয়। কোনো দুঃসময় তাদের দু'জনের মাঝখানে ঢুকতে পারবে না।

নাইমুল ট্রানজিস্টারের নব ঘোরাচ্ছে। তার মধ্যে কোনো অস্থিরতা নেই। বাইরে এত ঝামেলা অথচ মানুষটা শান্ত-সহজ ভঙ্গিতে ট্রানজিস্টারের নব ঘোরাচ্ছে। মনে হচ্ছে সে কোনো গানের অনুরোধের আসরের অনুষ্ঠান ধরতে চাচ্ছে। মরিয়ম বলল, এই, তোমার কি সত্যি সত্যি বাইরে যেতে ইচ্ছা করছে ?

নাইমুল বলল, ইচ্ছা করছে কিন্তু আজ আমি তোমার ইচ্ছাটাকেই গুরুত্ব দেব। তুমি যদি বলো Yes তা হলে Yes, তুমি যদি বলো No তা হলে No।

আচ্ছা যাও, ঘুরে আসো। এক ঘণ্টার জন্যে যাবে।

থ্যাংক য়্যু।

তুমি যতক্ষণ বাইরে থাকবে ততক্ষণ আমি জায়নামাজে বসে থাকব।

আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরব।

রাস্তায় যতক্ষণ থাকবে দোয়া ইউনুস পড়বে। দোয়া ইউনুস জানো তো? না জানলে একটা কাগজে লিখে দেই।

লিখে দিতে হবে না। জানি।

তাড়াতাড়ি ফিরবে কিন্তু।

নাইমুল বলল, এখন বাজছে ন'টা পঁচিশ, আমি অবশ্যই দশটা পঁচিশে ফিরব।

ইনশাল্লাহ বলো। ইনশাল্লাহ ছাড়া কথা বলছ কেন?

ইনশাল্লাহ। তুমি চায়ের পানি গরম রেখ। এসেই লেবু চা খাব।

মরিয়ম জায়নামাজে বসে আছে। যে কটা সূরা সে জানে সে কটা তিনবার তিনবার করে পড়ে নফল নামাজ পড়তে শুরু করবে। নাইমুল ঘর ছেড়ে যাবার পরই মরিয়মের মনে হলো, মস্ত ভুল করা হয়েছে, তাকে যেতে দেয়া ঠিক হয় নি। সে সূরা পড়া বন্ধ রেখে ক্রমাগত বলতে লাগল— আল্লাহ, তুমি তাকে ভালো রাখ। আল্লাহ তুমি তাকে ভালো রাখ। মরিয়মের একবারও তার বাবার কথা মনে পড়ল না। পঁচিশে মার্চের পর থেকে তাঁর কোনো খবর নেই। হয়তো মরিয়মের মনে হয়েছে তাঁকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। পুলিশের চাকরিতে দিনের পর দিন অনুপস্থিত থাকা কোনো ব্যাপার না।

সাফিয়ার মুখ ভয়ে-আতঙ্কে ছোট হয়ে আছে। তাঁর ভীতির কারণ সম্পূর্ণ অন্য। পঁচিশে মার্চ রাতে তিনি একটি ভয়াবহ সত্য আবিষ্কার করেছেন। টুনটুনি (ইয়াহিয়াকে এখন টুনটুনি ডাকা হচ্ছে। একমাত্র মোবারক হোসেনই ছেলেকে ইয়াহিয়া নামে ডাকেন।) কানে শোনে না। এই যে এত গোলাগুলি, কামানের শব্দ তাতে তার কিছুই হচ্ছে না। সে জেগেই আছে কিন্তু একবারও চমকে উঠছে না। তখন তার সন্দেহ হলো, ছেলে হয়তো চোখেও দেখে না। তিনি তার সামনে রঙিন ফিতা ধরলেন। টুনটুনি হাত বাড়াল না। চোখের সামনে ঝুমঝুমি বাজালেন। সে ঝুমঝুমির দিকে তাকাল না। সম্পূর্ণ অন্যদিকে তাকিয়ে আনন্দে

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

হাসতে লাগল। তিনি বুঝতেই পারছেন না এই ভয়ঙ্কর খবরটা তিনি মরিয়মের বাবাকে কীভাবে দেবেন। মরিয়মের বাবা কি খবরটা সহ্য করতে পারবেন ? তিনি যদি বলেন, এই ব্যাপারটা ধরতে তোমার এত দিন লাগল ? তখন তিনি কী জবাব দেবেন ? সাফিয়ার একটা ভয়ঙ্কর ইচ্ছা হচ্ছে। ছেলেকে কোলে নিয়ে ছাদে চলে যেতে ইচ্ছা করছে। ছাদ থেকে ছেলে কোলে নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে নিচে পড়ে যাওয়া। চোখ-কান আছে এমন শিশুই এদেশে টিকে থাকতে পারে না, এ কীভাবে টিকবে ? তিনিইবা ছেলের বাবার রাগ কীভাবে সামাল দেবেন ?

নাইমুলের দশটা পঁচিশে ফেরার কথা। সে ঠিক দশটা পঁচিশেই ফিরল। মরিয়ম তখনো জায়নামাজ ছেড়ে ওঠে নি। নাইমুল বলল, মরি! আমার লেবু চা কই ?

মরিয়ম লজ্জায় মরে যাচ্ছে। নাইমুল তার কথা রেখেছে। সে কাঁটায় কাঁটায় দশটা পঁচিশে ফিরেছে। সে তার কথা রাখতে পারে নি। চুলায় চায়ের পানিই দেয়া হয় নি।

নাইমুল বলল, চা লাগবে না, তুমি বসো।

মরিয়ম বলল, কী দেখলে ?

নাইমুল বলল, ওরা যা দেখাতে চেয়েছিল তাই দেখলাম।

মরিয়ম বলল, ওরা কী দেখাতে চেয়েছিল ?

ওরা ওদের হাতের সূক্ষ্ম কাজ দেখানোর জন্যেই তিন ঘণ্টার জন্যে কারফিউ তুলেছে। যেন ওদের কর্মকাণ্ড দেখে আমরা জেলি ফিসের মতো হয়ে যাই।

কী বলছ বুঝতে পারছি না।

নাইমুল হাসল। তার অদ্ভুত হাসি। সে হাসি দেখলেই মরিয়মের শরীর কেমন করতে থাকে।

মরিয়ম বলল, আমি তোমার জন্যে চা নিয়ে আসি।

নাইমুল বলল, চা আনতে হবে না। চুপ করে বসে থাকো। আমি একটা মজার জিনিসও দেখে এসেছি।

এর মধ্যে মজার জিনিস কী দেখলে ?

ওরা শহীদ মিনার ভেঙে গুঁড়া করে দিয়েছে। সেখানে একটা সাইনবোর্ড টানিয়ে দিয়েছে। সাইনবোর্ডে লেখা—

> 'মসজিদ, নামাজ পড়িবার স্থান।'*

---

* *অন্তরাগে স্মৃতি সমুজ্জ্বল*। মমিনুল হক খোকা।

www.MurchOna.com

নাইমুল হাসছে। তবে এই হাসি কেমন যেন অন্যরকম। হাসির শব্দ ভোঁতা। শুনতে ভালো লাগে না।

মরিয়ম এখন তোমাকে খুব জরুরি একটা কথা বলব। মন দিয়ে শোনো। পাকিস্তানি মিলিটারিদের সঙ্গে সত্যিকার যুদ্ধ এখন শুরু হবে। কী ভয়াবহ যুদ্ধ যে হবে ওরা বুঝতেও পারছে না। আমি কিন্তু যুদ্ধে যাব।

মরিয়ম হতভম্ব গলায় বলল, কী বললে ?

নাইমুল সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, আমি যুদ্ধ করব। কীভাবে করব, অস্ত্র কোথায় পাব— কিছুই জানি না। শুধু এইটুকু জানি যে ব্যবস্থা হবে।

যুদ্ধে যাবে ? তুমি যুদ্ধ করবে ?

হ্যাঁ। তবে তোমার ভয়ের কিছু নাই। আমি মরব না। আমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আমি খুবই সাবধান থাকব। বুদ্ধিমান মানুষ সবার আগে নিজেকে রক্ষা করে। আমি তাই করব।

মরিয়ম বিড়বিড় করে বলল, তুমি আমকে ছেড়ে চলে যাবে ?

নাইমুল সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে— স্বাধীন বাংলাদেশে।

মরিয়ম আর্তনাদের মতো করে বলল, তুমি কি এখন চলে যাচ্ছ ?

নাইমুল বলল, না। আজ দিনটা আমি তোমার সঙ্গে থাকব। আমি যাব আগামীকাল। কারফিউ লিফট হওয়া মাত্র। বিদায়। আজকের দিনটা শুধুই আমাদের দু'জনের—

> She was a child and I was a child,
> In this kingdom by the sea,
> But we loved with a love that was more than love
> I and my Annabel Lee—

মরিয়ম হাউমাউ করে কাঁদছে। নাইমুল হাসিমুখে স্ত্রীর কান্না দেখছে।

২৭ মার্চ শনিবার রাত আটটায় রেডিওর নব ঘুরাতে ঘুরাতে এই দেশের বেশ কিছু মানুষ অদ্ভুত একটা ঘোষণা শুনতে পায়। মেজর জিয়া নামের কেউ একজন নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণা দিয়ে বলেন, 'আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।' তিনি সর্বাত্মক যুদ্ধের ডাক দেন।*

---

* *একাত্তরের রণাঙ্গন* / শামসুল হুদা চৌধুরী
একাত্তরের দশমাস / রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী
আমার একাত্তর / আনিসুজ্জামান

দেশের মানুষদের ভেতর দিয়ে তীব্র ভোল্টেজের বিদ্যুতের শক প্রবাহিত হয়। তাদের নেতিয়ে পড়া মেরুদণ্ড একটি ঘোষণায় ঋজু হয়ে যায়। তাদের চোখ ঝলমল করতে থাকে। একজন অচেনা অজানা লোকের কণ্ঠস্বর এতটা উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারে ভাবাই যায় না।

পিরোজপুর মহকুমার সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার এই ঘোষণা শুনে আনন্দে ছেলেমানুষের মতো চিৎকার শুরু করতে থাকেন— 'যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আমরা যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছি। আর ভয় নাই।' তিনি পিরোজপুরের পুলিশদের অস্ত্রভাণ্ডার থেকে দুইশ রাইফেল স্থানীয় জনগণকে দিয়ে দেন। যুদ্ধ শুরুর প্রস্তুতি হিসেবে। পাকিস্তান মিলিটারি তাঁকে হত্যা করে ৫ মে। এই ঘটনার বত্রিশ বছর পরে তাঁর বড় ছেলে 'জোছনা ও জননী' নামের একটা উপন্যাস লেখায় হাত দেয়।

কালুরঘাট রেডিওস্টেশন থেকে প্রচারিত মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে পরে নানান বিভ্রান্তি তৈরি হয়। তিনি মোট ক'বার ঘোষণা পাঠ করেছেন? বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে বাংলাদেশের একচ্ছত্র নায়ক এবং তার পক্ষেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হচ্ছে।— এই বিবৃতি কত তারিখে পড়া হলো, ক'বার পড়া হলো? এই নিয়ে বিভ্রান্তি। জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠের আগেই স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর দেয়া স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠের প্রসঙ্গ বইপত্রে পাওয়া যাচ্ছে। যেমন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আব্দুল হান্নান দুপুর দু'টায় বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বাংলা অনুবাদ প্রচার করেন। ২৬ মার্চ সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে স্বাধীনতা ঘোষণার বাংলা অনুবাদ দ্বিতীয়বার পড়া হয়। পাঠ করেন হাটহাজারী কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল জনাব আবুল কাশেম সন্দীপ।

স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গে মেজর জিয়া নিজে তাঁর ডায়েরিতে যা লিখেছেন তা হলো— '২৭শে মার্চ শহরের চারদিকে তখন বিক্ষিপ্ত লড়াই চলছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় রেডিওস্টেশনে এলাম। এক টুকরা কাগজ খুঁজছিলাম। হাতের কাছে একটা এক্সারসাইজ খাতা পাওয়া গেল। তার একটি পৃষ্ঠায় দ্রুত হাতে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম ঘোষণার কথা লিখলাম। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্বভার নিয়েছি, সে কথাও লেখা হলো সেই প্রথম ঘোষণায়... কিছুক্ষণের মধ্যে সে ঘোষণা বেতারে প্রচার করলাম। ২৮ মার্চ সকাল থেকে পনেরো মিনিট পর পর ঘোষণাটি প্রচার করা হলো কালুরঘাট রেডিওস্টেশন থেকে। ৩০ মার্চ দ্বিতীয় ঘোষণাটি প্রচার করা হলো রাজনৈতিক নেতাদের অনুরোধক্রমে।'

স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে কোনোরকম বিভ্রান্তি থাকতে পারে না। এই একটি বিষয়ে দল মতের উর্ধ্বে আমাদেরকে উঠতেই হবে। 'সত্যেন ধার্যতে পৃথ্বি, সত্যেন তাপতে রবি, সত্যেন বাতি বায়ুশ্চ, সর্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম।' সত্যই পৃথিবীকে ধারণ করে আছে, সত্যের দ্বারাই সূর্য তাপ বিকিরণ করছে, সত্যের জন্যেই বাতাস বইছে, সত্যেই সবকিছু প্রতিষ্ঠিত। —লেখক

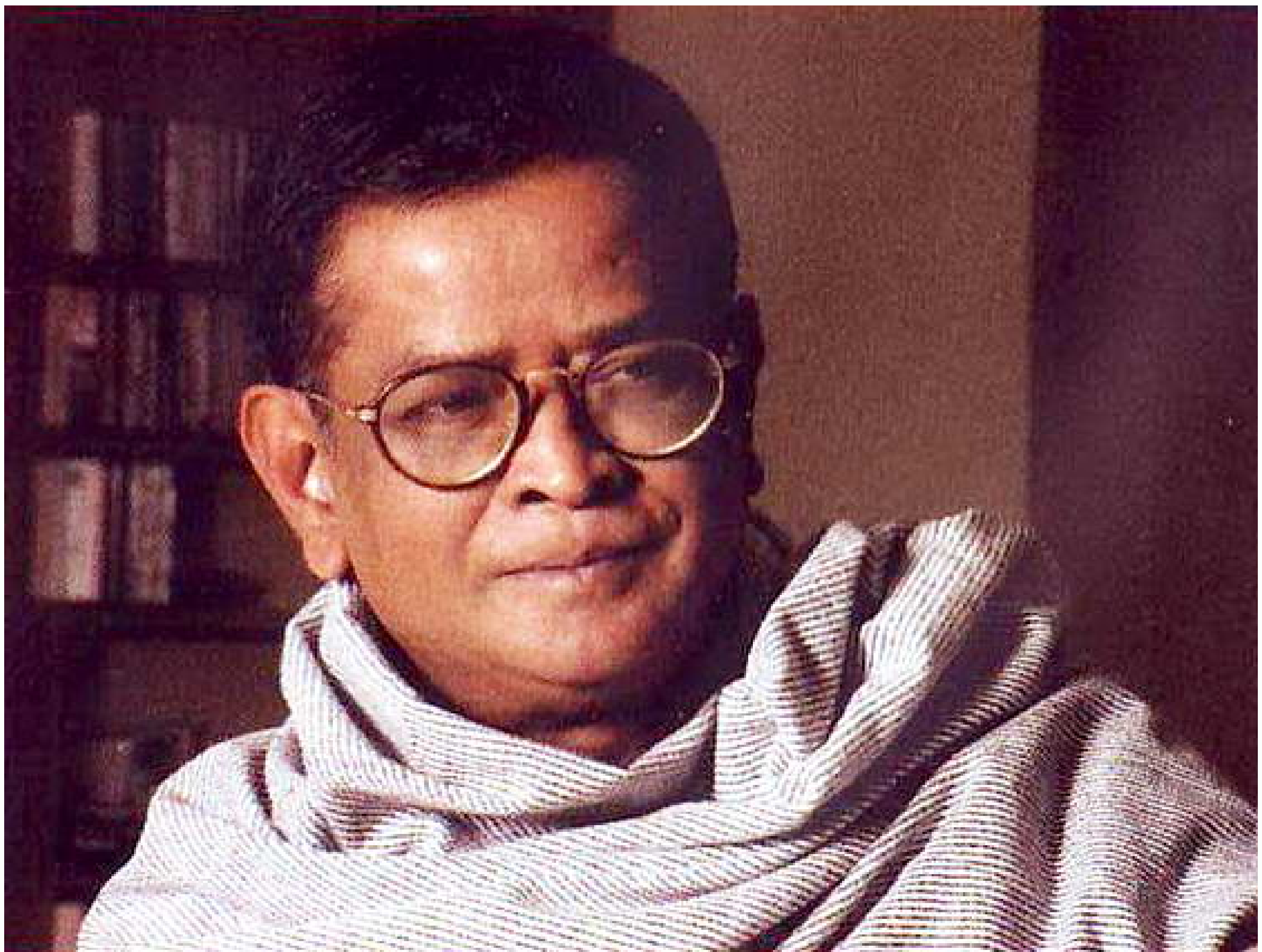

বাংলাদেশের লেখালেখির ভুবনে প্রবাদ পুরুষ। গত ত্রিশবছর ধরেই তাঁর তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনা ছেড়ে হঠাৎ করেই চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। *আগুনের পরশমণি*, *শ্রাবণ মেঘের দিন*, *দুই দুয়ারী*, *চন্দ্রকথা*.... ছবি বানানো চলছেই। ফাঁকে ফাঁকে টিভির জন্যে নাটক বানানো।

এ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। দেশের বাইরেও তাঁকে নিয়ে প্রবল আগ্রহ। জাপান টেলিভিশন NHK তাঁকে নিয়ে একটি পনেরো মিনিটের ডকুমেন্টারি প্রচার করেছে Who is who in Asia শিরোনামে।

মানুষ হিসেবে তাঁকে তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র হিমু এবং মিসির আলির মতোই রহস্যময় বলে মনে হয়। একা থাকতে পছন্দ করেন। এখন তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটে নিজের তৈরি নন্দন কানন 'নুহাশ পল্লীতে'।

Jochna O Jononir Golpo by Humayun Ahmed

[Part.1]

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com